দ্বিতীয় প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

স্নেহের বোন

সুচবিতাকে

দিলাম

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান ভারতে প্রধানত দুই দল মানুষ আছেন, যাদের একদল গান্ধী বলতে অজ্ঞান, আর এক দল যারা চিমটে দিয়েও গান্ধীজিকে ছোঁবেন না। এঁদের কোনো দলের মানুষ নই আমি। সুতরাং 'গান্ধী-চরিত' রচনা করতে গিয়ে আমি যে পথে অগ্রসর হয়েছি, সেটা যুধ্যমান ক্রুদ্ধ দুই শিবিরের মধ্যকার পথ, সেখানে দু দিক থেকেই অজস্র আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। পথটা বিপজ্জনক বলতে হবে।

কিছুদিন আগে, যখন সাম্প্রদায়িক কলহের আগুন লেগেছিল আর শান্তিকামীরা সবাই গান্ধীজির পিছু পিছু ছুটছিলেন, অথচ গান্ধীজির উপর অপমান এবং আক্রমণও আসছিল ক্রমাগত, তখন আমি রোমঁ্যা রোলাঁ-রচিত 'মহাত্মা-গান্ধী' বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম। বইখানির সাময়িক মূল্য ছিল প্রচুর। কিন্তু একথাও তখন মনে হয়েছিল, বাঙালী পাঠকের হাতে আজ যা তুলে দিলাম, এর সবটুকুই বিচারসহ নয়, এর অনেকখানিই ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। তাই আমার এই গ্রন্থের রচনা। কিন্তু রোলাঁর রচনাসিদ্ধ হস্তের রচনার সম্মুখীন হওয়া আমার পক্ষে দুঃসাহস, এমন কি স্পর্ধা। তবুও সে দুঃসাহস এবং স্পর্ধা করতে হয়েছে, কারণ, বস্তুত পক্ষে রোঁলা গান্ধীজিকে সম্পূর্ণ বোঝেন নি, যেমন তিনি বোঝেন নি নিজেকে। বোঝা সম্ভবও ছিল না। তাঁরা দুজনে ছিলেন একই প্রকৃতির মানুষ। তাই গান্ধী-চরিত্র বা গান্ধীবাদকে বিচার ক'রে দেখবার মত ধৈর্য বা নির্লিপ্তি রোঁলার থাকা সম্ভব ছিল না। এ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমার মনে পড়ে। সুবিখ্যাত অভিনেতা জন আলিস একবার জর্জ বার্ণার্ড শ-কে ভল্‌তের-এর জীবন নিয়ে একখানি নাটক লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। শ তার জবাবে বলেছিলেন, কাজটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, তিনি নিজেই অনেকখানি ভল্‌তের-এর মতো। যে-কারণে শ ভল্‌তেরের জীবন নিয়ে নাটক লেখেন নি, ঠিক সেই কারণেই রোলাঁ গান্ধীজির জীবনী লিখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল না ক'রে পারেন নি। কিন্তু নিজের কালের গণ্ডিতে বন্দী থেকে প্রতিভারাও যা অনেক সময় দেখতে পান না, তাঁর পরবর্তীরা অতি সাধারণ মানুষ না হয়েও অনেক সময় তা সহজে প্রত্যক্ষ করেন। কালের কুয়াশা প্রতিভার দৃষ্টিকেও অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। সাঁইত্রিশ বছর আগেও তাই রোলাঁর মতো প্রতিভার পক্ষেও যা বোঝা ছিল দুঃসাধ্য, আজ সাধারণ মানুষের চোখেও তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালের বন্দিশালার মহাপ্রাচীর ডিঙিয়ে দানবের দৃষ্টিও যেখানে গিয়ে পৌছে না, কালের দাক্ষিণ্যে দৈত্যের ঘাড়ের ওপর উঠে

বসেছে যে বামনটা, তার দৃষ্টি কিন্তু সেখানে গিযে পৌছে অবাধে। এটাই হোলো ইতিহাসেব করুণতম দিক। ১৯৩২ সালে রোলাঁ যাকে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৩০-এর পরেই তাতে তাঁর নিজেরও সংশয় জন্মেছিল।

তাছাড়া রোলাঁ ছিলেন মূলত বুর্জোয়া জীবনীকাব। তাই তাঁর গ্রন্থে ব্যক্তি ছিল অতিপ্রধান। গান্ধীজি যে-সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ফসল, তাকে তিনি বিচার কবেন নি। তাই তাঁব জীবনী হয়েছে একদর্শী। কিন্তু জীবনীতে দুটি দিক থাকা অনিবায—একটি হোলো ব্যক্তিগত দিক, অপরটি হোলো সামাজিক দিক। সামাজিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিপার্শ্বই মানুষকে গ'ড়ে তোলে। সমাজ যেমন জন্ম দেয় প্রতিভাকে, প্রতিভাও তেমনি প্রভাবিত কবেন সমাজকে। গান্ধীজির মতো প্রতিভাকে তাই কেবল ব্যক্তিগতভাবে দেখা নির্ভুল দৃষ্টির পরিচয় নয়। সামাজিক ভাবেও তাঁকে দেখা একান্ত দরকার। কী সামাজিক অবস্থা তাঁকে গ'ড়ে তুলেছিল, এবং কী সামাজিক অবস্থাকে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, এদুটিকে একসঙ্গে দেখলেই গান্ধীজির সামাজিক রূপটিকে ধরা যাবে। কেবল তাই নয়, গান্ধীজির বেলায় তাঁর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত দুটি রূপকে বিশেষ সতর্কভাব সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে। কারণ, গান্ধীজিব ব্যক্তিগত ভূমিকাটি তাঁর সমাজগত ভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজে তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থত্যাগী। কিন্তু সমাজগতভাবে তিনি লালসার এবং স্বার্থবুদ্ধির অভিব্যক্তি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অপরূপ, তিনি স্নেহময়, তিনি সন্ন্যাসী। কিন্তু সমাজগতভাবে তিনি যে শক্তির প্রকাশ, তা পুরাতন, তা সাধারণ, তা নিষ্করুণ, তা শোষণ ও স্বার্থপরতার চরম। তাই গান্ধীজির জীবনী-রচনাব সময় দুটি মানুষকে সর্বদা আমি চোখের সম্মুখে রাখতে চেয়েছি, একটি, ব্যক্তিগত গান্ধী, অন্যটি, সমাজগত গান্ধী। আমার রচনার গোড়ার দিকে আমি ব্যক্তির উপর জোর দিতে চেয়েছি বেশি। ক্রমেই সে ব্যক্তি পরিণতির দিকে যতো এগিয়েছে, যতোই সে সমাজ-জীবনের প্রতিনিধিত্ব বা সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করেছে, ততোই সে-ব্যক্তিকে আমি সংকীর্ণ ক'রে তাকে বিস্তৃত সমাজ-জীবনের সঙ্গে একান্বিত করতে চেয়েছি। তাই এই গ্রন্থের শেষের দিকে পাঠকের মনে হ'তে পারে, তিনি গান্ধীকে যেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে আর পাচ্ছেন না, যেমন ভাবে তিনি পাচ্ছেন ভারতের সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসকে। বস্তুত পক্ষে, গান্ধীজীর জীবনের এই হোলো সত্যিকার কাহিনী—একটি ক্ষুদ্র ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের নিঃসঙ্গ শিশু একদা ভারতের বহু মানবের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন—যেখানে ভারতের হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ এবং তাঁর নিজের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না।

এ যেন এক মহা সঙ্গমের স্বরূপ। গান্ধীজির জীবন বুঝি কোনো নদী, নির্জন পার্বত্য অঞ্চল থেকে একদা শুরু করেছিল তার একক যাত্রা। সে-যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ঘটেছে মহাসঙ্গম, সেখানে নদী ও সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে—সেখানে নদী প্রায় নিশ্চিহ্ন, সমুদ্র-সন্নিভ। ব্যক্তির উৎস থেকে সমাজের মোহানা পর্যন্ত এই উত্তরণকেই আমি চিত্রিত করতে চেয়েছি। চেয়েছি, হয়তো সার্থক হই নি। তবু যে চেয়েছিলাম, বলতে দ্বিধা কি?

ঋষি দাস

গান্ধী-চরিত

॥ এক ॥

মানব-সভ্যতার মহাকাশে আমরা তিনপ্রকার জ্যোতিষ্ক প্রত্যক্ষ করি। এক, যাঁরা মহাসত্যের আবিষ্কার করেছেন, যাঁদের ব্যক্তিত্ব সেই মহাসত্যকে কখনও অতিক্রম করে নি, বরং তাঁদের ব্যক্তিত্ব ঐ মহাসত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দুই, যাঁরা মহাসত্যের আবিষ্কারক নন, কিন্তু যাদের ব্যক্তিত্ব আকাশস্পর্শী, যাদের ব্যক্তিত্বের অলোকসামান্য শক্তি অকিঞ্চিৎকরকে, এমন কি অসত্যকেও, মহাসত্যরূপে প্রতীয়মান করেছে। তিন, যাঁরা মহাসত্যের আবিষ্কারক, এবং সেই সঙ্গে মহান্ ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ঐ দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিভা। তার অসামান্য ব্যক্তিত্বই তাঁকে মানব সভ্যতার মহাকাশে এক ভাস্বর জ্যোতিষ্করূপে স্থানলাভে সমর্থ করেছিল। তার মহান্ ব্যক্তিত্বের জাদুদণ্ডস্পর্শে অসত্যও মহাসত্যের রূপ পেয়েছিল।

ব্যক্তিত্বের বর্ণনা ও বিশ্লেষণই জীবনীকারের প্রধান উপজীব্য। তাই মহাত্মা গান্ধীর জীবনের অপেক্ষা জীবনীকারের পক্ষে এমন লোভনীয় বিষয় আর কি আছে? জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের ধারাটি আমরা বিবৃত ও বিশ্লিষ্ট করব। কেন আমি তাঁকে ঐ দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিভা বলেছি, তাতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধী পদবীর অর্থ, গুজরাটী ভাষায়, মুদী। এ থেকেই অনুমান করা যায়, মহাত্মাজীর পূর্বপুরুষরা কখনো কোনোকালে মুদীর ব্যবসা করতেন। কিন্তু মহাত্মাজীর পিতামহ থেকে মন্ত্রিত্বই ক'রে এসেছেন তিন পুরুষ। গান্ধীজীর পিতামহের নাম উত্তমচন্দ বা উতা গান্ধী। উত্তমচন্দ কি রকম সাহসী, সত্যপ্রিয় ও দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্বন্ধে বহু কাহিনী-কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পোরবন্দরের রাজার মন্ত্রী। রাজার সঙ্গে তাঁর কোনো বিবাদ-বচসা হওয়ায় তিনি পোরবন্দর ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গিয়ে জুনাগড়ের নবাবের আশ্রয় নেন। সেখানে

নবাবকে তিনি বাম হাতে সেলাম করেছিলেন। এই অসৌজন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন : "ডান হাতটা তো আমি পোরবন্দরকে দিয়ে ফেলেছি।"

উতা গান্ধীর দুই বিয়ে। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে চারটি এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মে। এই পুত্রদের মধ্যে পঞ্চম জনের নাম করমচাঁদ বা কাবা গান্ধী।

কাবা গান্ধীর আবার চার বিয়ে। তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী পুতলীবাঈয়ের গর্ভে এক কন্যা এবং তিন পুত্র হয়। এই পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠই আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব—মহাত্মা গান্ধী। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে তাঁর জন্ম হয়।

কাবা গান্ধীর উচ্চ শিক্ষা ছিল না, কিন্তু ছিল প্রচুর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা। ধর্ম-বিষয়ে তার বিশেষ শিক্ষা বা জ্ঞান ছিল না, তবে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। একজন ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি গীতা-পাঠ আরম্ভ করেন, যে-গীতা তাঁর বিখ্যাত পুত্রকে একদা বিপুল ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কাবা গান্ধীর মধ্যে সাহস এবং সত্যপ্রিয়তা-ও ছিল প্রচুর। তিনি যখন রাজকোটে দেওয়ানি করতেন, রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে পলিটিক্যাল এজেন্টের সহকারী কোনো এক সাহেব একবার অপমান করায় তিনি তার প্রতিবাদ করলেন। সাহেব তাতে চটে গিয়ে কাবা গান্ধীকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বললেন। কিন্তু ভয় পাওয়ার পাত্র ছিলেন না কাবা গান্ধী। তাই তিনি সাহেবের অপমানজনক আদেশ উপেক্ষা করলেন। ফলে তাঁকে কয়েক ঘণ্টা হাজতে রাখা হোলো। কিন্তু তাতেও যখন কোনো ফল হোলো না, তখন তাঁকে তারা ছেড়ে দিলো। পিতার এই অনমনীয়তা-ও আমরা তাঁর পুত্রের মধ্যে লক্ষ্য করবো।

কাবা গান্ধী প্রথমে পোরবন্দরে মন্ত্রিত্ব করতেন। মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর তিনি রাজস্থানিক কোর্টের সভাসদ হন এবং কিছুদিন রাজকোট ও ভাঁকানারের দেওয়ান থাকেন। মৃত্যুর সময় তিনি রাজকোটের দরবার থেকেই পেন্‌সন্ পাচ্ছিলেন। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের লোভ না থাকায় তিনি সন্তানদের জন্যে ধন-সম্পত্তি বিশেষ রেখে যাননি।

পিতার এই সাহস ও অন্যায়ের প্রতিবাদের শক্তি যেমন ভবিষ্যতে মহাত্মাজীর মধ্যে সহস্র গুণে বর্ধিত হয়ে বতে ছিল, তেমনি তাঁর মার কয়েকটি গুণও গান্ধীজী পেয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোলো উপবাস-ব্রত। অতি শিশুকালেই গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন, দিনের পর দিন মা হাসিমুখে উপবাসী থাকেন এবং উপবাসের ব্রত পালন ক'রে কাতর হওয়া তো দূরের কথা, হয়ে ওঠেন সজীব ও সানন্দ। গান্ধীজী পরবর্তী জীবনে উপবাসকে তাঁর আত্মিক অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। যখনই তিনি নিজের মালিন্য দূর করতে চেয়েছেন বা অপরের পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করতে অগ্রসর হয়েছেন, তখনই তিনি গ্রহণ করেছেন উপবাসের ব্রত। এই উপবাসের ব্রত গ্রহণের প্রথম পাঠ তিনি তাঁর মার কাছেই পেয়েছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গান্ধীজীর শৈশবকাল পোরবন্দরেই কাটে। ঐ সময় দু-এক কলি নামতা মুখস্থ করা আর মাস্টারকে গালি দেওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু শিক্ষা তাঁর হয় নি। পোরবন্দর থেকে তাঁর বাবা যখন রাজস্থানিক কোর্টের সভাসদ্ হয়ে রাজকোটে গেলেন, তখন গান্ধীজীর বয়স মাত্র সাত বৎসর। রাজকোটে কিশোর গান্ধী প্রাইমারী থেকে মধ্যস্কুল, এবং মধ্যস্কুল থেকে হাইস্কুলে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স বারো বছর। ঐ সময়ের শিক্ষা সম্পর্কে মহাত্মাজী স্বয়ং বলেন :

"আমি অতিশয় লাজুক বালক ছিলাম। স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কাজ ছিল না। ঘণ্টা বাজার সময়ে পৌঁছতাম, আবার স্কুল ছুটি হলেই ঘরে পালাতাম।… কেননা কারও সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগত না। কেউ যদি আমাকে ঠাট্টা করে—এই ভয় হোতো।"

কিন্তু স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের প্রতিও তার বিশেষ মমতা বা আকর্ষণ ছিল না। নিতান্ত মাস্টারের কাছে গালি খাওয়ার ভয়ে বা মাস্টারকে মিথ্যা কথা ব'লে ঠকাবার অনিচ্ছায় তাঁকে দৈনিক পড়া করতে হোতো। এই সময় তাঁর বাবা একখানি নাটক কিনে আনেন। নাটকখানির নাম—"শ্রবণের পিতৃভক্তি"। বইখানি গান্ধীজী আগ্রহের সঙ্গে পড়লেন। ভারী ভালো লাগলো গল্পটি। বালক শ্রবণ তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ঝোলনায় বসিয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে চলেছে তীর্থদর্শনে। শ্রবণের মতো এমনি একটি পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত সন্তান হওয়ার কথা গান্ধীজীর কিশোর কল্পনায় জেগে উঠলো। গান্ধীজী তাঁর প্রৌঢ়কালেও স্বীকার করেন :

"শ্রবণের মৃত্যু-সময়ে তার পিতামাতার বিলাপ আজও আমার স্মরণ আছে।"

ঐ সময় একটা নাটক কোম্পানিও আসে। সেখানে কিশোর গান্ধী হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের অভিনয় দেখেন। সত্যের জন্যে হরিশ্চন্দ্র সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। গান্ধীজী বলেন :

"এই নাটক দেখে আমার আশা মিটত না। পুনঃ পুনঃ এই নাটক দেখার ইচ্ছা হোতো।…মনে মনে আমি এই নাটক শতবার অভিনয় করেছি। হরিশ্চন্দ্রকে স্বপ্ন দেখতাম।…হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বিপদে পড়ে তাঁরই মতো সত্য পালন করব—এই আমার কাছে সত্য হয়ে উঠল।"

হরিশ্চন্দ্র সংক্রান্ত কোনো অখ্যাত নাটক ও নাটুকে দল একদা এমনি ভাবেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সত্য-সন্ধানীর জন্ম দিয়েছিল। সুতরাং, গান্ধীজীর শৈশবের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা যে এই হরিশ্চন্দ্র নাটকের পাঠ, একথা বলতে দ্বিধা হয় না।

হাই স্কুলে পডবার সময়েই গান্ধীজীর বিবাহ হয়—তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। বাল্যবিবাহ ভারতবর্ষে নতুন কিছু নয়—বিশেষ ক'রে ষাট-সত্তর বছর আগেকার ভাবতবর্ষে। গান্ধীজীর বডোদাদার বিয়ে আগেই হয়েছিল। বাকি ছিলেন মেজদা, সেই সঙ্গে প্রায় সমবয়সী এক খুডতুতো ভাই। সুতরাং, এই তিন জনের বিয়েই এক সঙ্গে দেওয়ার কথা স্থির করলেন অভিভাবকরা। এর কারণ দর্শান গান্ধীজী :

"তাতে একদিকে খরচ যেমন কম হয়, অন্য দিকে বিবাহের আডম্বর আবাব তেমনি হয় বেশী। তা ছাডা তিন বাবেব ব্যয় একবাবে সারতে পারলে টাকাও বেশী খরচ করা যায়।"

গান্ধীজীর সঙ্গে যে-বালিকাটির বিয়ে হোলো, তাঁর বয়সও ছিল গান্ধীজীর সমান। সুতরাং বিয়ের পর গান্ধীজী তাঁব বালিকা বধূকে কৈশোবেব সাথী রূপেই পেলেন।

বিয়ের কাবণে গান্ধীজীর এক বৎসব পডাশুনো বন্ধ রইলো। কেবল তাই নয়, তার পরও পডাশুনোয় তাঁর অমনোযোগ দেখা গেলো এই বালিকা বধূকে কেন্দ্র ক'রে: "স্কুলে গিযেও তার কথাই মনে পডতো, কখন বাত্রি হবে, কখন তার সঙ্গে দেখা হবে—এই ছিল আমার ভাবনা। বিচ্ছেদ অসহ্য বোধ হোতো।"

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই গান্ধীজী তাই বাল্যবিবাহকে তীব্রভাবে নিন্দিত করেছেন। তিনি যে-নিয়মনিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তার জোরে একদিন এই মোহকে জয় ক'রে আপনার পূর্ণ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছিলেন, সে তো সকলেব ভাগ্যে হয় না। সুতরাং এই বাল্যবিবাহেব বিষময় ফলে যে অনেক জীবন যৌবনেই পঙ্গু হয়েছে, একথা স্মরণ ক'রে গান্ধীজী নিজে-ও খেদ করেছেন।

ঐ সময় গান্ধীজীর স্ত্রী কিশোরী কস্তুরবাঈ বছরের অর্ধেকটা সময়, সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, বাপেব বাডিতেই কাটাতেন। ফলে তেরো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে যে-সময়টা কাটিয়েছেন, একত্রে তার পরিমাণ তিন বছরের বেশী হবে না। তাবপর আঠারো বছর বয়সেই তো গান্ধীজী বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত থেকে ফিরে-ও মাস ছয়েক মাত্র তাঁরা একত্র ছিলেন। কারণ, ঐ সময় গান্ধীজীকে প্রায়ই বোম্বাই ও রাজকোটে যাতায়াত করতে হোতো। এই

সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক এসে গেলো। এমনি ভাবেই গান্ধীজী বাল্যবিবাহের কুফল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন ব'লে তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন।

যাই হোক, বিয়ের পরে গান্ধীজীর মেজদার পড়াশুনো বন্ধ হ'লেও তাঁর পড়াশুনো চলতে লাগলো। স্কুলে তিনি শিক্ষকদের স্নেহ-ভালোবাসা সর্বদাই পেতেন। পড়াশুনোর জন্যে দু একটা বৃত্তি-ও পেয়েছিলেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করি, তিনি পড়াশুনো করছেন, তার প্রধান কারণ এই নয় যে, পাঠাভ্যাসের মধ্যে কোনো মোহ বা আকর্ষণ আছে। তার প্রধান কারণ, মাস্টারের কাছে পড়া না করার জন্যে পাছে কোনো মিথ্যা কৈফিয়ত দিতে হয়, তাই। কেবল তাই নয়, পড়া না ক'রে সত্য কারণ ব'লেও নিস্তার পাওয়া যায় না, তাতে-ও মানুষ সন্দেহ করে। একবার এমনি একটি ঘটনায় গান্ধীজীর যে অভিজ্ঞতা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, "বুঝলাম যে, সত্য যে বলতে চায়, সত্য যে পালন করতে চায়, তার অসাবধান হওয়া চলে না।"

তাঁর পরবর্তী জীবনে অহিংসা শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র রূপে দেখা দিয়েছিল এবং অহিংসা ও সত্যের মধ্যে বড়ো একটা পার্থক্য ছিল না। কিন্তু কৈশোরে আমরা লক্ষ্য করি, এই অহিংসা-ও তাঁর পড়াশুনোর মতোই তাঁর সত্যপ্রিয়তাকে আশ্রয় ক'রেই জন্ম লাভ করেছিল।

গান্ধীজী পৃথিবীর আরো অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর মতোই স্বল্পমিত্র ছিলেন কৈশোরে। বিশেষ ক'রে এ বিষয়ে বার্নার্ড শ-র কথা সহজে মনে পড়ে। গান্ধীজীর এই স্বল্পমিত্রতার কারণ-ও ছিল বার্নার্ড শ-র মতোই লাজুকতা। এঁরা দুজনেই বাল্যে ছিলেন লাজুক, কথাটি পর্যন্ত বলতে ভয় করতেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে উভয়ের কথা বলার শক্তি এমন বেড়ে উঠেছিল যে, উভয়েই একদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ব'লে বিখ্যাত হন। যাই হোক, মহাত্মা কৈশোরে একটি বন্ধু পেয়েছিলেন—যার কুখ্যাতি গান্ধী পরিবারের মধ্যে-ও সুপরিচিত ছিল। সুতরাং এই বন্ধুটি সম্পর্কে গান্ধীজীর মা, স্ত্রী ও দাদা, সকলেই তাঁকে একবাক্যে সাবধান করতে লাগলেন। গান্ধীজী তাঁদের বোঝালেন: "তার যে দোষের কথা তোমরা বলছ, আমার তা ভালো ক'রে জানা আছে। কিন্তু তার গুণ কি তা তোমরা জান না। আমাকে সে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না, কেননা, তাকে ভালো করবার জন্যেই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক।"

কিন্তু বন্ধুটি যে গান্ধীজীকে বিপথে আকর্ষণ করলো না বা খানিকটা নিয়েও গেলো না, সেকথা বলা চলে না; বন্ধুটির দেহে ছিল শক্তি। সে একদিন

গান্ধীজীকে বোঝালো, তার দৈহিক শক্তির একমাত্র কারণ, মাংসাহার। আর গান্ধীজী রোগা, তার-ও একমাত্র কারণ, তাঁর বাড়ি বৈষ্ণবের বাড়ি, মাংস সেখানে নিষিদ্ধ। ন্যায় শাস্ত্রের যোগ ও বিয়োগের পদ্ধতি প্রয়োগ না ক'রেও গান্ধীজীর কাছে বন্ধুর যুক্তি অকাট্য মনে হোলো। তিনি বুঝলেন, একটি সবল সুস্থ দেহ তাঁর চাই-ই। সুতরাং মাংস-সেবন অপরিহার্য। গান্ধীজী গোপনে মাংস খেতে লাগলেন। "রুটির ওপর আমার বিতৃষ্ণা কমলো, ছাগলের জন্যে মায়া পালালো এবং মাংস নয়—মাংসযুক্ত পদার্থের স্বাদ পেতে লাগলাম।"

কিন্তু মুশ্‌কিলটা হ'লো অন্য দিকে। বাড়িতে মিথ্যাকথা বলতে হয়। "যেদিন এই খানা খাওয়া হোতো, সেদিন বাড়িতে গিয়ে আর খাওয়া যেতো না। মা খেতে ডাকতেন। তাঁকে বলতাম—'আজ ক্ষুধা নেই'—'আজ হজম হয় নি'। এইভাবে নানা বঞ্চনা বাক্য রচনা করতে হোতো। এ সব বলতে প্রতিবারেই মনে আঘাত লাগতো। একে তো মিথ্যা, তাও আবার মায়ের সামনে! এ চিন্তা আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করতো। আমি স্থির করলাম, মাংস খাওয়ার আবশ্যকতা আছে, মাংসাহার প্রচার ক'রে ভারতবর্ষের সংস্কার করব, কিন্তু পিতামাতাকে ঠকানো ও মিথ্যা কথা বলা, মাংস না খাওয়া অপেক্ষা-ও নিন্দনীয়।"

বলাই বাহুল্য, ভারতবাসীকে মাংস ভক্ষণের সুযোগ দেওয়ার জন্যে গান্ধীজী সামাজিক বিপ্লব করেন নি। কেবল তাই নয়, পরবর্তী জীবনে মাংসের প্রতি বিরূপ ভাবটি তাঁর মধ্যে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, যখন নিজের বা স্ত্রী-পুত্রের অসুস্থতার ফলে মাংসের সুরুয়া ভক্ষণের বিষয়টি তাঁদের জীবনমৃত্যুর সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো, তখনো তিনি মাংসাহারকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর মতে মাংসাহারের চেয়ে মৃত্যু ভালো। এ বিষয়ে বার্নার্ড শ-র কথা আবার মনে পড়ে। ডাক্তার যখন রোগ-শয্যায় মুমূর্ষু শ-কে মাংস খেতে অনুরোধ করেছিলেন, তখন জবাবে শ বলেছিলেন, "Death is better than cannibalism." যাই হোক, এখানে আমরা একটি বস্তু লক্ষ্য করি। জীবজন্তুর প্রতি করুণার চেয়ে সত্যপ্রিয়তাই গান্ধীজীকে অহিংসার দিকে সেদিন এগিয়ে দিয়েছিল। আরো লক্ষ্য করি, গান্ধীজীর জীবনের মূল কথাটি, অহিংসার চেয়ে-ও এই সত্যপ্রিয়তার মধ্যেই নিহিত আছে। তবে এখানে এ কথার-ও উল্লেখ প্রয়োজন, রসনা-তৃপ্তির জন্যে তিনি মাংসাহার শুরু করেন নি। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দেন: "মাংসাহারের শখ আমার ছিল না। আমাকে যে বলবান ও সাহসী হতে হবে, অপরকে-ও সেই প্রকার করতে হবে। ইংরেজকে হারিয়ে দেশ স্বাধীন করা চাই।"

এই কৈশোরেও গান্ধীজী দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার স্বপ্ন দেখতেন। না দেখাই ছিল অস্বাভাবিক। শিশুকালেই তিনি দেখেছেন, সাদা সাহেবরা কতো অবহেলায় এ-দেশের রাজা বা মন্ত্রীকে পর্যন্ত অপমান করে। তাঁর বাবাকে তো অন্যায় ভাবেই হাজতে রেখেছিল। সুতরাং ইংরেজ তাড়াবার জন্যে বীর্যের প্রয়োজন। তখনো গান্ধীজীর কাছে বীর্য ছিল দৈহিক বল। যে-মানসিক শক্তিকে শ্রেষ্ঠ বীর্য ব'লে তিনি একদা দুনিয়ার সমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন, তার সন্ধান বা উপলব্ধি ঘটতে তখনো অনেক দেরি ছিল।

সত্যাচরণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী মাংসাহার বর্জন করলেন, কিন্তু বন্ধুকে বর্জন করলেন না। বন্ধু তাঁকে ধাপে ধাপে অধঃপতনের গভীর গহ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। গান্ধীজীর মনে তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করলো, তাঁকে বেশ্যালয়ে নিয়ে গেলো। কিন্তু গান্ধীজী স্বভাবত লাজুক হওয়ায় তিনি এই কুৎসিত আচরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন। "সেই ঘরে (গণিকালয়ে) গিয়ে আমি যেন অন্ধের মতো হয়ে গেলাম। আমার কথা বলার শক্তি-ও রইল না। লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে সেই স্ত্রীলোকের পাশে খাটিয়ায় বসেছিলাম। স্ত্রীলোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথমে দুচার কথা আমাকে শোনালো, তারপর আমাকে দরজা দিয়ে বার ক'রে দিল।" স্ত্রীর প্রতি তাঁর যে মিথ্যা সংশয় জন্মেছিল এবং স্ত্রীকে সন্দেহ ক'রে তাঁর (স্ত্রীর) প্রতি তিনি যে অবিচার ও অত্যাচার করেছিলেন, সে সম্পর্কে-ও গান্ধীজী উদাসীন নন। তিনি পরে বলেন, "এই অত্যাচারের জন্যে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারি না।"

গান্ধীজীর কৈশোরের আরো একটি ঘটনা বড়ো কৌতুকাবহ লাগে, বিশেষ ক'রে তাঁর পরবর্তী জীবনের সঙ্গে তুলনা ক'রে। সেটিরও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ শৈশবে বা কৈশোরেই নিহিত থাকে, ভবিষ্যৎ জীবনে সেগুলি প্রকাশ পায় পরিপূর্ণ বিকাশ বা ঘোরতর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মহাত্মাজীর পরবর্তী জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—সত্যপ্রীতি, অহিংসা ও উপবাস, এগুলির ক্ষীণ সংকেত আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। এগুলি ছাড়া, তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্যের সংকেত আমরা কৈশোরেই পাই। সেটি মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, মৃত্যুকে শ্যাম-সমান ব'লে কৈশোরে রাধিকার ভূমিকায় তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আবার যৌবনে তিনি জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর 'বর-বধূর' সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মৃত্যুর তটভূমিতে দাঁড়িয়েও তিনি অভিবাদন জানিয়েছিলেন মৃত্যুকে 'শান্তি পারাবার' ব'লে।

রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মৃত্যুর সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্কটি কিন্তু আরো অপরূপ। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে মিত্র ব'লে অনুভব করেছেন ভাবলোকে, ভাবলোকেই তাকে জানিয়েছেন আমন্ত্রণ। কিন্তু গান্ধীজী মৃত্যুকে ক্রীড়াসহচররূপে বারে বারে আহ্বান করেছেন, কেবল ভাবে নয়, কার্যেও। তার প্রমাণ তাঁর জীবনের সপ্তদশ বার অনশন। প্রতিবারেই দেখেছি, মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর অপূর্ব খেলা, দুঃসাহসিক রসিকতা। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি করেছিলেন ভাবে; টলস্টয় মৃত্যুকে এতো বেশী চিন্তা করতেন যে মনে হোতো, তিনি বুঝি মৃত্যুকে ভয় করেন, মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর লীলা বুঝি নিরুপায় মূষিকের লীলা মার্জারের সঙ্গে। এমন কি মহামানব যিশুও ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখে নিজেকে অসহায় বোধ করেছিলেন, বিধাতার করুণায় 'বিধাতা-পুত্রেরও' সংশয় জন্মেছিল: "My God, My God, why hast Thou forsaken me?" এ-বিষয়ে পৃথিবীতে গান্ধীজীর একমাত্র তুলনা মেলে গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের মধ্যে। হেম্‌লকের বিষ পান ক'রে-ও মৃত্যুতে নির্লিপ্ত নির্বিকার সক্রেতিস হাসিমুখে শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করছেন, যেন কিছুই ঘটে নি,—কয়েক মুহূর্ত পূর্বের জীবন ও কয়েক মুহূর্ত পরের মৃত্যু, এর মধ্যে যেন কোনো ভেদ নেই, কোনো ছেদ নেই। কিন্তু তাঁকেও গান্ধীজীর মতো ক্রীড়াচ্ছলে মৃত্যুকে বারে বারে আলিঙ্গন করতে আমরা দেখিনি। সক্রেতিস ও গান্ধীজীর উভয়ের কাছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ভেদ ছিল না। যেমন নদীর এপার ওপারের মধ্যে থাকে না, সে ছিল তেমনি। তাই মৃত্যুর প্রতি তাঁদের এই ঔদাসীন্য। তাই বুঝি জীবনের পূজায় মৃত্যুকে গান্ধীজী অবহেলা করেছেন, তাই মৃত্যুকে ইচ্ছামতো ভৃত্যের মতো আহ্বান করেছেন বারে বারে। আর তাই বুঝি একদিন তাঁর অতর্কিতে তাঁর মৃত্যু তাঁর ওপর এমনি ভাবে প্রতিশোধ নিয়ে বসেছিল!

কৈশোরে আমরা লক্ষ্য করি, গান্ধীজী একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে-বার তিনি মৃত্যুর আতঙ্কে পরাভূত হয়ে এসেছিলেন পালিয়ে। কিন্তু গান্ধীজীর চরিত্রে পরাভবের স্থান ছিল না। তাই মৃত্যুর কাছে কৈশোরের এই পরাভবই বুঝি তাঁকে একদিন মৃত্যুঞ্জয়ী ক'রে তুলেছিল।

আত্মহত্যার কাহিনীটি এইরূপ: অন্যান্য লোককে ধূমপান করতে দেখে কিশোর গান্ধীর ধূমপান করবার ইচ্ছা হোলো। প্রথমে তিনি উচ্ছিষ্ট পোড়া বিড়ি সংগ্রহ ক'রে খেতে লাগলেন। কিন্তু তাতে মজা জমলো না। তাই তিনি বিড়ি কেনার পয়সা জোগাড়ের চেষ্টায় চাকরদের পকেট থেকে দুচারটা পয়সা চুরি করতে লাগলেন। আবার এলো সেই মিথ্যাভাষণ ও আত্মগোপনের তীব্র দংশন। কিন্তু

বিড়ি কেনবার মতো পয়সাও জোটে না। কেবল তাই নয়, পরাশ্রয়িতা, পর-নির্ভরশীলতা এবং গুরুজনদের কাছে অকারণ আনুগত্য, এগুলিও কিশোর গান্ধীকে ব্যস্ত করলো। অবশেষে নিরুপায় হযে তিনি আত্মহত্যাই স্থির করলেন। কিন্তু আত্মহত্যাও করতে পারলেন না। গান্ধীজী বলেন: "আমি বুঝেছি, আত্মহত্যার কথা বলা সহজ, কিন্তু আত্মহত্যা করা সহজ নয। সেজন্যে যখন কেউ আত্মহত্যার ধমক দেয়, তখন তা আমার উপর খুব স্বল্পই প্রভাব বিস্তার করে, অথবা মোটেই প্রভাব বিস্তার করে না—একথা-ও বলা যেতে পারে।"

গান্ধীজীর এই কথাগুলির প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা চলে যে, গান্ধীজী যতোবার 'আমরণ' অনশন করেছেন, সেগুলিকে তাঁর প্রতিপক্ষ প্রতিবারেই বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছে যে, গান্ধীজী আত্মহত্যার ভয় দেখিযে 'ব্ল্যাকমেল' করতে চান। উপরের কথাগুলি থেকে সহজেই বোধগম্য হবে, আত্মহত্যার ভয় দেখিযে যে কারো ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা যায, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, কোনো ন্যায়সংগত দাবির সমর্থনেই কেবল যখন অনশন করা হয, তখনই তা সফল হ'তে পারে। অর্থাৎ অন্যাযকে অনশন ন্যাযসংগত করে না, বা শক্তিমান্ করে না। কেবল ন্যায়সংগতকে, নীতিসংগতকে অনশন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করতে পারে। তাই তাঁর কার্যের প্রতিবাদে যখন প্রতিক্রিয়াশীল কেউ অনশন করেছে, তখন তিনি অসংগত বোধে তাকে উপেক্ষা করেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল, যা ন্যাযসংগত, যা নীতিসংগত, অর্থাৎ যা সত্য তা মানুষের বিবেককে, বুদ্ধি-চেতনাকে জাগ্রত করবেই। আর যা অন্যায, তার আস্ফালন যতোই আকাশস্পর্শী হোক, তার প্রতারণার জাল যতোই মনোহর হোক, তার ব্যর্থতা অনিবার্য।

এই ধূমপান প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় থেকে চির-জীবনের জন্যে গান্ধীজী ধূমপান পরিত্যাগ করেন। একবার কোনো এক সিগারেট ব্যবসায়ী "মহাত্মা গান্ধী" নামে সিগারেট বার করেছিল। গান্ধীজী তাঁর "ইয়াং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় তার প্রতিবাদে লেখেন: "আমার নামের যতো প্রকার অপব্যবহার ঘটেছে, সেগুলির মধ্যে সিগারেটের সঙ্গে আমার নামের ইচ্ছাকৃত যোগের মতো অপমানজনক আর কিছুই হয় নি। ধূমপানকে আমি পাপ ব'লে মনে করি। ধূমপান মানুষের বিবেককে প্রাণহীন ক'রে দেয়। মদের অপেক্ষা-ও তা অনিষ্টকর। কারণ তা অগোচরে কাজ করতে থাকে।"

ধূমপান সম্পর্কে টলস্টয়ের মতামত মনে পড়ে। তিনি-ও ওই একই কথাই

বলেছেন। তিনি বলেন, মদ্যপানের অপেক্ষা ধূমপান অনিষ্টকর। কারণ, লোকে মদ খেয়ে যে পাপ করতে সাহস করে না, ধূমপান ক'রে তারা তা সহজে করে।

আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ ক'রেই আমি গান্ধীজীর শৈশব ও কৈশোরের কাহিনী শেষ করবো। প্রথমটি, সত্যের শক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয়টি, পরধর্ম সম্পর্কে সচেতন সহিষ্ণুতা।

ভারতবর্ষে সত্য কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইংরেজীতে Truth বা Reality বলতে যা বোঝায়, এ কেবল তাই নয়। (যদিও মূল এবং প্রাথমিক অর্থে যা সৎ, অর্থাৎ যা আছে, তাই সত্য।) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে হরিশ্চন্দ্র যে সত্যপালন করেছিলেন, তা অঙ্গীকার বা শপথ, অর্থাৎ তা সত্যের ব্যাপকতর রূপ। গান্ধীজীর কাছে সত্য হোলো চিন্তার সঙ্গে চিন্তার, চিন্তার সঙ্গে কাযের এবং কার্যের সঙ্গে কাযের সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যবিধান-ই মহাত্মা গান্ধীর সত্য-প্রয়োগের শেষ কথা। পৃথিবীর দ্বন্দ্বশীল সমাজ-ব্যবস্থায় এই সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা এতই কঠিন যে, গান্ধীজীর মতো প্রতিভাকে-ও জীবনে বহুবার অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, যার ফলে তাঁর প্রতিপক্ষরা, এমন কি অনেকক্ষেত্রে স্বপক্ষীয়েরা-ও, তাঁকে বিপরীতধর্মিতার দোষে দুষ্ট ব'লে তিরস্কার করতে বা তাঁকে কাপট্যের অপরাধে অপরাধী করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। মানুষকে কেন, সর্পকে-ও যখন তিনি মন্দ ব'লে বিশ্বাস করতে পারেন না, তখনই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের অন্যায়, নৃশংসতা, জিঘাংসা ও স্বার্থপরতা। মন্দের সঙ্গে ভালোর এই সামঞ্জস্য বিধান করতে আজীবন চেষ্টা করেছিলেন তিনি, তাই তাঁকে প্রশান্ত গম্ভীর মহিমান্বিত এক বিশ্বাসের মধ্যে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। গান্ধীজীর কাছে সামঞ্জস্য বিধানই ছিল সত্য, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। বিরুদ্ধভাবাপন্ন এই পৃথিবীতে, যার গতি, যার সংক্রান্তি নিরবধি ঘটছে আঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে, গান্ধীজী সেখানে তাঁর বিরাট শক্তি নিয়েও সামঞ্জস্য বিধান করতে এসে বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। জমিদার যখন প্রজাপীড়ন করছে, তখন-ও তিনি যেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, তেমনি আবার উদ্বেলিত হয়ে পড়েছেন প্রজারা যখন জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তখন। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যেই জুলুদের বিদ্রোহে যখন তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে, তখন তিনি জুলুদের শত্রু পক্ষে থেকে সেবার কাজ করেছেন। তাই বৃটিশের সঙ্গে যখন তাঁর চূড়ান্ত শত্রুতা চলেছে, তখনো তিনি বৃটিশকে বারে বারে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন সেবা দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, এমন কি যে হিংসাত্মক যুদ্ধের প্রতি তাঁর পূর্ণ বিরাগ রয়েছে, সেই যুদ্ধেও

সৈন্য ও সরঞ্জাম দিয়ে। পৃথিবীতে ঘৃণাও সত্য, ভালোবাসাও সত্য, বিদ্বেষ-ও সত্য, মৈত্রী-ও সত্য। কিন্তু এই খণ্ড সত্যকে, বিপরীতধর্মী সত্যকে, গান্ধীজী স্বীকার করেন নি। তাঁর কাছে সত্য অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। তা খণ্ডিত বা দ্বন্দ্বিত নয়, তা অব্যয় ও পরম। এই ধরনের দার্শনিক যাঁরা, তাঁরা পৃথিবীকে প্রধানত তিনটি বিকল্প রূপে দেখেন। এক দল: তাঁরা দেখেন পৃথিবীকে শোপেন্‌হাউয়ের-নীট্‌শে গোষ্ঠীর মতো কুৎসিতরূপে, যেখানে সন্দেহ, সংশয়, বেদনা, যন্ত্রণা, শাসন, অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নেই। অন্যদল: তাঁরা খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব দার্শনিকদের মতো দেখেন সমস্তই সুন্দর, সমস্তই প্রেম, সমস্তই মৈত্রী, সমস্তই শান্তি। আর একদল: তাঁরা ভালো-মন্দ, প্রেম-ঘৃণা, সুন্দর-অসুন্দরের উর্ধ্বে ব'লে বিশ্বাস করেন পরম সত্যকে। সুতরাং জাগতিক ঘটনা তাঁদের কাছে মায়া মাত্র। সে সমস্ত বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

দ্বিতীয় দলের মানুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। পৃথিবী তাঁর কাছে ছিল সৌন্দর্যময়, প্রেমময়। তাই মহাত্মার অ্যাবসোলিউট বা অখণ্ড সত্যের মধ্যে হিংসার স্থান নেই, ঘৃণার স্থান নেই—তা কেবল প্রেম, কেবল ক্ষমা, কেবল অহিংসা। তাই গান্ধীজী হিংসার সঙ্গে অহিংসার, ঘৃণার সঙ্গে প্রেমের, বিদ্বেষের সঙ্গে মৈত্রীর, কুৎসিতের সঙ্গে সুন্দরের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন সমস্ত জীবন। তাই পৃথিবীর অমোঘ নিয়মে মহাত্মার সেই সামঞ্জস্য-বিধানের পরিণতি ঘটেছে ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যুতে, মানব-বিষধরের ভয়ংকর দংশনে। তবু-ও এই অখণ্ড সত্যের পূজারী, এই সামঞ্জস্য-বিধায়ক-প্রতিভার স্থান চিরদিনই থাকবে মানব সভ্যতার অন্যতম গৌরবশিখর-শীর্ষে। কারণ, এই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের মহান্ স্বপ্ন-কল্পনা এক বিরাট শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব প্রয়াস। তাই মহাত্মা এক কল্পিত সত্যের অতুলনীয় শিল্পী, অদ্বিতীয় প্রয়োগকর্তা।

কৈশোরে সত্যের রূপটি মহাত্মার কাছে ধরা দিয়েছিল সত্য-পালন অর্থাৎ শপথ-রক্ষা এবং সত্যবাদিতার মধ্য দিয়ে। চিন্তার সঙ্গে চিন্তার, চিন্তার সঙ্গে কার্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে হ'লে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করা, অর্থাৎ অঙ্গীকার পূরণ এবং কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা, অর্থাৎ সত্যভাষণ। তাই গান্ধীজীর পরবর্তী জীবনে আমরা দেখি, নিজের অঙ্গীকার অনুসারে কাজ করবার জন্যে তাঁর নির্ভীক তেজ এবং সত্যভাষণ ব্যাপারে তাঁর অকুণ্ঠ অটল দৃঢ়তা। কিন্তু এই সদা-সত্যভাষণের নির্ভীক বীর্য লাভ কেমন ক'রে সম্ভব? সত্যের মধ্য দিয়েই গান্ধীজী সে-বীর্যের সন্ধান-ও পেয়েছিলেন কৈশোরেই। সেই কাহিনীটি বলছি:

গান্ধীজীর মেজদার পঁচিশ টাকার মতো ধার হয়েছিল। সেই টাকা কেমন ক'রে শোধ করা যায়, সে এক বিষম সমস্যা হয়ে উঠলো দু ভাইয়ের কাছে। অবশেষে স্থির হোলো, বাপ-মার অজ্ঞাতে মেজদার হাতের সোনার নিরেট তাগার খানিকটা বিক্রি ক'রে দেওয়া যেতে পারে। গান্ধীজীর নিজের কথায়ঃ "তাগা কাটলাম। ঋণ শোধ হোলো। কিন্তু আমার পক্ষে এই কাজ অসহ্য হয়ে উঠল। এর পর আর চুরি না করা স্থির করলাম। বাবার কাছে সমস্ত স্বীকার ক'রে ফেলা দরকার—এইরূপ মনে হতে লাগল। কিন্তু জিভ সরে না। বাবার কাছে যে মার খাব সে ভয় ছিল না। তিনি কোনোদিন আমাদের কোনো ভাইকে তাড়না করেছেন ব'লে-ও স্মরণ হয় না। কিন্তু তিনি খুব দুঃখ পাবেন, হয়তো মাথা কুটবেন। অথচ এই বিপদের ভয় রেখে-ও দোষ স্বীকার করা চাই। নইলে যে শুদ্ধি হবে না।"

গান্ধীজী একটি চিঠিতে বাবাকে অপরাধের কথা জানালেন। পুত্রের এই সত্য স্বীকারে পিতার চক্ষু অশ্রুতে ভ'রে গেলো। পিতা সস্নেহে পুত্রকে ক্ষমা করলেন। "এই প্রকার শান্ত ক্ষমা পিতৃদেবের স্বভাবের প্রতিকূল ছিল। আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে, তিনি রাগ করবেন, কটুবাক্য বলবেন, হাত বা মাথা কুটবেন। কিন্তু তিনি দেখালেন অপার শান্ত ভাব। আমার দোষ-স্খালনকারী স্বীকৃতিই এর কারণ ব'লে আমি মনে করি।" গান্ধীজীর মতে, সেদিন তিনি তাঁর পিতাকে সত্যাচরণের দ্বারা জয় করেছিলেন। সত্যের প্রশান্ত বীর্যই তাঁর কোপনস্বভাব পিতাকে পরাভূত করেছিল। কেবল তাই নয়, পিতার অশ্রু—যা ছিল প্রেম ও অহিংসা, তাই জয় করেছিল তাঁর কিশোর পুত্রকে। পরবর্তী কালে গান্ধীজী বলেন, "তখন অবশ্য আমি এতে (পিতার ক্ষমা-শান্ত অশ্রু-বির্জসনে) পিতার প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দেখি নি। কিন্তু আজ আমি এতে শুদ্ধ অহিংসারই পরিচয় পাচ্ছি। এইরূপ প্রেম যাকে ব্যাপক ভাবে পেয়ে বসে, সে ব্যক্তির স্পর্শে কে না গলে যাবে?"

এমনি ভাবে কৈশোরেই গান্ধীজী সত্যের এবং অহিংসার বিজয়ী শক্তির অভিজ্ঞতা ঘটেছিল।

গান্ধীজীর ধর্মভাব এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতাও জন্মেছিল শৈশবেই। ভূতের ভয়ে গান্ধীজী যখন কাতর হতেন, তখন তাঁর দাই রম্ভাবাঈ তাঁকে বোঝাতো, রাম নাম করলে ভূতের ভয় থাকে না। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজী বলেন, "রাম নাম আজ আমার কাছে অমোঘ শক্তি। রম্ভাবাঈয়ের রোপিত বীজই তার কারণ ব'লে মনে করি।"

ভূতের ভয়ের মতো একটা ভীরুতা থেকেই যে ভগবানের জন্ম, তা অতি-আধুনিকরাও স্বীকার করেন।

বিলাতে অবস্থান-কালের বর্ণনা প্রসঙ্গেও গান্ধীজী বলেন: "রোজ ঈশ্বরের নিকট আমাকে রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা করতাম। তাঁর অনুগ্রহও পেয়েছিলাম। ঈশ্বর কে তা আমি জানি না। কিন্তু সেই রক্তার দেওয়া শ্রদ্ধা নিজের কাজ করছিল।"

রাজকোটে থাকাকালে শৈশবেই গান্ধীজী হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও পারসী ধর্মাবলম্বীদের সংস্রবে আসেন। এঁরা সকলেই তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ফলে এই সকল ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা শৈশবেই তাঁর মধ্যে গ'ড়ে ওঠে। বাকি ছিল একমাত্র খ্রীষ্টান ধর্ম। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি প্রথমে গান্ধীজীর ছিল অভক্তি। কারণ, হাইস্কুলের এক কোণে দাঁড়িয়ে পাদরীরা যখন খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিত, তখন তারা হিন্দু ও হিন্দুর দেবতাদের গালাগালি করতো। কিন্তু গান্ধীজী পরবর্তী জীবনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি এমন আকৃষ্ট হন এবং খ্রীষ্টের বাণীগুলিকে এমনভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে খ্রীষ্টের সঙ্গে গান্ধীজীর নাম অনেকের কাছে আজ অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান একথাও বলেছেন, গান্ধীজীর জীবনের সঙ্গে খ্রীষ্টের জীবনের বহু ঘটনার হুবহু মিল দেখা যায়। এ কথা অত্যন্ত সত্য। খ্রীষ্টান শাস্ত্রের "সারমন অন দি মাউণ্ট" অধ্যায়টি গান্ধীজীকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট ও অভিভূত করেছিল।

এইরূপেই এই মানব-বনস্পতির পূর্বাভাস আমরা শৈশবে এবং কৈশোরে অঙ্কুরে লক্ষ্য করি।

কৈশোরেই গান্ধীজীর পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে বোম্বাই থেকে বিলাত রওনা হন। তখন তাঁর বয়স উনিশ বৎসর এবং তিনি সন্তানের পিতা।

॥ দুই ॥

ম্যাট্রিক পাশ করবার পর গান্ধীজী ভাওনগরে শামলদাস কলেজে পড়তে যান কিন্তু মুশকিল হোলো, কলেজের লেক্চার তিনি বুঝতে পারেন না। অথচ প্রফেসরদেরও কোনো দোষ ছিল না। তখনকার দিনে শামলদাস কলেজে যাঁরা অধ্যাপনা করতেন, তাঁরা সকলেই প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক ব'লেই পরিচিত ছিলেন। ঐ সময় প্রথম কয়েক মাসের পড়া শেষ ক'রে গান্ধীজী বাড়ি ফিরে এলে তাঁদের পরিবারের এক হিতৈষী বন্ধু বললেন, "এখন দিনকাল বদলেছে। ছেলেদের মধ্যে কাউকে যদি কাবা গান্ধীর স্থান নেওয়াতে হয়, তবে শিক্ষিত না করলে চলবে না।" তিনি আরো বললেন, "মোহনদাসকে বিলাত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনাই সবচেয়ে ভালো। তাহ'লে বাবার চাকরিটা সে অনায়াসে পেতে পারবে।" এই প্রস্তাবে গান্ধীজীরও কোনো আপত্তি ছিল না। "আমাকে বিলাত পাঠালে তো খুব ভালোই হয়। কলেজে তাড়াতাড়ি পাস করতে পারব মনে হয় না।"

কিন্তু গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল বিলাতে গিয়ে ডাক্তারি শেখা। আমরা পরে লক্ষ্য করবো, জনসেবা ও জনকল্যাণের কারণেই হোক, কিম্বা সহজাত কোনো প্রবণতার ফলেই হোক, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে গান্ধীজী চিরদিন আলোচনা, গবেষণা ও অনুশীলন ক'রে এসেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান উপদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর "স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশ" (Guide to Health) পুস্তকখানিতে।

তিনি পরবর্তী জীবনে জার্মান জল-চিকিৎসক ডাক্তার লুই কুহ্নে-র জল-চিকিৎসা পদ্ধতিতে-ও গভীর বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এমন কি জল-চিকিৎসা ক'রে তিনি নিজের পুত্রের কঠিন টাইফয়েড রোগও সারিয়ে তোলেন।

ডাক্তারির প্রতি একটি সহজ প্রবণতা থাকা সত্বে-ও পারিবারিক কারণে ডাক্তারি পড়া তাঁর হোলো না। দাদা প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "বাবা তা পছন্দ করতেন না। তোমার কথাতেই বলতেন, আমরা পরম বৈষ্ণব, আমাদের হাড়-মাংস কাটার কাজ করতে নেই। বাবার ইচ্ছা ছিল তুমি উকিল হও।"

সুতরাং ব্যারিস্টার হওয়াই স্থির হোলো। টাকা-পয়সাও কোনো রকমে সংগ্রহ হোলো। কিন্তু ছেলেকে বিলাত পাঠানো মায়ের পছন্দ হোলো না। ছেলেরা বিলাত গিয়ে মদমাংস খায়, মেয়ে নিয়ে বিগড়ে যায়। কিন্তু গান্ধীজী মাকে

বোঝালেন, "……আমি তোমাকে প্রতারণা করব না। দিব্যি নিয়ে বলছি, ঐ তিন বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচাব।"

গান্ধীজী এই শপথ গ্রহণ করায় মা তাঁকে বিলাত যাওয়ার আদেশ দিলেন।

কিন্তু আরো একটি অন্তরায় দেখা গেলো। জাতের প্রধানরা একত্রিত হয়ে এই বিলাত-যাত্রার বিরোধিতা করতে লাগলেন, গান্ধী-পরিবারকে জাতিচ্যুত করার ভয় দেখালেন। কিন্তু গান্ধীজীর দাদা তাতে ভয় পেলেন না। কনিষ্ঠের বিলাত-যাত্রার সকল সুব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

এই সময় জুনাগড় থেকে এক উকীল, ত্র্যম্বক রায় মজুমদার-ও ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে বিলাত যাচ্ছিলেন। তিনিই হোলেন মোহনদাসের পথের সঙ্গী।

জাহাজে অনেকের সমুদ্র-রোগ হয়, গা বমি-বমি করে। গান্ধীজীর তা হয় নি। জাহাজে সবচেয়ে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল কথা বলা নিয়ে। কারণ, সবার সঙ্গেই ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। এ-ব্যাপারে কিন্তু মজুমদারের কোনো বালাই ছিল না। তাঁর মতে ইংরেজি বিদেশীর ভাষা, সুতরাং ভুলচুক তাতে হবেই। তা নিয়ে ব্যস্ত হ'লে চলবে না। ভুল ইংরেজি তিনি অনর্গল বলতেন এবং গান্ধীজীকে-ও তাই করবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন লাজুক। ভুল বলতে তাঁর বড়ো লজ্জা করতো, আর ভুল করবার ভয়টা-ও ছিল ভয়ানক। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে নীরব থাকতে হোতো। এই সময় একজন ইংরেজ ভদ্রলোক গান্ধীজীর সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করেন এবং খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। গান্ধীজীর নিরামিষ আহারের কথা শুনে তিনি হো হো ক'রে হেসে ওঠেন, বলেন, "বিস্কে উপসাগরে গিয়ে পৌছলেই বুঝতে পারবে। ইংল্যাণ্ডে যা শীত, তাতে মাংস ছাড়া চলেই না।"

কিন্তু বিস্কে উপসাগরে এসে-ও গান্ধীজী দেখলেন, মাংসাহারের কোনো প্রয়োজনই নেই।

গান্ধীজী সাদাম্পটন বন্দরে এসে পৌছলেন। তাঁর কাছে চারখানি পরিচয়পত্র ছিল—ডাক্তার প্রাণজীবন মেহ্‌তা, দৌলতরাম শুক্ল, প্রিন্স রণজিৎ সিংজী ও দাদাভাই নওরোজীর নামে। সাদাম্পটন থেকে ডাক্তার মেহ্‌তার নামে একটা তার ক'রে দিয়ে মজুমদারের সঙ্গে গান্ধীজী ভিক্টোরিয়া হোটেলে এসে উঠলেন। যথাসময়ে ডাক্তার মেহ্‌তা এলেন এবং তিনি তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ বন্ধুর বাড়িতে গান্ধীজীর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ইংরেজ বন্ধুটি গান্ধীজীকে নিজের কনিষ্ঠ-

সহোদরের মতো দেখতে লাগলেন, ইংরেজি রীতিনীতি আদব-কায়দা শেখালেন। ইংরেজি বলাও অভ্যাস হোলো।

যতো গোলযোগ করলো কিন্তু খাদ্যটা। নুন আর মশলাহীন শাক-সবজি। সকালে ওট মিলের জাউ। বিকালে প্রায় অনাহার। ইংরেজ বন্ধুটি মাংসাহারের জন্যে নানা উপদেশ, পরামর্শ, প্রলোভন দিতে লাগলেন। কিন্তু গান্ধীজী অটল। তিনি তাঁর শপথের কথা জানালেন। অবশ্য মাঝে মাঝে দুর্বলতা-ও বোধ করলেন। ইংরেজ বন্ধুটি হতাশ হলেন না। তিনি বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্ বা ব্যাবহারিকবাদ বিষয়ক লেখা প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু তার কীই বা প্রয়োজন ছিল? দেশেই তো গান্ধীজী মনুস্মৃতি পড়েছিলেন এবং মনুস্মৃতিতে মাংসাহারের সমর্থন-ই পেয়েছিলেন। তখন সর্পাদি জীব ও পোকামাকড় মারা তাঁর কাছে নীতিসংগত বোধ হয়েছিল। কিন্তু তাই ব'লে তো শপথ ভাঙা যায় না! তাই শুভাকাঙ্ক্ষী ইংরেজ বন্ধুটিকে সবিনয়ে তিনি জানালেন, "মাংস খাওয়া উচিত—এ কথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার বন্ধন আমি ছিঁড়তে পারব না।"

বন্ধু-ও এবিষয়ে নিবস্ত হ'লেন, তাঁর ভয় হচ্ছিল, এইভাবে ইংল্যাণ্ডে থাকা গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা।

ওখানে মাস খানেক ধ'রে আদব-কায়দার শিক্ষানবিশী শেষ হবার পরে গান্ধীজীকে অন্য একটি পরিবারে ভর্তি ক'রে দেওয়া হোলো। এখানেও আহারের অসুবিধা ছিল খুব। কিন্তু গান্ধীজী এই সময়ে ফেরিংডন স্ট্রীটে একটি ভেজিটেরিয়ান্ রেস্তোরাঁর সন্ধান পান, কাজেই তাঁর আহারের অসুবিধাটা প্রায় দূর হয়। এখানে তিনি সল্টের লেখা নিরামিষ-আহার সম্পর্কে একখানা বই-ও পান। ফলে এতোদিন যে-নিরামিষ-আহার তাঁর কাছে শপথ মাত্র ছিল, তা তাঁর কাছে যুক্তিসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত, স্বাস্থ্য-সম্মত হয়ে উঠলো। এখন থেকে তিমি নিরামিষাশিতার সমর্থক হয়ে উঠলেন। সল্ট সাহেবের বইখানা প'ড়ে তিনি যে-সব যুক্তি পেয়েছিলেন, তা আরো পুষ্ট হোলো হাউয়ার্ড উইলিয়াম্‌সের লেখা "খাদ্যে নীতিবোধ" (Ethics of Diet) প'ড়ে। এই বইখানিতে বিভিন্ন যুগের জ্ঞানী মহাজনদের আহারের এবং আহার্য সম্পর্কে তাঁদের মতামতের বর্ণনা ছিল। পাইথাগোরাস এবং যিশু যে নিরামিষাশী ছিলেন, তা প্রমাণ করবার চেষ্টা-ও ছিল। এর পর ডাক্তার মিসেস অ্যানা কিংস্‌ফোর্ডের লেখা একখানি বই এবং ডাক্তার এলিন্‌সনের কিছু লেখা গান্ধীজীর যুক্তিকে আরো পুষ্ট করলো। গান্ধীজী বলেন, "এই সকল পুস্তক পড়বার ফল এই হোলো যে, আমার জীবন খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার একটা বড়ো স্থানরূপে গ'ড়ে উঠল। এই সকল পরীক্ষা প্রথম

প্রথম কেবল স্বাস্থ্যের দিক থেকেই করতাম। পরে ধর্মের দিক থেকে-ও এই সকল পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে।”

বিলাতে তাঁর প্রথম দিনগুলি সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন: “এখনো পাঠাভ্যাস আরম্ভ করি নি। সংবাদপত্র পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। এই আরম্ভটা ভাই শুক্লের কৃপায় হয়েছিল। ভারতবর্ষে আমি কখনো সংবাদপত্র পড়ি নি। অনবরত পড়তে পড়তে পড়ার শখ হোলো। ডেলি নিউজ, ডেলি টেলিগ্রাফ, পলমল গেজেট ইত্যাদি সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাতাম।”

শীঘ্র মধ্যেই গান্ধীজী অনুভব করলেন, এবার তাঁর সাদাসিদে পোশাক ছেড়ে একটু শৌখিন হওয়া-ও প্রয়োজন। সুতরাং অচিরে বেশভূষায় পরিবর্তন দেখা গেলো। সে-পরিবর্তন কেবল পরিবর্তন নয়, একেবারে বিপ্লব। কিন্তু কেবল পরিচ্ছদের পারিপাট্য-ও তাঁর যথেষ্ট মনে হোলো না। তিনি ইংরেজ-পুরুষদের মতো নাচ শিখতে শুরু করলেন। আবার নাচের তালে পা ফেলানো নিয়ে ঘটলো এক বিভ্রাট। তাল সম্বন্ধে কান দুটোকে সজাগ করবার জন্যে শুরু হোলো বেহালা-শিক্ষা। কিন্তু নাচ জানলেই তো সভ্য হওয়া যায় না! ইংরেজ সমাজে কাল্‌চার্ড ব'লে পরিচিত হ'তে হ'লে চাই ফরাসী ভাষা জানা। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস থাকাও দরকার। গান্ধীজী ফ্রেঞ্চ শিখতে লাগলেন। বক্তৃতার জন্যে বেল সাহেবের লেখা “ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইলোকিউশনিস্ট” বইখানিও কিনলেন। বক্তৃতার পাঠ শুরু হোলো পিটের বক্তৃতা দিয়ে।

কিন্তু শীঘ্রই গান্ধীজীর মোহভঙ্গ হোলো। কী প্রয়োজন তাঁর নাচে, ফরাসী ভাষায়, বক্তৃতায়? বিদ্যার্থী তিনি। বিদ্যা অর্জন করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং গান্ধীজী এবার বিদ্যাভ্যাসে মন দিলেন। গান্ধীজীর জীবনে এক নূতন যুগের পত্তন হোলো—জ্ঞানার্থীর যুগ। কিন্তু তাঁর এই জ্ঞানার্জন যে অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘটেছিল, তা আমরা পরে যথাস্থানে লক্ষ্য করবো।

গান্ধীজী পড়াশুনোয় মন দিলেন। স্থির করলেন, তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন। সেজন্যে তিনি লাতিন এবং ফরাসী ভাষা শিখতে লাগলেন। প্রতি ছয় মাসে পরীক্ষা হয়। প্রথম বারের পরীক্ষায় গান্ধীজী ফেল করলেন—গোলযোগটা বাধলো লাতিন ভাষায়। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় তিনি ভালোভাবেই পাস করলেন। এই সময় থেকে গান্ধীজীর মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধনের-ও সূত্রপাত হোলো। গান্ধীজী ব্যয়সংকোচের জন্যে ইংরেজ পরিবারের বাইরে এসে দুখানি কামরা ভাড়া নিয়ে থাকতে লাগলেন। এতে তাঁর অর্থ এবং সময় দু-ই প্রভূত পরিমাণে বাঁচলো।

নিজের রান্না-ও তিনি নিজে ক'রে নিতে লাগলেন। ফলে, খাদ্য সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হোলো। এই পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলই পরবর্তীকালে সত্য ও অহিংসার অঙ্গরূপে তাঁর জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এই সময়ে কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে, গান্ধীজী বলেন, তার অন্তর ও বাহিরের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। জীবনের মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তিনি অপার আনন্দভোগ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মনে হোতে পারে, এ কেমন আনন্দ? বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করা, নিজেকে একটা খাঁচায় পুরে আটক রাখা, এতে আবার আনন্দ কী? এর উত্তরে বলবো, বিরাট একটা অঙ্কের যোগফল যখন মিলে যায়, তখন অঙ্ককর্তার যে মানসিক আনন্দলাভ হয়, এ-ও ঠিক তেমনি। অঙ্কের যোগফল নির্ভুল হ'লে সুস্পষ্টভাবে কোনো দৈহিক উপভোগ ঘটে না একথা সত্য, কিন্তু তাতে মনের এবং মস্তিষ্কের (যদি-ও সেগুলি দেহেরই অংশমাত্র) মধুর একটি অনুভূতি ঘটে। কারো কারো কাছে সেই 'মানসিক' আনন্দ 'দৈহিক' আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়। গান্ধীজীর কাছে-ও ছিল তাই। "প্রতিজ্ঞা-পালনের স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম ও স্থায়ী স্বাদ আমার কাছে সেই (উপভোগের) ক্ষণিক স্বাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় লাগলো।"

এমনি ভাবেই অল্পদিনের মধ্যে গান্ধীজী নিরামিষ-আহারের একজন উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠলেন। তখন তিনি বেজওঅটারে থাকতেন। সেখানে তিনি নিরামিষাশীদের একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। ক্লাব গ'ড়ে উঠলো। ওই পাড়ায় থাকতেন কবি স্যার এডুইন আর্নল্ড। তিনি হোলেন এই ক্লাবের সহকারী সভাপতি। এই ক্লাবের আলাপ-আলোচনায় কিন্তু গান্ধীজী অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। বলবার মতো তাঁর অনেক কথা ছিল, কিন্তু বলতে কেমন যেন লজ্জা করতো। বুকের মধ্যে শুরু হয়ে যেতো হাতুড়ির ঘা, হাপরের মতো হাঁপাতো বুকটা। ডাঃ ওল্ডফীল্ড গান্ধীজীকে এ-বিষয়ে তিরস্কৃত এবং উৎসাহিত করতেন। কিন্তু গান্ধীজী কোনো মতেই জোর পেতেন না। এমন কি লিখিত রচনা পাঠ করতে গিয়েও বিব্রত হয়ে পড়তেন।

নিরামিষাশী ক্লাবের অন্যতম সদস্য ছিলেন ডাঃ এলিন্‌সন। তিনি ছিলেন কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের উগ্র প্রচারক। কিন্তু নিরামিষাশী ক্লাবের অনেক সদস্য কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণকে আতঙ্কের চোখে দেখতেন, তাই তাঁরা ডক্টর এলিন্‌সনকে এই ক্লাব থেকে বিতাড়িত করতে চাইলেন। কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত ভারত-বাসীর নিকট সুবিদিত। তিনি ব্রহ্মচর্যের পক্ষপাতী, কৃত্রিম জন্মনিরোধের ঘোরতর বিরোধী। (এ-বিষয়ে আমরা পরে বিভিন্ন স্থলে আলোচনা করবো।) কিন্তু তা-সত্ত্বেও

গান্ধীজী ডাঃ এলিন্‌সনেরই পক্ষ সমর্থন করতে চাইলেন। কারণ, অন্য বিষয়ে ডাঃ এলিন্‌সনের মতামত যাই হোক না কেন, নিরামিষাশী ক্লাবের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই। তিনি যতোক্ষণ নিরামিষাশী থাকবেন, ততোক্ষণ এই ক্লাবের সভ্য থাকবার ন্যায়সংগত অধিকার তাঁর থাকবেই। নিজের মতামত ব্যক্ত ক'রে গান্ধীজী একটি বক্তৃতা লিখলেন। কিন্তু কার্যকালে আবার তাঁর অভ্যস্ত লজ্জা এসে বাধা দিলো। প্রবন্ধটি পড়লেন আর একজন।

পরবর্তী কালে গান্ধীজী যখন অসাধারণ বাক্‌নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রথম জীবনের এই লাজুক ভাবের জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দেন। বলেন, বাচালতা মানুষকে আজে-বাজে কথা বলতে বাধ্য করে। ফলে, মানুষ নিজের অতর্কিতে অনেক সময় অনৃতভাষী হয়ে ওঠে। তাই গান্ধীজী তাঁর জীবনে সত্য-সাধনার অঙ্গরূপে স্বল্পভাষিতার আশ্রয় নিতেন, এবং নিয়মিতভাবে মৌনব্রত অবলম্বন করতেন। তিনি বলেন : "অভিজ্ঞতা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সত্যের পূজারীকে মৌনের সেবা করতে হয়।"

তিনি বলেন, সত্যের পূজায় তাঁর লাজুকতা থেকে তিনি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য-ও পেয়েছিলেন। অবশ্য, লাজুকতার ফলে একবার সত্য গোপন ক'রে যে বিপদে পড়েছিলেন, সেকথাও তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি তাঁর বিলাতে থাকবার প্রথম বৎসরে ঘটেছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের কাছে কৌতুককর হ'লে-ও গান্ধীজীর কাছে তা ছিল একটি সংগ্রামের বস্তু। একদিন ব্রাইটনের এক হোটেলে তিনি খেতে ওঠেন। কিন্তু খাবারের তালিকাটি ফরাসী ভাষায় লেখা থাকায় তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়। তাঁর টেবিলে এক প্রৌঢ়া ভদ্র-মহিলাও ছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে সাহায্য করলেন। ফলে প্রৌঢ়া মহিলাটির সঙ্গে গান্ধীজীর বন্ধুত্ব খুব জমে উঠলো। গান্ধীজী নিয়মিতভাবে ঐ ভদ্রমহিলার বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন। ঐ বাড়িতে এক তরুণী ইংরেজ মহিলার সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ হোলো এবং আলাপটা নিবিড়তর হয়ে উঠলো। তিনি এ-ও লক্ষ্য করলেন যে, এই মহিলাটির সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্যে নানা প্রকারে সুযোগ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। গান্ধীজীর সত্যাশ্রয়ী মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি বুঝলেন, ত্রুটি তাঁরই হয়েছে। প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাকে তাঁর আগেই জানানো উচিত ছিল যে, তিনি বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা। ব্যাপারটি গান্ধীজীর কাছে প্রতারণা ও মিথ্যাভাষণের সমান হয়ে উঠলো। তিনি কোনোমতেই শান্তি পেলেন না, তাই অবিলম্বে প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাটিকে একটি পত্র লিখে তাঁর স্নেহের

জন্যে বহু ধন্যবাদ দিয়ে নিজের সত্য পরিচয় গোপন করবার জন্যে মার্জনা চাইলেন। জানালেন, "যে-ভগ্নীর সঙ্গে আপনি আমার পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি কোনোরূপ অযোগ্য আচরণ করি নি। কতদূর যে যাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে।" এই চিঠির জবাবে শীঘ্রই সস্নেহ মার্জনা এসে পৌছলো। প্রৌঢ়া লিখলেন: "তোমার উদার মনের পরিচয় পেলাম। আমরা দুজনেই খুব খুশি হয়েছি, আর ভারি হেসেছি। আগামী রবিবার আমরা তোমার পথ চেয়ে থাকবো—তোমার বাল্যবিবাহের গল্প শুনবো এবং তোমাকে ঠাট্টা-তামাশা ক'রে আনন্দ পাবো।"

গান্ধীজী বলেন, তাঁর মধ্যে অসত্যের যে বিষ প্রবেশ করেছিল, সেদিন এমনি ভাবেই তার অপসারণ ঘটলো।

বিলাতে আসবার পরেই ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজীর কৌতূহল ও উৎসাহ জন্মে। অবশ্য সেজন্যে কয়েকজন ব্যক্তির প্রভাব বিশেষরূপে দায়ী। বিলাত প্রবাসের এক বছর বাদে দুজন থিওজফিস্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁদের সঙ্গে গান্ধীজী গীতাপাঠ শুরু করেন। এর আগে তিনি সংস্কৃতে কিংবা গুজরাটীতে কোনোদিন গীতা পড়েন নি। অবশ্য, আগেই বলেছি, বাড়িতে বাবাকে গীতা পড়তে তিনি প্রায়ই দেখেছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলির মধ্যে "ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। এই শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে: "বিষয়-চিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি থেকে কামনা—কামনা থেকে ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ থেকে মূঢ়তা এবং মূঢ়তা থেকে জন্মে বিভ্রম। বিভ্রম থেকে জ্ঞানের নাশ হয়। আর যার জ্ঞানের নাশ হয়, সে মৃত-তুল্য।" গান্ধীজী যাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করেছেন, তাকেই তিনি নিজের জীবনে, সবার জীবনে, প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। গান্ধীজীর মধ্যে সমাজ-চেতনা যথেষ্ট প্রবল ছিল। তাই তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন—সমাজের বাইরে গিয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে নয়—সমাজের মধ্যে ফিরে এসে। তাই তিনি সমস্ত জীবন ধ'রে বিষয়াসক্তি সম্পর্কে উপলব্ধ তাঁর এই মহাসত্যকে চূড়ান্ত বিষয়াসক্তির মধ্যেই প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়াসক্তির নাম অর্থনীতি ও রাজনীতি। মহাত্মাজী তাঁর জীবনে একদিকে যেমন এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি মেনে নিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষকে। অবশ্য, পরবর্তী কালে আমরা লক্ষ্য করবো, তাঁর এই তথাকথিত সত্য এবং অহিংসা তাঁকে অসংখ্য মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, গণ শব্দটি হিংসার সঙ্গে হয়ে উঠেছিল একার্থক। তাই গণ শব্দে হয়েছিল তাঁর আতঙ্ক, বহুতে তাঁর অবিশ্বাস।

যাই হোক, তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি এক ও অখণ্ড সত্যের অন্যান্য পূজারীদের মতো সংসার ত্যাগ ক'রে গিরিগুহাবাসী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হন নি, তিনি ফিরে এসেছিলেন সেদিন সন্ন্যাসী-বেশে কোটি কোটি মানুষের গৃহে। কোটি কোটি মানুষের গৃহই হয়েছিল তাঁর আশ্রম, তাঁর যোগসাধনের স্থল। তাই তাঁর পরম 'এক' একদা কিছুদিনের জন্যে হ'লেও অসংখ্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বুদ্ধের মতো সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিবাগী হয়ে সাম্রাজ্য ত্যাগ করেন নি, তিনি সন্ন্যাসী হয়ে ফিরে এসেছিলেন কোটি কোটি ভারতীয়ের মুকুটহীন সম্রাট হয়ে—তাদের রাজনীতির, অর্থনীতির, সমাজনীতির, ধর্মনীতির দৈনন্দিন সমস্যার মধ্যে। অন্যান্য ভারতীয় যোগী বা ধর্মগুরুর সঙ্গে এখানেই গান্ধীজীর মূল পার্থক্য। তিনি অন্যান্য ভারতীয় সন্ন্যাসীর মতো অসংখ্য ক্ষুদ্রকে ত্যাগ ক'রে এক পরম বিরাটের সন্ধানে গেলেন না। তিনি এলেন সেই অদ্বিতীয় পরম বিরাটের সন্ধানে অসংখ্য ক্ষুদ্রের মধ্যে। আর এই কারণেই এমন কি ভারতীয়রা-ও তাঁকে সম্পূর্ণ-রূপে বুঝতে পারলো না। তারা সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে দেখে এসেছে, অখণ্ড একের সাধনায় সন্ন্যাসীরা সকল পার্থিব ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করেছেন। তাঁরা তো এমনিভাবে কই অখণ্ড অদ্বিতীয়ের সন্ধানে সংখ্যাতীত ক্ষুদ্রের মধ্যে ফিরে আসেন নি! সেদিক থেকে পৃথিবীতে গান্ধীজীর তুলনা নেই। এমন কি নেই বুদ্ধের মধ্যে, খ্রীষ্টের মধ্যে। গান্ধীজীর কাছে ধর্ম ছিল অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের উপলব্ধি। আর এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সম্ভব ছিল তখনই, যখনই তাকে অসংখ্য মানুষের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ঘটনা ও আচারের মধ্যেও প্রয়োগ করা ছিল সম্ভব। তাই গান্ধীজী অর্থনীতির, রাজনীতির ও সমাজনীতির মধ্যে প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর সত্যের ও অহিংসার ধর্মকে। তাই তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ গৃহত্যাগ ক'রে নির্জন অরণ্যে গিয়ে আশ্রম রচনা করুক, এ নয়। তিনি চেয়েছিলেন, তাদের কোটি কোটি গৃহ পরিণত হোক আশ্রমে, এই। পৃথিবীতে তাঁর সগোত্রদের মধ্যে তাঁর জোড়া মেলে না, এই কারণেই যে, তিনি যাকে মূল সত্য ব'লে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে যে সিদ্ধান্তে মানুষ উপনীত হ'তে পারে, তা তিনি তাঁর জীবনে, তাঁর সমাজে প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত হন নি। এ বিষয়ে তাঁর মধ্যে কখনো কণামাত্র দ্বিধা, সংকোচ, আতঙ্ক বা কাপট্য দেখা যায় নি। কিন্তু অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের যুক্তি থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌছা যায়, এই খণ্ডিত দ্বন্দ্বিত সত্যের পৃথিবীতে তার প্রয়োগ অসম্ভব। এখানে ১ যেমন সত্য, তেমনি সত্য —১-ও। এখানে যা আছে, তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যা নেই-ও। সত্তা

যখন আছে, তার প্রতিসত্তা-ও থাকবে। ক্রিয়া থাকলে তার প্রতিক্রিয়া থাকা অবশ্যম্ভাবী। আকর্ষণ থাকলে, থাকে তার বিকর্ষণ। তাই গান্ধীজী তাঁর অখণ্ড সত্যকে যখন পার্থিব কর্মে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে ঘটেছিল এতো অসামঞ্জস্য। এমন দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়েছিল যে, অত্যন্ত গোঁড়া গান্ধীবাদীরাও বলেছিলেন, এসব মহাত্মাজীর কূটনৈতিক চাল, বৃটিশকে ধোঁকা দেওয়া। আর একথা ভেবে অনেক গান্ধীবাদীর বুক মহাত্মার প্রতি 'বিশ্বাসে' ভ'রেও উঠেছিল। তাঁরা ভুল বুঝেছিলেন মহাত্মাজীকে। গান্ধীজীর অখণ্ড সত্যের বিশ্বাস এই খণ্ডিত ও দ্বন্দ্বিত জগতে প্রায়ই তাকে বিভ্রান্ত বিমূঢ় ক'রে দিয়েছিল, একথা সত্য। কিন্তু তাঁর এই বিভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য-ই তাঁর আন্তরিকতার বা অকাপট্যের চূড়ান্ত প্রমাণ।

যাই হোক, বিলাতে ঐ সময় থেকেই গীতার বাণী অনুসারে মহাত্মা তাঁর জীবনকে গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য, পরে সে চেষ্টা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গান্ধীজী ইংরেজী ভাষায় গীতার বিভিন্ন অনুবাদ পাঠ করেন। সেগুলির মধ্যে, তাঁর মতে, স্যার এডুইন আর্নল্ডের অনুবাদখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরে গান্ধীজী স্যার এডুইন আর্নল্ডের 'দি লাইট অব এশিয়া' কাব্যখানিও পড়েন। 'এশিয়ার আলো' হলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের কাহিনী এবং বাণী প্রভূত পরিমাণে গান্ধীজীকে প্রভাবিত করেছিল। এ গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন : "বুদ্ধ-চরিত আমি ভগবদ্‌গীতার চেয়েও বেশী আনন্দের সঙ্গে পড়লাম। পুস্তকখানা হাতে নিয়ে শেষ না ক'রে থাকতে পারি নি।"

বিলাতে থাকা-কালেই থিওজফিস্ট মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও মিসেস এনী বেসাণ্টের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিচয় ঘটে। পরবর্তী কালে মিসেস এনী বেসাণ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম পরিচালিকা এবং গান্ধীজীর সহকর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই যে ভারতবর্ষ তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, গান্ধীজীর এই ভ্রান্ত ধারণাকেও গ'ড়ে তোলার জন্যে মিসেস বেসাণ্ট কম দায়ী নন। তাঁদের সংস্পর্শে আসবার ফলে মহাত্মাজী ধর্মশাস্ত্র পড়তে শুরু করলেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তো বটেই, খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রও তাঁর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলো। বাল্যকালে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর যে বিরূপভাব জন্মেছিল, তা দ্রুত অন্তর্হিত হোলো। তিনি বলেন, "যিশুর 'সারমন অন দি মাউণ্ট' একেবারে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করলো। 'তোমার কোটটি যদি কেউ চায়, তাকে কম্বলটিও দিও', এবং 'তোমাকে যে এক গালে চড় মারবে, অপর গালটিও তার দিকে এগিয়ে দেবে' এই কথাগুলি প'ড়ে আমার অপার আনন্দ হ'লো।" এমনিভাবেই গান্ধীজীর তরুণ মন গীতা, বুদ্ধচরিত

ও যিশুর বাণীর মধ্যে একটি সুসাদৃশ্য লক্ষ্য করলো। এ সমস্ত থেকেই তিনি এক নিষ্কাম ত্যাগের অভিন্ন বাণী শুনতে পেলেন।

তবে এই প্রসঙ্গে একথা-ও উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী বাইবেলের 'সারমন অন দি মাউন্ট' থেকে প্রতিহিংসায় বিরতি ও ক্ষমা সম্পর্কে যে-জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল। বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর জন্ম। অহিংসা ও জীবে দয়া ছিল তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার, ধর্ম। আমরা জানি, বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন এসেছিল, অহিংসা, প্রেম ও ক্ষমাই ছিল তার মূল কথা। জগাই-মাধাইয়ের কাহিনী বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কে না জানে! "মেরেছ কলসীর কানা তাই ব'লে কি প্রেম দেবো না!" এই প্রেম, অহিংসা ও ক্ষমার বাণীর বন্যা একদিন আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে সুদূরে প্রবাহিত হয়েছিল। গান্ধীজীর পরিবারেও যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল, অহিংসা, প্রেম এবং ক্ষমাই ছিল তার মূলকথা। সুতরাং গান্ধীজীকে অহিংস এবং ক্ষমাশীল হবার জন্যে 'সারমন অন দি মাউণ্টের' কাছে সম্পূর্ণরূপে ঋণী করবার কোনো কারণ নেই। গান্ধীজীর রক্তের সুপ্ত সংস্কারকে খ্রীষ্টান ধর্মের বাণী জাগিয়ে দিয়েছিল মাত্র। সৃষ্ট করে নি, পুষ্ট করেছিল।

এই সময়ে গান্ধীজী কারলাইলের লেখা 'বীর এবং বীরপূজা' গ্রন্থখানিও পড়েছিলেন। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহম্মদের জীবন-কথা তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। এমনিভাবেই গান্ধীজীর অন্তরের গভীরে ধর্ম ও ভগবৎ-প্রেম সুদৃঢ়ভাবে মূল সঞ্চার করলো—যে ধর্ম ও ভগবৎ-প্রেম পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমস্ত প্রচেষ্টাকেই পরিপূর্ণরূপে পরিচালিত করেছিল।

গান্ধীজী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে ব্যারিস্টারি পাস করলেন। কিন্তু ব্যারিস্টারি করবার মতো সাহস ও শক্তি কোনোটাই তিনি অর্জন করলেন না। আইন বিষয়ক জ্ঞান তার অধিক পরিমাণে না থাকলেও সাধারণ ব্যারিস্টারদের চেয়ে যে অনেক বেশী ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন বড়ো লাজুক; তাই আইনের যেসব কথা তিনি বুঝতেন, সেগুলিকেও প্রকাশ করতে পারতেন না। এ-বিষয়ে তিনি দাদাভাই নওরোজী এবং মিঃ ফ্রেডরিক পিংকাট-এর শরণাপন্ন হলেন। ঐ সময় পিংকাট সাহেব গান্ধীজীকে ওকালতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করতে বলেন। তিনি বলেন, "তোমার ব্যাধি আমি বুঝেছি। তোমার সাধারণ বিদ্যা খুব কম। সাংসারিক জ্ঞানের অভাব। আর উকিলের ওটি না থাকলে চলেই না। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাসও পড়ো নি।" পিংকাট সাহেবের তখনকার কথাগুলি নিতান্ত সত্য ছিল। তবে সেদিন পিংকাট সাহেব কল্পনা-ও

করেন নি যে, এই ভারতবর্ষের ইতিহাস-না-পড়া ছোকরাই একদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অধ্যায় রচনা করবে—কালি আর কাগজে নয়, কাজে।

তবে একথা-ও সত্য যে, ইতিহাসের সম্যক্ জ্ঞান গান্ধীজীর কোনো দিন জন্মে নি। ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর ইতিহাসকে যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতেন, তবে আজকের ভারতের চেহারা অন্য রকম হোতো। ইতিহাসের প্রতি গান্ধীজীর চরিত্রগত একটি বিরূপ ভাব ছিল। আর তার একমাত্র কারণ, তাঁর ধর্মপ্রবণতা। ইতিহাস মানুষকে শেখায়, সমাজ গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ব্যাপক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার পদক্ষেপ। অন্য পক্ষে, ধর্ম মানুষকে শেখায়, ঈশ্বর সনাতন, তাই সমাজ সনাতন। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে ইতিহাসের প্রকৃতিগত, গোত্রগত, উদ্দেশ্যগত একটা বিরাট বৈপরীত্য আছে। গান্ধীজী তাঁর প্রথম জীবন থেকেই ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাই ইতিহাসকে তিনি কোনোদিন বুঝতে পারেন নি,—বোঝার চেষ্টাও করেন নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, গান্ধীজী যখন ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, গীতা পড়ছেন, বুদ্ধের বাণী পডছেন, তখনো তিনি ভারতের ইতিহাস পড়েন নি। গান্ধীজী যদি গীতা এবং বুদ্ধের বাণী পড়বার আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পড়তেন, তবে গীতা এবং বুদ্ধের বাণীকে তিনি তার কালগত সমাজগত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে পেতেন, ধর্ম দিয়ে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণের অসম্ভব চেষ্টা তিনি কখনও করতেন না।

বিলাতে গান্ধীজীর বহু বন্ধুর মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা এখানে বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। একদা "অর্ধোলঙ্গ সন্ন্যাসী" ব'লে গান্ধীজীর প্রসিদ্ধি ঘটেছিল পৃথিবীতে। তাঁর এই স্বল্প বেশের দিকটায় যে এ ব্যক্তির প্রভাব কিছু ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। ইনি গুজরাটী লেখক নারায়ণ হেমচন্দ্র। বহু ভাষা শেখা, বহু দেশ দেখা, আর বহু ভাষা থেকে নিজের মাতৃভাষাকে সম্পদশালী ক'রে তোলাই ছিল নারায়ণ হেমচন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধ, সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা। পোশাকের দিকে তিনি কোনোদিন নজর দিতেন না। এমন কি বিলাতেও তিনি অনেক সময় ধুতি-চাদর প'রে রাস্তায় বেরোতেন। রাস্তার ছেলেরা তাঁর পেছনে লাগতো। কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। এই স্বল্প পরিচ্ছদের কারণে তিনি আমেরিকায় গ্রেফ্তারও হয়েছিলেন। সেখানে ধুতি-শার্ট পরায় তাঁর "অসভ্য পোশাক পরিধানের অপরাধ" হয়েছিল। এই নারায়ণ হেমচন্দ্রের সঙ্গে লণ্ডনে গান্ধীজীর যে আলাপ হয়, গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে তার সুন্দর স্মৃতিসজল একটি চিত্র দিয়েছেন। এই চরিত্র-চিত্রণটি এমন সুন্দর হয়েছে যে, তা যে-কোনো কথা-

সাহিত্যিকের সৃষ্টির গৌরব অর্জন করতে পারে। যাই হোক, পরবর্তীকালে যখনই শুনেছি, বাণী ও বিবৃতিলোভী বিদেশীরা এই "অর্ধোলঙ্গ ফকিরের" পায়ের তলায় এসে বসেছে, তখনই নারায়ণ হেমচন্দ্রের বন্দিত্বের কাহিনীটি আমার মনে পড়েছে। মনে হয়েছে, মহাত্মাজী তাঁর চিরাভ্যস্ত অহিংসা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রীতিতেই বুঝি পরিচ্ছদগর্বী পশ্চিমীদের ঔদ্ধত্যকে নাশ ক'রে তাঁর পুরাতন বন্ধু নারায়ণ হেমচন্দ্রের কারাবাসেরই শোধ নিচ্ছেন!

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে গান্ধীজী বিলাত থেকে দেশে রওনা হন। বাড়ি ফিরে তিনি শুনলেন, তাঁর বিলাতে থাকা কালেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। পাছে তিনি দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়েন, তাই বিদেশে বিভুঁইয়ে তাঁকে দুঃসংবাদ পাঠানো হয় নি। গান্ধীজী বেদনায় ভেঙে পড়লেন, কিন্তু বিহ্বল ভাবটা বাইরে খুব বেশী প্রকাশ করলেন না। ইতিপূর্বেই তিনি আত্মসংযমের শক্তি কতক পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন।

দেশে ফিরে ডাক্তার মেহ্‌তার পরিবারের সঙ্গে গান্ধীজীর অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে উঠলো। বিশেষ ক'রে, এখানে এমন একটি মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো, যাঁর প্রভাব গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ জীবনে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইনি ডাক্তার মেহ্‌তার দাদা রেবাশংকর জগজীবনের জামাতা কবি রায়চাঁদ বা রাজচন্দ্র। ইনি রেবাশংকরের বিরাট কারবারের অংশীদার ও হর্তাকর্তা-বিধাতা। বয়সও বেশী নয়, বছর পঁচিশ হবে। চরিত্রবান, জ্ঞানী। স্মৃতি-শক্তিও তাঁর অসাধারণ। তাঁকে "শতাবধানী" বলা হোতো। গান্ধীজী একবার লাতিন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী ভাষা থেকে বিশৃঙ্খলভাবে কতকগুলো শব্দ ব'লে গিয়েছিলেন, আর রায়চাঁদ সেগুলিকে ঠিক হুবহু তেমনি ভাবেই করেছিলেন পুনরাবৃত্তি। গান্ধীজী বলেন, "এই শক্তি দেখে আমার হিংসা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি মুগ্ধ হই নি। তাঁর যে-গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তার পরিচয় আমি পরে পেয়েছিলাম। তাঁর বিস্তৃত শাস্ত্র-জ্ঞান, বিশুদ্ধ চরিত্র ও আত্মদর্শন করবার তীব্র ইচ্ছা।......তাঁর বুদ্ধিকে আমি যেমন সম্মান করতাম, তাঁর নৈতিক চরিত্রের উপরও ছিল আমার তেমনি বিশ্বাস।" লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চালাবার ফাঁকে যে-মানুষটি নিবিড়ভাবে ধর্ম-আলোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে দেখে গান্ধীজীর মনে গীতার নিষ্কাম ধর্মের কথা মনে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। জীবনের প্রথম ভাগে রায়চাঁদের মতো একজন সাধু কারবারীকে দেখবার ফলে গান্ধীজী পুঁজিবাদীদের সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। যারা ব্যক্তিগতভাবে সহৃদয়, সহানুভূতিশীল, তারা যে

সমাজগতভাবে অত্যন্ত ভয়ংকর ও অনিষ্টকর হ'তে পারে, এ কল্পনা বা চিন্তা কখনো গান্ধীজীর মস্তিষ্কে স্থান পায় নি। তাঁর চোখে পুঁজিবাদীদের অন্যায়, শোষণ, নির্যাতন তাদের ব্যক্তিগত স্খলন বা ত্রুটি মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি যদি রায়চাঁদের মতো মানুষদের মহত্ত্বকে ব্যক্তিগত ব'লে ভাবতেন, আর তাদের সমাজগত স্বরূপটিকে নির্ভুল দৃষ্টিতে দেখতে পারতেন, তবে গান্ধীজীর পরবর্তী জীবন এবং ভারতের বর্তমান ইতিহাস অন্যতর হোতো। আজকের ভারত শ্রেণীগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতাকে হয়তো জয় করতো, আর গান্ধীজীর অহিংসা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই হোতো হয়তো সে-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। গান্ধীজী নিজেও স্বীকার করেন: …"এই পর্যন্ত বলা যথেষ্ট মনে করি যে, আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ আধুনিক জগতের তিন ব্যক্তি অঙ্কিত করেছেন। রায়চাঁদ ভাই তাঁর জীবন্ত সংসর্গ দিয়ে; টলস্টয় তাঁর 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' (Kingdom of God is within You) গ্রন্থখানি দিয়ে, আর রাস্কিন তাঁর 'আনটু দি লাস্ট' রচনা দিয়ে।"

এখানে এ-কথাও উল্লেখযোগ্য যে, জীবনের প্রথম ভাগে বহু বিশিষ্ট ধনী ও ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সংসর্গে আসায় এবং তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রে মুগ্ধ হওয়ায় গান্ধীজী দেশের বর্তমান দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্যে দেশের অর্থনীতির কর্ণধার ধনিক ও ব্যবসায়ী সমাজকে দায়ী করতে পারেন নি। তিনি পরোক্ষে হ'লে-ও দায়ী ক'রে বসেছেন যন্ত্রকে, কলকারখানাকে। এ যেন মানুষের রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে বলা: মনুষ্য দেহটাই সর্বনাশের মূল—উপদেশ দেওয়া, মনুষ্য দেহটাকে বিতাড়িত করো, মনুষ্য দেহ অপেক্ষা পশুদেহই ভালো। মানুষের যন্ত্র-সভ্যতার রূপ, তার সামাজিক উদ্‌বর্তনের ফলেই ঘটেছে। আজ তাকে যন্ত্রহীন, কলকারখানাহীন সমাজে ফিরে যেতে বলা, সে যেন হোলো মানুষের সমাজে যে-হেতু অন্যায় ও দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, সেই-হেতু পৃথিবীকে আজ মনুষ্যহীন জানোয়ারের সমাজে ফিরে যেতে উপদেশ দেওয়া। উদ্‌বর্তনের ফলেই পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে মানুষের। আবার সেই উদ্‌বর্তনের ফলেই যন্ত্র-সভ্যতার জন্ম হয়েছে মানুষের সমাজে। যেমন মনুষ্যদেহের রোগ দূর করার জন্যে মনুষ্য-দেহটাকে নাকচ ক'রে দেওয়া যায় না, তেমনি যন্ত্র-সভ্যতার ব্যাধিটাকে সারাবার জন্যে যন্ত্র-সভ্যতাকে বিতাড়িত করা-ও চলে না। তাই যন্ত্র-সভ্যতার রোগের চিকিৎসায় গান্ধীজীর হাতযশ বাড়ে নি। গান্ধীজী যন্ত্র-সভ্যতার ব্যাধিকে নয়, যেন যন্ত্র-সভ্যতাকে দেখেই আঁতকে উঠেছেন। তাই ডাক্তার যদি রোগকে নয়, রোগীকে দেখে আঁতকে ওঠেন, তবে যেমন হয়, এ-ও হয়েছে ঠিক তেমনি।

এই ত্রুটি কেবল যে গান্ধীজীর হয়েছিল তাই নয়। রবীন্দ্রনাথও একদা চীৎকার ক'রে বলেছিলেন, তিনি "বংশীবটের তলে" ফিরে যেতে পেলে "সুসভ্যতার আলোক" ছাড়তে রাজী আছেন। বলেছিলেন, "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।"

তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-কথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ ছিল সাময়িক কাব্যবিলাস। তা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, নগরের লৌহ-লোষ্ট্রকে দূর ক'রে ভারতে আরণ্যক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যা অনিবার্য প্রয়োজন, গান্ধীজী যখন সে-দিকে হাত বাড়ালেন, তখন জীমূতমন্দ্রকণ্ঠে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গান্ধীজীর পূর্বমুখী পথ যে উত্তরমুখী নয়, রবীন্দ্রনাথ সকলের চেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রচার করেছিলেন আগে। এখানে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর চরিত্রের মধ্যে আমরা মূলত একটি গভীর পার্থক্য লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যানুভূতির মধ্যে যাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, জীবনে কার্যত তাকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন নি। অনেক সময় তাঁর কাব্যানুভূতির সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও কার্যের ঘোরতর বিরোধ দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের অরণ্যপ্রীতি এবং সেই একই সঙ্গে চরকার বিরোধিতাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমি আরো একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই, যাতে গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের পার্থক্যটি সহজেই প্রতিপন্ন হবে। রবীন্দ্রনাথ-ও গান্ধীজীর মতোই অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করতেন। কিন্তু এই অনুভূতির উপসংহাররূপে গান্ধীজী যখন নিরামিষাশী হয়ে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথ তখনো রয়ে গেলেন আমিষাশী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিরামিষাশী হবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি, একথাও তিনি স্বীকার করেন। এ-ব্যাপারটি গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের পার্থক্যটিকে স্পষ্টতর ক'রে তোলে।

যাই হোক, কেবল যে আরণ্যক উপনিষদের আওতায় মানুষ হওয়া আদর্শবাদীদের এই ভুল ঘটেছিল, তাই নয়। যন্ত্র-সভ্যতার যেখানে জন্ম, সেই ইউরোপেও যন্ত্র-সভ্যতার আসল রূপটিকে চিনতে বেশ দেরি হয়েছিল। যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সমস্যা হয়ে উঠেছিল প্রবল। একশো জন শ্রমিকের কাজ বিশ জন শ্রমিক যখন করতে লাগলো, তখন বাকি আশি জনের বেকারত্ব দেখা গেলো অনিবার্যরূপে। ফলে, শ্রমিকরা ও মানবহিতৈষীরা যন্ত্রকে ভয়ংকর কিছু একটা বস্তু ভেবে তার বিরুদ্ধেই লড়াই শুরু করলেন। যন্ত্রের নাম হোলো, যন্ত্রদানব। এই দানবনিধনের জন্যে মানবহিতৈষীরা তাঁদের লেখা ও বক্তৃতায় যেমন প্রচার চালাতে লাগলেন, তেমনি শ্রমিকরাও তাদের চাকরি-খেকো পোড়ারমুখো ঐ যন্ত্রগুলোকে দূর করতে

চাইলো। এইভাবে সংগ্রামের রূপটা যন্ত্রের বিরুদ্ধেই এসে পড়লো। ডাক্তাররা রোগকে না পিটিয়ে পেটাতে লাগলো রোগীকে।

কয়েকজন মাত্র ধনিকের হাতে যদি যন্ত্র-পরিচালনা, অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার, ভার থাকে, তবে তারা অধিকতর লাভের লোভে যন্ত্রের উন্নতির সাহায্যে শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে থাকবে। আর কর্মচ্যুত শ্রমিকদের মাইনেটা ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হবে নিরাপদে। এ তো সহজ কথা। আপাত-দৃষ্টিতে শ্রমিকদের এই দুর্দশার প্রতিকার যন্ত্রের প্রতিরোধের মধ্যেই আছে মনে হবে। কিন্তু বস্তুত তা নয়। মানুষের বুদ্ধি ও কৌতূহল এতোই প্রবল যে, তা সামনে এগোতে থাকবেই। সেই-বুদ্ধি ও কৌতূহলকে আটক রেখে কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব হবে না। তাই যন্ত্রকে মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব? তা কেবলমাত্র সম্ভব শ্রমিক এবং যন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নিয়ে এবং শ্রমিক ও যন্ত্রের বর্তমান বিধাতাপুরুষ ধনিক ও পুঁজিপতিদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে দিয়ে। পূর্বে, যন্ত্রের উন্নতির আগে, একশো জন মানুষ একটি কাজ দশ ঘণ্টায় করতো। এখন যন্ত্রের উন্নতির ফলে, ধরুন, সেই কাজটি দশ ঘণ্টায় বিশ জন লোকে করছে। আর বাকি আশি জন শ্রমিক হয়েছে বেকার এবং ঐ আশি জনের মাইনেটা নিয়মিত ভাবে জমা পড়ছে মালিকের জমার খাতায়। কেবল তাই নয়। বেকার আশি জন শ্রমিক এসে চাকরির জন্যে ধরনা দিচ্ছে মালিকের দরজায়। ফলে যে বিশ জন লোক চাকরি করছে, তাদের মাইনেটাও বাকি বেকার আশি জনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যাকে কৃচ্ছ্র-সাধন বলা চলে। আর তাতে মালিকের জমার খাতা ক্রমেই পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হয়ে উঠছে। এমনিভাবে উন্নত যন্ত্র ধনিকের হাতে থাকায়, শ্রমিকদের মধ্যে আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকের কর্মহীনতা ও মালিকের মুনাফা চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলেছে। সুতরাং এই রোগের প্রতিকার করতে হবে দুই পথে। প্রথমত, প্রতিযোগী শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরিয়ে তাদের ক'রে তুলতে হবে সংঘবদ্ধ, এবং সেই সংঘবদ্ধতার দ্বারা আঘাত করতে হবে মালিককে তার অপসরণের জন্যে। শ্রমিকদের হাতে যখন যন্ত্র আসবে, তখন তার দানবীয় রূপ আর থাকবে না। তখন যে-কাজ মুনাফাখোর মালিকের জন্যে বিশ জন শ্রমিক দশ ঘণ্টায় করতো, সেই কাজ একশো জন শ্রমিক, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নয়, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে, করবে মাত্র দু ঘণ্টায়। মার্ক্সবাদই যন্ত্রকে তার এই সত্যকার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম দেখেছে। মার্ক্সবাদের পূর্বে যন্ত্রভীরু সাম্যবাদ বা

সমাজতন্ত্রবাদ বহুরূপেই দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেছিলেন, "আমি একজন সেরা কমিউনিস্ট"। তাঁর কমিউনিজম যন্ত্রভীরু কমিউনিজম রূপেই দেখা দিয়েছিল। তিনি যন্ত্রকে অস্বীকার ক'রে বা কখনো কখনো যন্ত্রপতিদের সদাশয়তার উপর নির্ভর ক'রে মনুষ্য-সমাজকে এক বৃহৎ পরিবারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ও উপায় চিরদিনই পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সাহায্য করে নি। তাই যখন তিনি কলকারখানায় শ্রমিকদের বলেছেন, কলকারখানা শ্রমিকদেরই, কিংবা যখন তিনি কৃষকদের বলেছেন, শ্রম যার ফসল তার, তখনও তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের ন্যায্য দাবির পক্ষ নিয়ে কলকারখানার মালিক ও জমিদারদের নিতান্ত অহিংসা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্য দিয়েও আঘাত করেন নি। তাই অনেকের কাছে আপাত-দৃষ্টিতে তাঁকে জমিদার ও মালিকের চর ব'লে মনে হয়েছে। আর মালিক ও জমিদার তাঁর পন্থার অনুসরণ না ক'রে গান্ধীবাদকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। গান্ধীবাদের তথাকথিত প্রচারক ধনিকরা তাদের কলকারখানা তুলে দিয়ে চরকা নিয়ে মাঠে যায় নি, গান্ধীজীকে বর্মরূপে ব্যবহার ক'রে নিজেদের যন্ত্র ও কলকারখানাকে মুনাফা-লুঠের নীতিসংগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছে। নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব হ'লেও গান্ধীজী চেয়েছিলেন, ভারতীয় ধনিক ও জমিদারদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ক'রে তুলতে। তিনি ভেবেছিলেন, 'হৃদয়ের পরিবর্তন হবে।' এখানেই তাঁর ভুল হয়েছিল। তিনি মানুষকে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম করতে চেয়েছিলেন ভগবদ্-গীতার বাণী স্মরণ ক'রে। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহকে যদি বলা যায়, তোমাদের মাধ্যাকর্ষণ ত্যাগ ক'রে তোমরা নিঃস্বার্থভাবে কক্ষ পরিক্রমণ করো, আর গ্রহ-উপগ্রহরা যদি তাই করে (মানুষের সৌভাগ্য যে তারা তা করবে না), তবে একটি নিমেষে কি সমস্ত সৌরলোক তালগোল পাকিয়ে যাবে না? গ্রহ-উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ যেমন, মানুষের স্বার্থও ঠিক তেমনি। মানুষ নিঃস্বার্থ হ'লে মানুষের সমাজ অচল হয়ে যাবে—হয়ে উঠবে মানুষের ভিড়ের তাল-গোল পাকানো একটা বৃহৎ মনুষ্যপিণ্ড। গান্ধীবাদ যখন মানুষের স্বার্থকে দূর ক'রে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম হ'তে মানুষকে বলেছে, তখন মার্ক্সিজম বলেছে মানুষের স্বার্থকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সেই সর্ব-স্বার্থের নীতি অনুসারে রচনা করতে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাকে। গান্ধীবাদের নিষ্কাম নিঃস্বার্থতার উপদেশ ধনিক আর জমিদাররা শোনে নি, তারা তা শোনাতে চেয়েছে শ্রমিক ও প্রজাদের, এবং এমনিভাবেই শ্রমিক ও প্রজাদের স্বার্থকে নিজেরা আত্মসাৎ ক'রে হয়ে উঠেছে এক একটি ভয়াবহ প্রাণী। কোনো একটা গ্রহ যদি সৌরজগতের মাধ্যাকর্ষণ স্বার্থের মূল-

নীতিকে অস্বীকার ক'রে অন্য গ্রহগুলিকে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিহীন ক'রে নিজের মাধ্যাকর্ষণের প্রকোপটা বাড়িয়ে তোলে, তবে যেমন গ্রহে গ্রহে ঠোকাঠুকি হয়ে এক নিমেষে একটা প্রলয় ঘটে যেতে পারে, ঠিক তেমনি আজ মানুষের সমাজেও বহুর স্বার্থকে অস্বীকার ক'রে যখন কয়েকটি মানুষ অতি-স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, তখন সেই অতিস্বার্থপরদের দ্রুত অপসারণ না ঘটলে, সমগ্র মনুষ্য-সমাজটা যে মাথা ঠুকোঠুকি ক'রে মরে যাবে, এ-বিষয় নিঃসন্দেহ।

গান্ধীজী দেশে ফিরে কিছুদিন বোম্বাইয়ে ও রাজকোটে প্র্যাক্‌টিশ করলেন। কিন্তু পসার আদৌ জমলো না। তাঁর ব্যাবহারিক জ্ঞানের যেমন ছিল অভাব, তেমনি ছিল সততার সূক্ষ্ম বিচার। বিশেষ ক'রে তাঁর লাজুকতা ও বক্তৃতা বা তর্ক করবার অসামর্থ্য তাঁর ওকালতির পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে উঠলো। তিনি আরজি লিখে কিছু কিছু রোজগার করতে লাগলেন। এই সময় তিনি বৃটিশ সরকারের কর্মচারীদের সম্পর্কে একটি কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। মানুষের সদ্‌গুণ সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা সত্বে-ও তিনি কোনো দিন তা ভুলতে পারেন নি। পোরবন্দরের রানা সাহেব গদি পাওয়ার পূর্বে তাঁর মন্ত্রী এবং পরামর্শদাতা ছিলেন গান্ধীজীর দাদা। ঐ সময় তিনি রানা সাহেবকে কুপরামর্শ দিয়েছেন, এমনি একটি অভিযোগ পলিটিক্যাল এজেণ্টের কানে যায়। ফলে, পলিটিক্যাল এজেণ্ট গান্ধীজীর দাদার উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। কোনো সামন্তরাজ্যে পলিটিক্যাল এজেণ্টের বিরূপ ভাব অত্যন্ত ভয়ংকর, কারণ, তা ঐ রাজ্যের মানুষকে সকল দিক থেকেই বিপন্ন ক'রে তোলে। সৌভাগ্যক্রমে, বা দুর্ভাগ্যক্রমে, গান্ধীজীর সঙ্গে বিলাতে এই পলিটিক্যাল এজেণ্টের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল। সুতরাং দাদা তাঁর পক্ষে দু-একটা কথা পলিটিক্যাল এজেণ্টকে বলবার জন্যে ভাইকে অনুরোধ করলেন। বিষয়টির নৈতিক দিকটাকে গান্ধীজী সম্পূর্ণ সমর্থন করতে না পারলেও স্নেহশীল দাদার কথা ঠেলতে পারলেন না। কিন্তু পলিটিক্যাল এজেণ্ট গান্ধীজীর দাদার প্রতি এমন বিরূপ ছিল যে, গান্ধীজীর কোনো কথাই সে কানে তুললো না, দারোয়ান দিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বার ক'রে দিলো। গান্ধীজী বলেন, "সরকারী আমলা যখন নিজের আসনে ব'সে থাকে, আর যখন সে ছুটিতে দেশে থাকে—এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।"

গান্ধীজী এই অপমানের প্রতিবাদে পলিটিক্যাল এজেণ্টের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাইলেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের তখনকার শ্রেষ্ঠ আইনজীবী স্যার ফিরোজশা মেহ্‌তা তাঁকে এ বিষয়ে নিরস্ত হ'তে উপদেশ দিলেন: "গান্ধীকে বলবেন, এ রকমের ঘটনা

সমস্ত উকিল ব্যারিস্টারের অভিজ্ঞতাতেই আছে। তার রক্ত গরম, সে বিলাত থেকে নূতন এসেছে, তাই বৃটিশ কর্মচারীদের চেনে না। যদি সে সুখে বাস করতে ও দু পয়সা রোজগার করতে চায়, তবে এ-চিঠি যেন ছিঁড়ে ফেলে এবং অপমান সহ্য করে।"

গান্ধীজী নিরস্ত হলেন, কিন্তু সে-অপমান জীবনে ভুললেন না। তাঁর নিজের নৈতিক ত্রুটিটা-ও তাঁর কাছে গুরুতররূপে ধরা পড়লো। তাই আর কোনো দিন কারো সুপারিশ করবেন না, এই শপথ করলেন। সে শপথ তিনি তাঁর অন্য সকল শপথের মতোই কখনো ভাঙেন নি।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো দুঃসহ হয়ে উঠলো অন্য কারণে। এই বৃটিশ কর্মচারীটির আদালতেই তাঁর সমস্ত মামলা চলে, অথচ তোষামোদ করাও তাঁর পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ এক মহাসমস্যা।

এই সময় বিখ্যাত ব্যবসায়ী দাদা আবদুল্লার অংশীদার শেঠ আবদুল্লা করিম ঝভেরির সঙ্গে গান্ধীজীর দাদা গান্ধীজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের বিরাট ব্যবসায়। সেখানে আদালতে তাঁদের প্রায় ছ লক্ষ টাকার দাবি সম্পর্কে একটি মামলা চলছিল। বড়ো বড়ো উকিল-ব্যারিস্টারও নিযুক্ত হয়েছিলেন। গান্ধীজী সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে থেকে কেবল চিঠিপত্রের মুসাবিদা ক'রে-ও তাঁদের সাহায্য করতে পারেন। আফ্রিকা যাওয়ার এই সুযোগটিকে গান্ধীজী ডুবন্ত মানুষের মতো আঁকড়ে ধরলেন। এ স্বাধীন ব্যবসা নয়, এক প্রকার চাকরি—মাত্র কয়েক মাসের জন্যে—কিন্তু তাতে কী, সাময়িক ভাবে-ও তো কাথিয়াবাড়ের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে তিনি রক্ষা পাবেন? স্থির হোলো, প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের ভাড়া, থাকবার খরচ এবং সেই সঙ্গে পারিশ্রমিক ১০৫ পাউণ্ড। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অজ্ঞাত দেশ, অপরিচিত মানুষ তাঁকে ডাক দিলো।

এমনিভাবেই গান্ধীজীর জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হোলো। দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ল্যাবরেটরি বলা চলে।

॥ তিন ॥

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলেন এবং মে মাসের শেষাশেষি নাতালে এসে পৌঁছলেন। নাতালের বন্দরের নাম ডারবান। গান্ধীজীকে নেওয়ার জন্যে তাঁর নূতন মনিব আবদুল্লা শেঠ নিজেই স্টীমার ঘাটে এসেছিলেন। গান্ধীজী এখানে এসে প্রথমে যা দেখলেন, তা এখানকার ভারতবাসীদের মর্যাদাহীন অবজ্ঞাত জীবন। ভারতবাসীদের অধিকাংশই এখানে চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তি-হীন কুলির কাজ করে। তাই ভারতবাসীদের নাম হয়েছে কুলি। এমনি ভাবে 'কুলি' শব্দটা তার মূল অর্থ হারিয়ে এখানে 'ভারতীয়' এই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। গান্ধীজীকে ওখানকার লোকেরা বলতে সুরু করলো, কুলি-ব্যারিস্টার। কুলির বদলে আর একটি নামেও ভারতীয়দের ডাকা হোতো, 'স্বামী'। মাদ্রাজীদের নামের সঙ্গে স্বামী কথাটি প্রায়ই যুক্ত থাকে। 'স্বামী'র প্রকৃত অর্থ মালিক হ'লে-ও এখানে অবজ্ঞাসূচক অর্থেই স্বামী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল এখানে গিরমিটিয়া, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। (গিরমিট কথাটি এগ্রিমেণ্ট কথার অপভ্রংশ।) ভারতীয় গিরমিটিয়াদের মধ্যে ছিল তিন সম্প্রদায়ের লোক—হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান। গান্ধীজী এখানে এসে লক্ষ্য করলেন, ভারতীয়দের উপর সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারকে কায়েমী করবার জন্যে নানারূপে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ ও বিদ্বেষকে বলবৎ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা প্রথমে জন্মে ডারবানের আদালতে। আবদুল্লা শেঠ গান্ধীজীকে ডারবানের আদালত দেখাতে এবং কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবদুল্লা শেঠ আদালতে তাঁর উকিলের পাশেই গান্ধীজীর বসবার জায়গা ক'রে দিলেন। তখনকার দিনে গান্ধীজী গায়ে পরতেন ফ্রক-কোট এবং মাথায় হিন্দুস্থানী পাগড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীকে পাগড়ি খুলতে হুকুম করলেন। কিন্তু গান্ধীজী এই অপমানজনক প্রস্তাবে রাজী না হয়ে আদালত থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই ব্যাপারে তিনি আরো জানলেন, এখানে যারা মুসলমানের পোশাক প'রে আদালতে আসে, তাদের পাগড়ি খুলতে হয় না, অথচ অন্য ভারতীয়দের আদালতে প্রবেশ করতে হ'লেই পাগড়ি খুলতে হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে বার বার এইরূপ অন্যায় ও নানা বিভেদ-চক্রান্তের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, এমন কি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের

বিভেদ-চক্রান্তের কাছেই তাঁকে একদা নিজের জীবনও দিতে হয়েছিল। 'যাই হোক, কায়েমী স্বার্থের বিভেদ-চক্রান্তের প্রথম অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন এই ডারবান আদালতেই।

এখানে কেবল যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ধরনের বহুবিধ ভেদ ছিল, তাই নয়। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানরা আবার একজোটে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের ঘৃণা করতো, তাদের 'ওয়েটার' ব'লে নাক সিটকাতো। তাই গান্ধীজী যখন তাঁর হিন্দুস্থানী পাগড়ি ছেড়ে 'হ্যাট' পরবেন স্থির করলেন, তখন তাঁকে প্রতিবাদে বলা হোলো, 'হ্যাট' পরলে লোকে তাঁকে 'ওয়েটার' ব'লে ভাববে। ভাবুক ওয়েটার, গান্ধীজীর তাতে বড়ো একটা বয়ে যেতো না। কিন্তু সেদিকেও তাঁকে নিরস্ত হ'তে হোলো, কারণ, তাতে ভারতীয় হিন্দুদের উপর যে অবিচার চলছে, তার কোনো প্রতিকার হবে না। তিনি তাই অন্যায়ের প্রতিবাদে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি লেখা পাঠালেন। ব্যাপারটি নিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হ'লো। একদল গান্ধীজীর পক্ষ নিলেন, আর অন্যদল করলেন তাঁর তীব্র নিন্দা। সংবাদপত্রে 'আনওয়েলকাম ভিজিটর' বা 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক' শিরোনামায় গান্ধীজীর কথা ছাপা হোলো। ফলে তিন-চার দিনের মধ্যেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। এমনিভাবেই সেদিন এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে গান্ধীজীর বিরাট সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হোলো।

কিন্তু গান্ধীজী তখনো বোঝেন নি যে, কী অন্যায় ও অত্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের জীবনকে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটি তাঁর ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা থেকে শীঘ্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। গান্ধীজীর মনিব আবদুল্লা শেঠের মামলা চলছিল তাঁর নিকট-আত্মীয় তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের সঙ্গে ট্রান্সভালে, প্রিটোরিয়া শহরে। সুতরাং অবিলম্বেই গান্ধীজীর প্রিটোরিয়া যাবার প্রয়োজন হোলো। তিনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে ট্রেনে চ'ড়ে বসলেন। ট্রেন প্রায় রাত ন'টায় নাতালের রাজধানী মরিৎস্‌বার্গে এসে পৌছলো। একজন সাদা-চামড়া প্যাসেঞ্জার গান্ধীজীকে ভালো ক'রে দেখলো যে, তাঁর গায়ের চামড়া সাদা নয় এবং অবিলম্বে সে রেল কোম্পানির দুজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। তারা গান্ধীজীকে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে যেতে বললো।

সেপাই এলো, গান্ধীজীকে ধাক্কা দিয়ে তারা ট্রেন থেকে নিচে নামিয়ে দিলো। বিছানা-পত্র ছুঁড়ে ছত্রখান ক'রে ফেললো প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন চ'লে গেলো। গান্ধীজী মরিৎস্‌বার্গ স্টেশনে দাঁড়িয়ে তীব্র হিমে এবং দুঃসহ অপমানে কাঁপতে লাগলেন।

"আমার কর্তব্য কী, তাই স্থির করতে লাগলাম। আমার যা ন্যায্য অধিকার, তার জন্যে লড়বো, না, ভারতবর্ষে ফিরে যাবো? না, অপমান সহ্য ক'রে-ও প্রিটোরিয়া পৌছব?…" গান্ধীজী বুঝলেন, তাঁর উপর যে দুঃখ নেমে এসেছে, তা তো বাহ্য দুঃখ, একটা মহাব্যাধি ভিতরে রয়েছে, এ তারই লক্ষণ মাত্র। "এই মহাব্যাধি হচ্ছে বর্ণবিদ্বেষ। এই ব্যাধি দূর করবার শক্তি থাকে তো সেই শক্তির ব্যবহার করবো। তাতে যদি আরো দুঃখ হয়, সে সকল দুঃখ সহ্য করবো।" এই শপথ গ্রহণ ক'রে তিনি রেল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার এবং আবদুল্লা শেঠের কাছে তার ক'রে দিলেন। তার পেয়ে আবদুল্লা শেঠ জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। জেনারেল ম্যানেজার স্বজাতীয়দেরই পক্ষ সমর্থন করলেন, তবে গান্ধীজী যাতে বিনা হাঙ্গামায় গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবার জন্যেও তিনি স্টেশন-মাস্টারকে নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লা শেঠ মরিৎস্‌বার্গের হিন্দুদেরও তার ক'রে দিলেন, তাঁরা যেন গান্ধীজীর সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রাখেন। অন্যান্য স্টেশনেও এই মর্মে তার করা হোলো। গান্ধীজী এইভাবে মরিৎস্‌বার্গ থেকে চার্লস্‌টাউনে এসে পৌছলেন। কিন্তু এখানেই তাঁর অপমান বা দুর্গতির শেষ হোলো না। তাঁকে আরো বহু লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হ'তে হোলো।

চার্লস্‌টাউন থেকে জোহানেস্‌বার্গ যাবার জন্যে তখনকার দিনে ট্রেন ছিল না। ছিল এক রকম ঘোড়ার গাড়ি। সেগুলিকে সিগ্‌রাম বলা হোতো। মাঝপথে স্টাণ্ডারটনে একরাত্রি থাকতে হয়। সিগ্‌রামের টিকিট গান্ধীজীর আগেই করা ছিল। এই টিকিট আর একদিন পরে পৌছলেও বাতিল হ'তো না। তাছাড়া, আবদুল্লা শেঠ চার্লস্‌টাউনে সিগ্‌রামওয়ালার কাছেও তার করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীকে গাড়ির ভেতরে বসতে দেওয়ার আদৌ ইচ্ছা ছিল না সিগ্‌রামওয়ালার। একজন কালো 'কুলি' সাদা-চামড়াওলাদের সঙ্গে একত্র ব'সে যাবে, সে কি হয়! তাই তারা অজুহাত হিসাবে বললো, ও-টিকিট চলবে না, বাতিল হয়ে গেছে। কোচুয়ানের দু পাশে দুটো আসন ছিল, তার একটাতে গোরা কণ্ডাক্টার বসতো। তাই সে দয়া ক'রে প্রস্তাব করলো, 'স্বামী' যদি কোচুয়ানের পাশে ব'সে যেতে চায়, তবে কোনো রকমে যেতে পারে। গান্ধীজী নিরুপায় হয়ে তাতেই রাজী হলেন। ফলে তিনি বসলেন কোচুয়ানের পাশে, আর কণ্ডাক্টার বসলো তাঁর জায়গায় গাড়ির ভেতরে, অন্যান্য গোরা যাত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট ছিল না। একটু রাস্তেই গোরা কণ্ডাক্টারের সিগারেট খাওয়ার শখ হোলো এবং কোচুয়ানের পাশে উন্মুক্ত আকাশের তলায় ব'সে ধূমপান করাটাকেই সে বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত আরামদায়ক ভাবলো।

তাই সে গাড়ির বাইরে এসে গাড়ির পাদানের উপর একটা নোংরা চট মেলে দিয়ে গান্ধীজীকে বললো, "স্বামী, তুমি এখানে বস, আমি ড্রাইভ.রের পাশে বসবো।"

অপমান গান্ধীজীর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিলো, তবু তিনি ভয়ে ভয়ে কেবল প্রতিবাদ করতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে প্রতিবাদ করতে দেখেই গোরা কণ্ডাক্টার তাঁর ওপর চড় কিল ঘুষি চালাতে লাগলো, তাঁর হাত ধ'রে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামাবার চেষ্টা করলো। গান্ধীজী কিন্তু পেতলের ডাণ্ডা ধ'রে কোনো রকমে ঝুলে রইলেন। তাঁর এই নির্যাতনে একজন গোরা যাত্রীও প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। ফলে কণ্ডাক্টার নরম হয়ে এলো। কোচুয়ানের অন্যদিকে যে আসনটা ছিল, তাতে একজন 'হোটেণ্টট' চাকর বসেছিল। কণ্ডাক্টার তাকে নামিয়ে পাদানে বসিয়ে নিজে তার জায়গায় গিয়ে বসলো। গান্ধীজীকে শাসালো, "স্টাণ্ডারটাউনে চলো, তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবো।"

গান্ধীজী নীরবে ভয়ার্ত মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু স্টাণ্ডারটাউনে এসে লোকটা কিছু উপদ্রব করলো না, ইউরোপীয় যাত্রীর প্রতিবাদে সম্ভবত ভয় পেয়েছিল। প্রথমে গান্ধীজী রাত্রি কাটাবার জন্যে একটা হোটেলে উঠতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে "কুলি" দেখে তারা সেখানে ঠাঁই দিলো না। আবদুল্লা শেঠ গান্ধী সম্বন্ধে স্টাণ্ডারটাউনে ও তাঁর পরিচিতদের কাছে তার করেছিলেন। তার অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে আবদুল গনি শেঠের সাক্ষাৎ হোলো। এই আবদুল গনি শেঠ পরে গান্ধীজীর জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

প্রিটোরিয়ার জন্যে ট্রেনের টিকিট কিনতে গিয়ে আরো এক আশঙ্কা দেখা গেলো, 'কুলি' ব্যারিস্টারের বরাতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট জুটবে কি? গান্ধীজী স্টেশন-মাস্টারের কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট চেয়ে আগেই একটি লিখিত দরখাস্ত পাঠালেন। দরখাস্তখানাকে জোরালো করবার জন্যে ব্যারিস্টার ব'লে নিজের পরিচয়টুকুও দিলেন। পরে গান্ধীজী যখন টিকিট কিনতে গেলেন, তখন স্টেশন-মাস্টার হেসে তাঁকে বললেন, "আমি ট্রান্সভালার নই, আমি হল্যাণ্ডার। আপনার অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। আপনাকে আমি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে পারি। কিন্তু একটি শর্তে—রাস্তায় গার্ড যদি আপনাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে দেয়, তবে প্রথম শ্রেণীর টিকিটের জোরে আপনি কোনো দাবি করবেন না। কারণ, তাতে আমিই ফ্যাসাদে পড়বো।" এই শর্তেই রাজী হলেন গান্ধীজী, স্টেশন-মাস্টারকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন।

এতকার মানুষের সম্বন্ধে গান্ধীজীর কোনো রকম ভ্রান্ত ধারণা কোনো দিন

ছিল না। তাই আফ্রিকার এই বর্ণ-বিদ্বেষটা তাঁর কাছে আরো অস্বাভাবিক লেগেছিল। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজদের কাছে কতো সহজ স্নেহই না তিনি পেয়েছেন! সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের বর্ণ-দর্পটি যে স্থানীয় সংকীর্ণতা ও অশিক্ষারই ফল, তা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হোলো না। শ্বেতকায়দের সেই স্বাভাবিক সদাশয়তার পরিচয় তিনি ট্রেনে উঠে আবার পেলেন। ট্রেন জার্মিস্টনে এসে পৌছ'লে গার্ড টিকিট পরীক্ষা করতে এলো। গান্ধীজীকে প্রথম শ্রেণীতে দেখে বললো, "তৃতীয় শ্রেণীতে যাও।"

কামরায় একজন ইংরেজ ছিলেন, তিনি গার্ডকে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তুমি এই ভদ্রলোককে বিরক্ত করছ কেন? দেখছ না, ওঁর কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে?"

গার্ড গজগজ ক'রে উঠলো, "আপনার জন্যেই বলছি। আপনি যদি কুলির সঙ্গে যেতে চান, তাতে আমার কি?"

বকতে বকতে গার্ড নেমে গেলো।

রাত প্রায় আটটায় গান্ধীজী প্রিটোরিয়া পৌছলেন।

ট্রান্সভালে আসবার আগে তিনি নাতালে আবদুল্লা শেঠকে জানিয়ে এসেছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ শেঠ তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের সঙ্গে দেখা করবেন। নাতালে দাদা আবদুল্লার যেমন প্রতিষ্ঠা, তেমনি ট্রান্সভালে ছিল শেঠ তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের। তাই প্রিটোরিয়া পৌছবার প্রথম সপ্তাহেই গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁকে জানালেন, তিনি আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের অবস্থা ভালো ভাবে বুঝবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। শেঠ তৈয়ব হাজী আনন্দিত হয়ে এ-বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন।

ভারতীয়দের একটি সভা আহূত হোলো। বক্তৃতা করবার ক্ষমতা গান্ধীজী যেন অকস্মাৎ কোথা থেকে পেলেন। তাঁর লাজুক ভাব তিরোহিত হোলো। তিনি এই সভায় দুটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিলেন। প্রথমত, ব্যবসায়ের মধ্যে সত্য ও সততার স্থান।

গান্ধীজীর আজীবন এই সরল বিশ্বাস ছিল যে, সত্য ও সততার মধ্যে দিয়েও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্ভব। গীতার বাণীকে তিনি কোনো বিশেষ সমাজের তৎকালীন বর্ণনা বা প্রচার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তা ছিল তাঁর কাছে চিরন্তন দৈব-বাণী। গীতায় ভগবান বলেছেন, তিনিই বর্ণ-চতুষ্টয়ের স্রষ্টা। অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বর্ণ-চতুষ্টয় বা 'ডিভিশন অব লেবার' রয়েছে—সমাজের ক্রম-বিকাশের ফলে, তার উৎপত্তি হয় নি। আবার এই বিধাতার নির্দেশ অনুসারেই এই

বর্ণ-চতুষ্টয়কে ফলের প্রতি উদাসীন হয়ে নিস্পৃহভাবে স্ব স্ব কর্ম ক'রে যেতেও বলা হয়েছে। সুতরাং, গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, তিনি যেমন নিস্পৃহভাবে গীতার নির্দেশ অনুসারে কাজ করছেন, তেমনি ব্যবসায়ীরাই বা তা করবেন না কেন? গান্ধীজী তাই ব্যবসায়ে সত্য ও সততার কি স্থান, সে-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করলেন।

গান্ধীজীর পরবর্তী জীবনেও এই প্রকারের ভ্রান্ত চেষ্টার বহু প্রমাণ আমরা পাবো। গান্ধীজী যদি পৃথিবীর ও সমাজের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করতেন, এবং গীতার বাণীকে একটি বিশেষ সমাজের প্রচার হিসাবে গ্রহণ করতেন, তবে তাকে শাশ্বত সনাতন ব'লে ধ'রে নিয়ে আজকের ভিন্নতর সমাজে তার প্রয়োগের ভ্রান্ত চেষ্টা ক'রে ভুল করতেন না। সমাজ যখন আরো অল্পবয়স্ক ছিল, তখন তাতে যে নীতি ও রীতির প্রয়োগ ঘটেছিল, আজকের সমাজে সেই রীতি ও নীতির প্রয়োগ-চেষ্টা নিছক শক্তিক্ষয়, এমন কি অনেকখানি হাস্যকর। এ যেন কোনো যুবককে তার অন্ন-প্রাশনের নিকারবোকারটা পরতে বলা!

এ-ধরনের পরামর্শকে মানুষে হয় ব্যাবহারিক বিষয়ে অজ্ঞতা, নয় দায়িত্বজ্ঞানহীন রসিকতা ব'লেই গ্রহণ করে। মানুষ তখন কৌতুক বোধ করে, কিন্তু সে পরামর্শ অনুসরণ করে না। তাই গান্ধীজী যখনই তাঁর সরল উদার মনে কলকারখানার মালিককে, জমিদারকে, ব্যবসায়ীকে গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন, তখনই তারা তাঁকে লুকিয়ে স্ব স্ব আস্তিনের আড়ালে হেসেছিল, আর বাপুজীকে ইহলৌকিক সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ব'লে ঘোষণা ক'রে তাদের 'ক্ষুদ্র' স্বার্থের কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। তাই তারা গান্ধীজীকে সহজে অবতার বানিয়েছে। কারণ, তারা বলতে চায়, অবতারের উপদেশ, মহামানবের পরামর্শ পুঁথিতে টুকে রাখা যায়, কিন্তু পার্থিব দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা চলে না। ভগবদ্‌গীতায় নিষ্কাম কর্মের বাণী পাঠ ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করা যায়; কিন্তু তাই ব'লে কার্যত তাকে প্রয়োগ করা চলে না। তাই গান্ধীজির বাণী প্রচারের জন্যে দেশীয় পুঁজিপতিরা যখন বহু অর্থব্যয় করেছে এবং করছে, তখন তাঁর একটি বাণীকেও তারা কার্যে পরিণত করে নি বা করছে না। গীতার ফলসম্পর্ক-হীন কর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে তাদের প্রয়োজন আছে। কারণ, দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকরা তাদের লাভলোকসানের দিকে উদাসীন হয়ে কাজ না করলে দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদের নির্ভয়ে উদরপূর্তি ঘটবে কেমন ক'রে? তাই পুঁজিপতি ও জমিদার-জোতদারদের আজ অহিংসার বাণী প্রচারের এতই সমারোহ। তারা যে রাতারাতি অহিংস্রক গান্ধীবাদী হয়ে উঠেছে, তা নয়,—পাছে নির্যাতিত নিপীড়িত

শ্রমিক-কৃষাণের ক্ষুধিত আক্রোশ হিংসার বহ্নিতে আত্মপ্রকাশ করে, এই ভয়। কিন্তু গান্ধীজী কেবল অহিংসার কথাই যে বলেন নি, একথা আমাদের ভুললে চলবে না। গান্ধীজীর কাছে অহিংসা ছিল উপায়মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল শোষণ-পেষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার। অন্ততঃপক্ষে অহিংসার পথে, শোষক শ্রেণীর স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগের পথে, একদিন তা ঘটবে, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি শ্রমিকদের সভায় উচ্চকণ্ঠে তাই বলেছিলেন, "শ্রমিকরাই কলকারখানার সত্যিকার মালিক", তিনি তেভাগা আন্দোলনের সময় বলেছিলেন, "শ্রম যাব, ফসল তার।" কিন্তু সে-বাণীগুলির তো কই প্রয়োগ বা প্রচার চলছে না দেশে? সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ক'রে দেশে ব্যাপকভাবে অহিংসা প্রচারের আজ যে কি প্রয়োজন, তা সহজেই বোঝা যায়। শোষণহীন পেষণহীন একটি সমাজ প্রবর্তনেব উদ্দেশ্যকে অস্বীকার ক'রে তাঁর অহিংস উপায়ের প্রচারের গভীরে যে বিরাট একটি ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা বিন্দুমাত্র ভোলা যায় না। সুতরাং গান্ধীবাদে সত্যিকার বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরা গান্ধীজীর উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য দেবেন। কেবল তাঁর উপায়টির দিকে নয়। গান্ধীজীর কাছে উদ্দেশ্য ও উপায় ছিল এক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সত্য ও সততায় পূর্ণ, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাঁর উপায়ও ছিল সেই একই সত্য, সততা, অহিংসা ও বিদ্বেষহীনতা। কিন্তু আজকের তথাকথিত গান্ধীবাদী পুঁজিপতি জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের কাছে উদ্দেশ্য ও উপায় এক নয়। তাদের উদ্দেশ্য, তাদের ইতিহাসগত চরিত্রগত মিথ্যা, অসাধুতা, হিংসা ও শোষণ। আর, সেই মিথ্যা, অসাধুতা, হিংসা ও শোষণকে কার্যত প্রয়োগের জন্যে তারা উপায়রূপে গ্রহণ করছে শ্রমিক ও কৃষাণদের মধ্যে সত্য, সততা, অহিংসা ও বিদ্বেষহীনতার প্রচার। এই ধরনের প্রচার শোষকদের মধ্যে কেবল আজ বা ভারতেই নূতন নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশেও খ্রীষ্টের সাম্যবাদী বাণীকে অস্বীকার ক'রে খ্রীষ্টান ধনিকরা প্রচার করেছে "ছুঁচের ছিদ্রের মধ্যে হস্তীর প্রবেশের মতোই ধনিকদের স্বর্গে প্রবেশ একান্তই অসম্ভব।" অথচ স্বর্গের প্রতি তাদের নিজেদের বিন্দুমাত্র আসক্তি দেখা যায় না। কারণ, এই স্বর্গ-প্রবেশের বাণীটি কৃষক ও শ্রমিকদের উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হয়। তাতে ভবিষ্যৎ স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বর্তমান পারিশ্রমিক থেকে তাদের সহজে বঞ্চিত রাখা যায়।

ফরাসী বিপ্লবের সময়কার 'স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য' এই ত্রিনীতি থেকে সৌভ্রাত্র্যের বাণীটিকে ফরাসী বুর্জোয়ারা কিভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিল, ফরাসী বিপ্লব ও ফরাসীদেশে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস যাঁরা জানেন,

তাঁরাই তা লক্ষ্য করেছেন। বুর্জোয়ারা তখন শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিরত করবার জন্যে প্রচার করতো, পুঁজিবাদী ও শ্রমিক, এরা সবাই ভাই ভাই। আমাদের দেশেও ভাই-ভাইয়ের বাণী আমরা বাত্রিদিন শুনছি। কিন্তু বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করছি না, যে ভাই-ভাই সম্পর্কের নামে এক ভাই অন্য ভাইকে প্রতারণা করে, শোষণ করে, নির্যাতন করে, নিজে রাজভোগে থেকে ভাইকে অনাহারে রাখে, আর ভ্রাতৃত্বের অজুহাতে কলহ করতেও নিষেধ করে, সে কেমন ভাই, কি সে ভাই-ভাই সম্পর্ক! তথাকথিত গান্ধীবাদীরা আজ গান্ধীজীর অহিংসা ও সৌভ্রাত্র্যের বাণীকে স্বশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে চাইছে। তাই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে গির্জার প্রাচীরের আড়ালে থেকে গুলী ক'রে নরহত্যার মতন।

এই প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁর একটি সতর্কবাণী আমাদের মনে রাখতে হবে: "ভগবান গান্ধীজীকে গান্ধীবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করুন।"

রোলাঁর ভগবান গান্ধীজীকে রক্ষা করেন নি। কিন্তু জনসাধারণকে করতে হবে। গান্ধীবাদকে আজ তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কোটি কোটি ভারত-বাসীকে সচেতন হ'তে হবে—গান্ধীজীর প্রচারিত সত্যিকার সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশে।

আজকের মতোই সেদিনও সকল দেশের জমিদার, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের মতো প্রিটোরিয়ার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে গান্ধীজীর এই পরামর্শকে অকেজো ব'লে মনে হয়েছিল, একথা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁরা সকলে আন্তরিকভাবে গান্ধীজীকে সমর্থন করেছিলেন। সেই প্রস্তাবটি ছিল, সরকারের বর্ণবিদ্বেষী অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতি। তার কারণও আমরা শীঘ্রই লক্ষ্য করবো।

যাই হোক, গান্ধীজী অবিলম্বে তৎপর হয়ে উঠলেন। এইভাবে তাঁর ভাবী সৈনাপত্যের হাতে-খড়ি হোলো।

॥ চার ॥

এখানে আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ সম্পর্কে আসল কারণটি নির্ণয় করা প্রয়োজন। ব্যাধির স্বরূপ না জেনে তার চিকিৎসা করতে গিয়ে বড়ো লাভ হয় না। তাই বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পরও আজ সেখানে ভারতীয় নির্যাতন সমানভাবেই চলছে। বর্ণ-বিদ্বেষের ব্যাধির স্বরূপটি জানলে তার চিকিৎসাও সহজ হয়ে উঠবে।

পুঁজিবাদের পরিণতি ঘটে সাম্রাজ্যবাদে এবং ঔপনিবেশিক শাসনে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাদা পুঁজি তার একাধিপত্য করতে চায়। তাই এশিয়াবাসী কালো পুঁজির প্রতি তার এই কঠিনতম বিদ্বেষ। ভারতীয় পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীরা যাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনোরূপে প্রভাব বা স্থায়িত্ব বিস্তার করতে না পারে, সেই জন্যে শত বিধিব্যবস্থা। সেইজন্যে তাদের জমির মালিকানা-স্বত্ব থেকে সকলভাবে বঞ্চিত করতে হবে, তাদের ভোটাধিকার নিতে হবে ছিনিয়ে, সেই জন্যে, এমন কি ভারতীয় শ্রমিকদেরও ভারতীয় মনিবের অধীনে চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষটি তাই সাদা পুঁজির সঙ্গে কালো পুঁজির লড়াই মাত্র ছিল এবং আছেও। ইতিহাসের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে পুঁজিকে দুই দিকে দুই শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। একদিকে তার বাইরের শত্রু শ্রমিক, অন্যদিকে তার ঘরের শত্রু বিভীষণ,—অন্য পুঁজি। এই দ্বিবিধ সংঘাতের ফলেই পুঁজিবাদের মৃত্যু অনিবার্য। আবার ইতিহাসের কঠিন নিয়তি অনুসারে এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের হাত থেকে পুঁজির কোনো অব্যাহতিও নেই। কারণ, দ্বিমুখী দ্বন্দ্বই তার অস্তিত্বের মূল কথা।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যুত্থানের জন্যে যতোগুলি বিপ্লব ঘটেছে, সর্বত্রই দেখা গেছে, পুঁজিবাদীদের নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষাণরা জুগিয়েছে বিপ্লবের উপকরণ ও শক্তি। কারণ, গণতান্ত্রিক অধিকারের সত্যিকার আধার বা অধিকারী হোলো শ্রমিক ও কৃষাণরা। সুতরাং, পুঁজিবাদীরা নিজেদের বিকাশের জন্যে যখনই কোনো অধিকার দাবি করেছে, তখনই তারা গণতান্ত্রিকতার ভেক নিয়েছে, তখনই তাদের নিশানে সাম্য, সৌভ্রাত্র্য ও স্বাধীনতার বাণী অঙ্কিত হয়েছে, তখনই নির্যাতিত গণমানবের জন্যে কুম্ভীরের ক্রন্দন তারা ধ্বনিত করেছে বারে বারে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কেবল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুদয়ের সময়েই নয়, যে কোনো ঔপনিবেশিক দেশের স্থানীয় পুঁজিবাদী সমাজ যখন বিদেশীয় পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে আপনার বিকাশ ও বিস্তারের জন্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখনও দেখা যায়, বিদ্রোহী পুঁজিবাদীরা দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকদের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। কৃষাণ ও শ্রমিকদের নির্যাতনের নামে, নিপীড়নের নামে, গণতান্ত্রিক অধিকার দাবির নামে, স্থানীয় নবজাগ্রত বুর্জোয়া সমাজ বিদ্রোহের নিশান উডায়। এর উদাহরণ খোঁজার জন্তে আমাদের বিদেশে যেতে হবে না, উদাহরণ এখানে ভারতবর্ষেই মিলবে। বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের পরিণতির ফলে ভারতবর্ষ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের পদানত হোলো, তখন ইতিহাসের নিয়ম অনুসারেই ভারতে সে জন্মদান করলো এক জারজ বুর্জোয়া সমাজ। ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হোলো, সে তখন তার জন্মদাতাকে বিতাডিত ক'রে মাতার ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হ'তে চাইলো। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের ন্যায়সংগত দাবিদার, মাতার সত্যিকার সন্তান ও তার অসীম সম্পদের স্রষ্টা—কৃষাণ ও শ্রমিকরা। ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ তাদের নিজেদের স্বার্থকে সত্যিকাব দাবিদারের ন্যায্য দাবির অন্তরালে গোপন ক'রে বৃটিশ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভয়ংকর স্বার্থ সুন্দর ও শোভনীয় হয়ে উঠলো গণ-স্বাধীনতার কপট মাঙ্গলিকতায়; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রের ধ্বনিতে তাদের স্বার্থলোলুপ দ্রংষ্টার ঘর্ষণ সেদিন কারো কানে এলো না। ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ ঘন ঘন প্রস্তাব পাস ক'রে জানাতে লাগলো, দেশের নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষাণ ভাইদের সকল দুঃখ দারিদ্র্য, বেদনা ও গ্লানির অবসান হ'তে পারে, কেবল একবার বৃটিশরা যদি চলে যায়। ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের এই ঘন ঘন ঘোষণার মধ্যে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার' নীতিরই মহড়া চললো—তারা চাইলো ভারতীয় কৃষাণ ও শ্রমিকদের দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়া সমাজকে বিতাড়িত করতে—অর্থাৎ কথামালার বিখ্যাত শৃগালের ভূমিকা নিতে। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের এই রূপটি আজ জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৃটিশ বুর্জোয়ারা ভারতে যখন ক্ষমতাচ্যুত হোলো, তখনই ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ তাদের সাম্য ও স্বাধীনতার টিকি-তিলকের ভেক মুহূর্তে বর্জন ক'রে প্রবল মাংসাশী হয়ে উঠলো—সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষাণ ও শ্রমিক নিষ্পেষণের এক বিপুল কার্যক্রম গৃহীত হোলো।

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও যখন সাদা পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় কালো পুঁজির সংঘাতের সূচনা হোলো, তখন দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় ধনিক ব্যবসায়ীরা

ভারতীয় জনসাধারণের অধিকারের দাবি ও বর্ণবিদ্বেষের প্রতিবাদের মতো কয়েকটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী নিয়েই তাদের সংগ্রাম শুরু করতে চাইলো। তবে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল পরিপূর্ণরূপেই। তাই ভারতীয় শ্রমিকদের অসন্তোষ ও সংগ্রামী শক্তির পিঠে চ'ড়েই সেদিন কালো পুঁজি দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা পুঁজির পাশে গিয়ে পৌঁছতে চাইলো।

কিন্তু ইতিহাসের এই জটিল ঘটনাগুলিকে সেদিন গান্ধীজী বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চান নি। যদিও সাদা ও কালো পুঁজির লড়াইকে স্পষ্ট ক'রে তোলার মতো বহু তথ্য ও ঘটনা তিনি তাঁর "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" গ্রন্থেও উল্লেখ ক'রে গেছেন। কিন্তু ঘটনাগুলিকে তিনি যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করেন নি। তাই বর্ণ-বিদ্বেষের বীভৎস ব্যাধির স্বরূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েনি। তিনি কেবল দেখলেন তার বাইরের বিকট উপসর্গ, আর কুৎসিত গলিত ক্ষত। তাই পীড়িতের বেদনায় তাঁর প্রাণ বিগলিত হোলো, তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে একদা যেমন সস্নেহে সেবা করেছিলেন, তেমনি সস্নেহ করুণায় সেবা করতে চাইলেন বর্ণবিদ্বেষ-কাতর নিপীড়িত দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসা নয়, সেবা,—সেবা করতে চাইলেন।

ব্যাধির স্বরূপ গান্ধীজী জানতেন না, তাই কেবল ব্যাধির উপসর্গ উপশমের জন্যে তিনি সস্নেহে প্রলেপ দিলেন। আর এইটিই তাঁর চরিত্রের প্রধানতম দিক,—জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর মানসিক গঠনভঙ্গির দিক থেকেও তিনি চিকিৎসক ছিলেন না, ছিলেন শুশ্রূষাকারী মাত্র। অবশ্য সমাজনীতিতে, রাজনীতিতে এই ধরনের শুশ্রূষা ও সেবার রীতিকে তিনি অনেক সময় চিকিৎসা ভেবেও ভুল করেছেন। একটি মহান্ স্নেহময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। আর শ্রেষ্ঠ শুশ্রূষাকারী হবার জন্যে এই গুণটিই ছিল সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। তাঁর এই স্নেহময় হৃদয়টিই তাঁকে বুয়ার যুদ্ধে, জুলু যুদ্ধে সেবাদল গঠন করিয়েছে, তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে দীন হীন ভারতীয়দের দুঃখে বেদনায় ভারতীয় রাজনীতিতে, তাঁকে শান্তির বাণী হাতে পাঠিয়েছে নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে। তাই দেশ যখন আসন্ন অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নানা উপসর্গে বিপন্ন বিপর্যস্ত হয়েছে, তখনও তিনি মূল ব্যাধির দিকে লক্ষ্য দেন নি, তার উপসর্গগুলির যন্ত্রণাকে সাময়িক ভাবে উপশম করার চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংকটের মূল ব্যাধি পুঁজিতান্ত্রিকতার দিকে দৃষ্টি দেন নি, সেই বীভৎস ব্যাধির বিকট যন্ত্রণায় কাতর দেশকে তিনি দিয়েছিলেন তাঁর বিপুল

স্নেহসিক্ত হৃদয়ের সেবা ও শুশ্রূষা, তাঁর চরকা, তাঁর প্রেম, তাঁর অহিংসা, তাঁর হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-পার্শী-জৈন-বৌদ্ধ-শিখের 'মিলনের মহা মৈত্রীর' বাণী। শুশ্রূষাকারীর ওই স্নেহসজল হৃদয়, কিন্তু কেবল হৃদয়েই তো চিকিৎসকের চলে না। চিকিৎসকের চাই দৃপ্ত বুদ্ধি, ব্যাবহারিক জ্ঞান, কঠোর, এমন কি নৃশংস, নিষ্ঠা। তাই সোভিয়েত বিপ্লবের সময় আমরা যখন লেনিনকে[১] দেখেছি কঠোর নিপুণ চিকিৎসকরূপে[১], তখন দ্বিতীয় বিপ্লবের কালে গান্ধীজীকে আমরা দেখেছি, এক স্নেহময় শুশ্রূষাকারীর ভূমিকায়, যে-শুশ্রূষাকারী স্নেহের অতি প্রাবল্যে অনেক সময় ব্যাধির কোনো উপসর্গের সাময়িক উপশমের জন্যে রোগীকে অনিষ্টকর পথ্য বা ঔষধ দিচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছে, তিনি যেন সেই স্নেহপরবশ জননী, যিনি স্নেহের দুর্বলতায় রুগ্‌ণ মুমূর্ষু পুত্রের মুখে অনিষ্টকর পথ্যও তুলে দিচ্ছেন, কিংবা যিনি কঠিন অস্ত্রচিকিৎসকের কবল থেকে পুত্রকে সস্নেহে আগলে রাখছেন, কোনোমতেই বুঝতে চাইছেন না যে, এই অস্ত্রচিকিৎসা ভিন্ন তাঁর মুমূর্ষু পুত্রের কোনো গত্যন্তর নেই। লেনিনের কঠোর, নিপুণ, এমন কি কতক পরিমাণে নৃশংস অস্ত্রচিকিৎসায় আজ সোভিয়েত দেশগুলি এক নূতন জীবনে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে, আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্বেত পীত কৃষ্ণ বিভিন্ন বর্ণের মানুষ সমান অধিকার পেয়েছে, এশিয়াবাসী স্তালিনকে ইউরোপীয়েরা তাদের সর্ববরেণ্য নেতা রূপে গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। যে-উজবেকিস্থানের বাসিন্দাদের নাম (উজবুক) বাংলা ভাষায় একদা মূর্খতাব্যঞ্জক তিরস্কাররূপে প্রচলিত ছিল, তারা মাত্র কয়েক বৎসরে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় আজো বর্ণবিদ্বেষের অবসান হয় নি, আর ভারতবর্ষ আজো তার মুমূর্ষু রোগশয্যায় প'ড়ে কাতরাচ্ছে। কিন্তু আজকের ব্যাধি-গ্রস্ত ভারতের সেই-ই চরম ক্ষতি নয়। তার রোগশয্যার পাশ থেকে তার স্নেহসজল শুশ্রূষাকারী মহাপ্রাণটিকেও সেই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাধির মারাত্মক সংক্রমণ নিষ্ঠুর-ভাবে সরিয়ে নিয়েছে।

তাই বলেছি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীজী যখন বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, সেখানে তাঁর ভূমিকাটিকে আমরা, চিকিৎসকের নয়, শুশ্রূষাকারীর রূপেই দেখলাম। এজন্যে গান্ধীজীকে দোষ দেওয়া যায় না, যেমন দেওয়া যায় না চিকিৎসা জানে না ব'লে শুশ্রূষাকারিণীকে। গান্ধীজী ইতিহাস ও অর্থনীতিকে কখনো তাদের বাস্তবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চান নি। তাঁর বিরাট অতল একটি হৃদয় তাঁর

[১] লেনিন বুঝি হ্যামলেটের মতোই বলেছিলেন, "*I must be cruel only to be kind.*" (অবশ্য, শেক্সপীয়রের হ্যামলেট বা তুর্গেনেভের বাজারভ চরিত্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা-ও অন্যায়।)

বুদ্ধিকে চিরদিনই কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, গভীর সমুদ্র যেমনভাবে উর্ধ্ব আকাশকে কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তার ব্যত্যয় হয় নি। তাই গান্ধীজী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নাতালে শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী দাদা, শেঠ আবদুল্লা হাজী আদম, শেঠ দাউদ মহম্মদ, মহম্মদ কাসিম কমরুদ্দীন, শেঠ আদমজী মিঞা খাঁ, কোলেন্দভেলু পিল্লাই, সি লক্ষ্মীরাম, রঙ্গস্বামী পাড়য়াচি, আদমজীভা ও পার্শী রস্তমজী প্রভৃতি বিরাট ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললেন। ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হোলো —'নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস'।

আমরা যথাস্থানে দেখবো, সাদা পুঁজির বিরুদ্ধে কালো পুঁজির লড়াইয়ের রথকে খনির শ্রমিকরা কীভাবে টেনেছে, যদিও ভারতীয়দের ভোটাধিকার হ'লেও আসল ভোটাধিকার তাদের হাতে আসবে না, যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় জমি বা জমিদারি কেনার অধিকার ভারতীয়রা পেলেও, তারা জমির বা জমিদারির মালিক হবে না। অবশ্য, এ নূতন কিছু ঘটনা নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে, যেখানেই কোনো অবিচারে বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে,—স্বাধীনতার জন্যে বা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে লড়াই হয়েছে, শ্রমিক বা কৃষাণের শক্তিই সেখানে তাকে জয়যুক্ত করেছে। ভারতীয় কংগ্রেসের খণ্ড জয়ের ইতিহাসগুলির মধ্যেও সন্ধান করলে তারই একান্ত প্রমাণ মিলবে। ভারতীয় কংগ্রেসের পরাজয় ও বিপত্তি তখনই ঘটেছে, যখনই তার দেশীয় বুর্জোয়া নেতারা দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকের বিপুল শক্তির সাহায্য না নিয়ে বিদেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। এই বন্ধুত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গণতান্ত্রিক ভেকও তাঁরা ছেড়ে ফেলেছেন।

গান্ধীজীই ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন, কিন্তু সে-স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপটি তিনি যেমন বুঝতে পারেন নি, তেমনি বুঝতে পারেন নি দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের রূপটিও! তাই গান্ধীজীকে এমন কোনো মোটর চালকের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে মোটর চালক মোটরের বিভিন্ন যন্ত্রের গুণাগুণ না জেনে, কোনো দুর্যোগের রাত্রে কেবল হৃদয় আর দুঃসাহসের জোরে বিপন্ন যাত্রী-দের নিয়ে দুর্গম পার্বত্য পথে যাত্রা করলো। মাঝপথে মোটরের ঘটলো দুর্ঘটনা, সহৃদয় দুঃসাহসী চালকের ঘটলো মৃত্যু, বিপন্ন যাত্রীরা বিপন্নতর হোলো, যানের কলগুলো গেলো বিগড়ে। কি ভারতে, কি আফ্রিকায়, গান্ধীজী ঠিক এমনি একটি ভূমিকাতে বারে বারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বিরাট হৃদয় ও দুরন্ত দুঃসাহস নিয়ে তিনি নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাতে

স্থায়ী কোন ফললাভ হয় নি। তা আজকে ভারতীয় জনসাধারণের দুর্দশা দেখলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নির্যাতনের সংবাদগুলি শুনলে স্পষ্টই বোঝা যায়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছু আগে একটা আইন ক'রে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ভারতীয়দের সমস্ত স্বত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যারা হোটেলে ওয়েটার বা অনুরূপ চাকরিতে সামান্য মজুরি নিয়ে থাকতে চায়, কেবল সেই রকম ভারতীয়রাই থাকবার অনুমতি পেয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদেরও নামমাত্র খেসারত দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্রান্সভালেও ভারতীয় দমনের জন্যে ১৮৮৫ সালে কড়া আইন পাস হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, ভারতবাসী মাত্রকেই মাথা পিছু তিন পাউণ্ড ক'রে প্রবেশ-ফি দিতে হবে, কেবল নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তারা জমি পাবে, তবে সে-জমিতেও তাদের কোনো রকম মালিকানা স্বত্ব থাকবে না। ভোটেরও অধিকার থাকবে না। ফুটপাথ দিয়ে তারা হাঁটতে পারবে না। রাত্রি নটার পর বিনা লাইসেন্সে বাইরে আসা তাদের পক্ষে বে-আইনী হবে। অর্থাৎ, ধনী ভারতীয়রা, যাদের পক্ষে এইসব নিয়ম-কানুন মেনে চলা মুনাফার খাতিরেও প্রায় অসম্ভব, এমনিভাবেই তাদের বিতাড়নের ব্যবস্থা হয়েছিল। গান্ধীজী নিজেও একদিন ফুটপাথে চলতে গিয়ে ভয়াবহভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন। সুতরাং আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করছি, ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়কে দক্ষিণ-আফ্রিকায় কোণঠাসা ক'রে রাখবার জন্যেই সাদা পুঁজিবাদীরা এই বর্ণবিদ্বেষকে জাগিয়ে রেখেছে। আর ভারতীয় ধনিকদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের লড়াইয়ের দ্বারা বর্ণবিদ্বেষের সম্পূর্ণ বিনাশ হবে, এমন আশা করা বৃথা। বর্ণবদ্বেষ বিনাশের জন্যে চাই সাদা ও কালো পুঁজির সম্পূর্ণ নিপাত—এবং সাদা ও কালো শ্রমিকদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। সোভিয়েত দেশে ইউরোপীয় ও এশীয় মানুষরা যে বর্ণবিদ্বেষহীন হয়ে শান্তিতে বসবাস করছে, তা উল্লেখ করেছি। যাই হোক, ধনিক গণতান্ত্রিক লড়াইকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে সাধারণ মানুষকে তা প্রস্তুত করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিদ্বেষ-বিক্ষোভ খণ্ড ও বিক্ষিপ্তভাবে দেশময় ছড়িয়ে থাকে, ধনিক-পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি তাকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তোলে।

ভারতবর্ষে ধনিক-পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যে ডাক দিয়ে গান্ধীজী যেমন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে অন্তত সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও প্রস্তুত ক'রে তুলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তিনি করেছিলেন তেমনটি। ধনী ব্যবসায়ীদের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে জনসাধারণকে জানিয়েছিলেন অন্যায়ের কথা,

অবিচারের কথা, জাগরণের কথা, সংগ্রামের কথা। ভারতবর্ষে সে-সংগ্রামের যেমন শেষ হয় নি, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও হয় নি তেমনিটি। তবু উভয় স্থানেই গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও প্রস্তুত ক'রে তোলার গৌরবের তিনি যে অন্যতম অধিকারী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কয়েক মাসের মধ্যে আবদুল্লা শেঠের মামলা শেষ হোলো। গান্ধীজীই মধ্যস্থ হয়ে মামলাটি মিটিয়ে দিলেন। তারপর, তিনি প্রস্তুত হলেন দেশে ফেরবার জন্যে। এই কয়েক মাসেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাই গান্ধীজীকে বিদায় দেওয়ার জন্যে একটি ভোজসভা আহূত হোলো। এই ভোজসভায় একটি সংবাদপত্রে গান্ধীজীর চোখে পড়লো—নাতাল আইনসভায় ভারতীয়দেব "ভোটের অধিকার রদ" করবার ব্যবস্থা। অর্থাৎ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভালে ভারতীয় ধনিকদের কোণঠাসা করবার যে ব্যবস্থা হয়েছে, নাতালেও ঠিক তেমনি একটি ব্যবস্থা করবার চেষ্টা চলছে। শেঠ আবদুল্লা এবং তাঁর নেতৃত্বে ধনিক সম্প্রদায় এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বুঝলেন। তাঁরা অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়েছেন, ট্রান্সভালে হচ্ছেন এবং নাতালেও অচিরেই হবেন। সুতরাং বিদায়ী ভোজসভা রাজনৈতিক আলোচনা-সভায় পরিণত হোলো। সংঘবদ্ধভাবে সরকারী কাজের প্রতিবাদের জন্যে গান্ধীজীকে আরো মাসখানেক থেকে যেতে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হোলো। গান্ধীজী স্বীকার করলেন সানন্দে। নাতালে ভারতীয় কংগ্রেসের হোলো প্রতিষ্ঠা। চাঁদা উঠতে লাগলো, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হোলো—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যুবকরাই এ-বিষয়ে অগ্রণী হলেন। বিল পাস হয়ে যাবে, একথা সবাই জানতেন। কিন্তু তাতে তাঁরা ভয় পেলেন না। এই তো তাঁদের সংগ্রামের শুরু। সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে আরজি পাঠানো হোলো। ফলে এ-বিষয়ে সংবাদপত্রগুলিতে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা চলতে লাগলো। ঐ সময় ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন লর্ড রিপন। তাঁর কাছেও একটি দরখাস্ত পাঠানো হোলো। দরখাস্ত রচনা করলেন গান্ধীজী স্বয়ং এবং দরখাস্তে দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর সংগ্রহ হোলো। এই আবেদন ইংল্যাণ্ডে এবং ভা তবর্ষেও প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। গান্ধীজী দেখলেন, এখন নাতাল ছেড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং নাতালেই স্থায়ীভাবে ব্যারিস্টারি করবার কথা তিনি স্থির করলেন। কালা আদমি ব'লে 'বার' থেকে প্রথমে বহু প্রতিবাদ এলেও অবশেষে গান্ধীজী ব্যারিস্টারি করবার অনুমতি পেলেন। এমনিভাবে এই নাবুক নয় রাজুবটি দক্ষিণ আফ্রিকার বক্ষ

জলাশয়ে বিদ্রোহের তুমুল তরঙ্গ তুলে সেই তরঙ্গশীর্ষে নির্ভীক দৃপ্ততার সঙ্গে এসে দাঁড়ালেন।

একটু আগেই বলেছি, গণতন্ত্রের নামে ধনিকরা যেখানে যতো আন্দোলন করেছে, সর্বত্রই তাদের শ্রমিক ও কৃষাণ জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হয়েছে এবং তাদেরই নামে আন্দোলন চালাতে হয়েছে। কারণ, সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্র্যের গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল আধার বা অধিকারী কেবল তারাই। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলন চালাতে লাগলো,—অর্থাৎ রোগই যখন চিকিৎসকরূপে দেখা দিলো,—তখন শ্রমিকদের সাহায্য না নিয়ে তাদের গত্যন্তর রইলো না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত শ্রমিকদের সুনিয়ন্ত্রিতরূপে বিপুল শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে কে? সে ভার পড়েছিল গান্ধীজীর উপর। শ্রমিকরা তাদের শোষক ধনিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বিশ্বাস ক'রে সংগ্রামে যোগ না দিলেও গান্ধীজীর মতো মহাপ্রাণকে তারা সহজে বিশ্বাস করতে পেরেছিল। আর এমনি ভাবে তারা চিরদিন বিশ্বাস করে ব'লেই শোষক সম্প্রদায়ের লড়াইও সম্ভব হয়। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার গিরমিটিয়া বা চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাদের ব্যক্তিগত নির্যাতনে ও নিপীড়নে তিনি সর্বদাই সহায় ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বালসুন্দরম্ নামে একজন ভারতীয় শ্রমিকের যে নির্যাতনের উল্লেখ করেছেন, তা-ই ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অবস্থার নমুনা। তাদের শ্রমিক বলা চলে না, তারা ছিল ক্রীতদাস। গোরা মনিবরাই কেবলমাত্র চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রাখতে পারতো। চুক্তিতে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে মনিবরা শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ নির্যাতন করতো—এক শতাব্দী পূর্বে ক্রীতদাসদের উপর তারা করতে পারতো যেমনটি। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা গোরা মনিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে গণ্য হোতো। এমনি একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বালসুন্দরম্, একদা ছিন্নবস্ত্রে, রক্তাক্ত দেহে গান্ধীজীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হোলো। গান্ধীজী শুনলেন, বালসুন্দরম্ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন গোরা মনিবের কাছে কাজ করে। গোরা মনিব কোনো কারণে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে এমন প্রহার করেছে যে, তার দুটি দাঁত পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে। গান্ধীজী বালসুন্দরম্‌কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তাকে নিয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বালসুন্দরম্‌কে তিনি পরমাত্মীয়ের মতো সেবা ও সাহায্য করলেন। এই কাহিনীটি গিরমিটিয়াদের মধ্যে অচিরে ছড়িয়ে পড়লো। বালসুন্দরমের দুর্ভাগ্যকেও হিংসা

করে এমন গিরমিটিয়ার অভাব ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধীজীর কাছে তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এমনিভাবে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের পরম মিত্র হয়ে উঠলেন। ভারতীয় রাজনীতিতেও প্রবেশের পূর্বাহ্নে আমরা গান্ধীজীকে এমনি একটি ভূমিকায় আবার লক্ষ্য করবো। তিনি কৃষাণ ও শ্রমিক-বিদ্রোহের নেতা রূপেই একদা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় গিরমিটিয়াদের উপর বৎসরে পঁচিশ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৭৫৲ কর ধার্য করবার জন্য নাতালে চেষ্টা হোলো। গিরমিটিয়াদের রোজগারের তুলনায় এই করটি আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর লাগে। কারণ, এর পরিমাণ গিরমিটিয়াদের বাৎসরিক আয়ের চেয়েও ছিল বহুগুণ বেশি। সুতরাং কর আদায়ের জন্যে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গিরমিটিয়া ভারতীয়দের বিতাড়নের জন্য যে নাতাল সরকার এই কর ধার্যের প্রস্তাব করেছিলেন, তা সুস্পষ্ট। অথচ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় গিরমিটিয়াদের নাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সাদা পুঁজি-চালিত দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের কী সাধাসাধি, কী চেষ্টাই না ছিল! কিন্তু চল্লিশ বৎসর বাদে ভারতীয়দের নাতাল থেকে তাড়াবার কী এমন কারণ ঘটলো? পুঁজির ধর্মই হোলো সস্তায় শ্রমিক খোঁজা। ভারতের উলঙ্গ উপবাসী শ্রমিকের মতো সস্তার শ্রমিক আর মিলবে কোথায়? তাই সাদা পুঁজি একদিন কালো শ্রমিককে পরম আদরে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু পুঁজির আর একটি আত্মঘাতী ধর্ম হোলো, যেখানকার শ্রমিককে সে শোষণ করে, সেখানকার স্থানীয় ধনিক সম্প্রদায়কে সে ক্রমে শক্তিশালী ক'রে তোলে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরমিটিয়া ভারতীয়দের আমদনির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভারতীয় পুঁজিরও আমদানি ঘটলো। কিন্তু সাদা পুঁজির তা সইলো না। তারা ভারতীয় পুঁজিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে বর্ণবিদ্বেষের প্রচার ও ভারতীয় নির্যাতন শুরু করলো। নাতালে গিরমিটিয়াদের ওপর বৎসরে ৩৭৫ টাকা কর ধার্য করবার প্রস্তাবও এই ভারতীয় পুঁজিকে বিতাড়িত করবার অস্ত্র মাত্র ছিল। ভারতীয় গিরমিটিয়াদের আগমনের পশ্চাতে যেমন ভারতীয় পুঁজির আমদানি হয়েছিল, গিরমিটিয়া ভারতীয়দের পলায়নের পশ্চাতে তার প্রস্থানও ঘটবে, সাদা পুঁজির এই ছিল বিচক্ষণ মতলব। গিরমিটিয়াদের উপর রোষটা যে আসলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদেরই ওপর, গান্ধীজীও তা বুঝতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন: "যখন তারা (সাদা পুঁজির মালিকরা) ভারতীয় মজুরদের আদর ক'রে নিয়েছিল, তখন ভারতীয়দের ব্যবসায়-বুদ্ধির শক্তি সম্পর্কে তাদের খেয়াল ছিল না। গিরমিটিয়ারা কৃষক হিসাবে

স্বাধীনভাবে যদি থাকে, তাতে এখন-ও তাদের ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয়েরা তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবেশ করবে এ অসহ্য হোলো।"[১] এই কথাগুলির মধ্যে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, গান্ধীজী "ভারতীয়দের ব্যবসায়-বুদ্ধি-শক্তি"কে ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদীর প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। যে-মেদের চাপে রোগীর হৃৎপিণ্ডের কাজ একদিন বন্ধ হয়ে যাবে, সেই অতিরিক্ত মেদকেই তিনি স্বাস্থ্যের লক্ষণ ব'লে ভেবেছেন। বস্তুত, আজকের পুঁজিবাদী ব্যবসায়ের সত্যিকার বীভৎস গলিত রূপ গান্ধীজীব চোখে কখনো ধরা পডে নি। না পডবারই কথা। কারণ, ভারতে বুর্জোয়া সম্প্রদায় যখন সবেমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে চলেছে, তারই শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন এবং সেই একদা-লব্ধ শিক্ষাকে পরবর্তী জীবনে তিনি কখনো ত্যাগ করতে পারেন নি। ভারতের স্থানীয় ধনিক অভ্যুত্থানের যুগের মানুষ গান্ধীজী। তাই দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগমূলক সংগ্রামের এবং ধনিক জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক তিনি। কিন্তু কেবল তাই-ও নয়। ধর্মবিশ্বাসী হওয়ায় তিনি ইতিহাসের

---

[১] এই ধরনের বহু উল্লেখ গান্ধীজী তাঁর 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ' গ্রন্থেও করেছেন :

"ভারতীয়রা ১৮৮১ সালে প্রথম ট্রান্সভালে প্রবেশ করে। শেঠ আবুবেকার প্রিটোরিয়াতে একটি দোকান খোলেন এবং একটা প্রধান রাস্তার উপর এক টুকরা জমি কিনেন। তাঁহার পথ ধরিয়া অন্য বেপারীরাও যায়। তাহাদের অতিশয় কৃতকার্যতা দেখিয়া ইউরোপীয বেপারীদের ঈর্ষা হয় এবং তাঁহারা সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন ও পার্লামেন্টে দরখাস্ত দেন যে, ভারতীযদিগকে যেন বহিষ্কার করা হয় এবং তাহাদের ব্যবসা যেন বন্ধ কবিয়া দেওয়া হয।" "সকলেই ইহা মনে করিতেন যে, স্বাধীন বেপারীরাই ইউরোপীয় আক্রমণের লক্ষ্যস্থল।"

"নাতালে কেবল চুক্তিবদ্ধ মজুর রাখিয়া অন্য সকল ভারতীয়কে তাড়াইয়া দেওয়ার কল্পনা চলিতেছিল, আর সেইজন্য স্বাযত্ত শাসনাধিকারও লওয়া হইযাছিল।" (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অনুবাদ থেকে)

কেবল এই ধরনের কয়েকটি উদধৃত বাক্য নয়, সমগ্র 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ' বইটি পড়লে বোঝা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষটা সাদা ও কালো পুঁজির লড়াই মাত্র ছিল। কিন্তু গান্ধীজী পডন্ত সামন্ত-তান্ত্রিক ও বাড়ন্ত বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ায মানুষ হওয়ায় ধনিকের লড়াইকে নিঃসন্দেহে জনসাধারণের লড়াই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—আর এ জন্যে তাঁকে অপরাধী করা যায় না।

পূর্বে আমি লেনিনের সঙ্গে গান্ধীজির তুলনা করেছি। সেজন্যে কেউ যেন না ভাবেন যে, গান্ধীজী লেনিন হন নি ব'লে আমি তাঁর ওপর দোষারোপ করছি। রাশিয়ার যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে লেনিন জন্মেছিলেন বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, গান্ধীজী যখন জন্মেন বা দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনকার ভারতের অবস্থার সঙ্গে তার ছিল অনেক প্রভেদ। রাশিয়া ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষক এবং ভারত ছিল শোষিত সাম্রাজ্য। তাই আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে গান্ধীজীর যেমন তুলনা চলে, তেমনটি আর কারো সঙ্গে চলে না। দু-জনেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগী সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। জেনারেল চার্লস্ লী বা টমাস জেফার্সনের মতো জনসাধারণের মুখপাত্রের চাপে প'ড়ে জর্জ ওয়াশিংটন যে বুর্জোয়া বিপ্লবকে পূর্ণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, গান্ধীজী তাকে অপূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, এই যা পার্থক্য।

পরিবর্তনের অপেক্ষা তার সনাতনত্বে গভীরতর বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে, ভারতের নবোদ্ভূত ধনিক সম্প্রদায়কে তিনি ইতিহাসের গতিশীল অবয়বের মধ্যে দেখেন নি, দেখেছেন তাকে প্রাচীন সনাতন কিছু একটা বস্তুরূপে, যদি-ও সম্পূর্ণরূপে তাকে তিনি গ্রহণও করেন নি। গান্ধীজীর ধারণা, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় আদি ও অকৃত্রিম, সনাতন ও শাশ্বত। কারণ, ভগবদ্‌গীতায় ভগবানও তাঁর 'শ্রীমুখে' বৈশ্যবর্ণের সৃষ্টির কথা ব'লে গেছেন। গান্ধীজী ইতিহাসকে তার গতিশীল পরিবর্তনশীল ধর্মের মধ্য দিয়ে না দেখার ফলে গীতায় উল্লিখিত বৈশ্য সমাজ এবং আজকের বৈশ্য সমাজকে অভিন্ন ক'রে দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে, গীতাও যেমন একটি বিশেষ সমাজের বস্তু, সেই গীতার উদ্গাতা ভগবানও তেমনি একটি বিশেষ সমাজের বস্তু এবং সেই গীতায় উল্লিখিত বৈশ্য সমাজও কেবল সেই বিশেষ সমাজেই প্রযোজ্য বা প্রশংসনীয়। গীতার সমাজে মানুষ এমন একটি অবস্থায় এসেছে, যেখানে বংশগতভাবে শ্রমবিভাগ কার্যকরী হয়েছে এবং বিনিময়-প্রথার পরিবর্তে বিক্রয়-প্রথার প্রবর্তন ঘটেছে। আর এই সমাজ-ব্যবস্থাটি ভারতে বহু শতাব্দী কাল ধ'রে অনড় হয়ে ছিল। তাই ভারতের বদ্ধ সমাজে গীতার বাণী শুদ্ধ ও সনাতন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে তা অন্তর্ধান করছে। সুতরাং গীতার সমাজে যা ছিল প্রচার্য, আজ তা অপপ্রচার্য হয়ে উঠেছে। একদা সমাজে যা ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজনে একান্ত অপরিহার্য বস্তু—অগ্নি, আজ বিংশ শতাব্দীতে তা অগ্নিকাণ্ড হয়ে উঠেছে। বস্তুত ধর্মশাস্ত্রে অগ্নি-পূজার বিহিত বিধি আছে, তাই ব'লে কেউ যদি অগ্নিকাণ্ডের পূজা করতে বসেন, তবে তাঁর দোহাই। আজকের সমাজের ব্যবসায়কে তার যথাযথ ঐতিহাসিক পরিণতির মধ্যে না দেখবার ফলেই গান্ধীজীর সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টা এমন ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর সত্য, অহিংসা, শোষণহীন সমাজ—সমস্তই রঙিন আতশবাজির মতো শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

তাই গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্যে যখন সংগ্রাম শুরু করলেন, তখন শ্রমিকদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সত্ত্বেও ধনিকদের সাহায্যেই তাঁকে যুদ্ধে নামতে হোলো। তাই তিনি তাঁর সংগ্রামে চমকপ্রদ কলাকৌশল বহু দেখালেন সত্য, কিন্তু সংগ্রামটা ব্যাধির বিরুদ্ধে না হয়ে উপসর্গের বিরুদ্ধেই হ'তে লাগলো। নাতাল সরকারের এই কর-ধার্যের প্রস্তাব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে চিন্তিত করেছিল, আসল তাৎপর্য বুঝতে তাদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি। আঘাতটা আপাত-দৃষ্টিতে শ্রমিকদের উপরে আসায় তাদের সুবিধাই হোলো। গণতান্ত্রিক দাবির নামেই তাদের পুঁজির লড়াই তারা শুরু করলো। সংগ্রামের ফল হিসাবে কর পঁচিশ পাউণ্ড থেকে প্রথমে

তিন পাউণ্ডে এসে নামলো। পরে এই কর সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়ার জন্তে অবশ্য আরো বিশ বৎসর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। গান্ধীজীর এই বিশ বৎসরের সংগ্রামকে আমার কাছে কেবলই বিরাট শক্তির এক অপূরণীয় অপব্যয় ব'লে মনে হয়েছে। গান্ধীজী যদি সমাজকে তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত শক্তি-নিয়োগ করতেন এবং বৃটিশ পুঁজিবাদ, (যার পরিণতি বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদে) নবজাগ্রত ভারতীয় পুঁজিবাদ (হিন্দু ও মুসলিম উভয় শিবির), পরাভূত হ'তো, তবে একটি আঘাতেই ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বহু দেশ স্বাধীন হ'তো, পৃথিবীতে বহু অংশ থেকে বর্ণ-বিদ্বেষ লোপ পেতো, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হ'তো মৈত্রী। কিন্তু গান্ধীজী সে পথে অগ্রসর হন নি। পরবর্তীকালেও এই সুযোগ তিনি বার বার পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণের প্রতি অবিশ্বাস ও অতিরিক্ত ধর্মবিশ্বাসের ফলে তাকে গ্রহণ করেন নি। লক্ষ্যস্থানের চেয়ে পথের মোহই তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তাই তীর্থে তিনি কোনদিন পৌঁছতে পারলেন না, তীর্থের পথকেই তিনি তীর্থ ব'লে গ্রহণ ক'রে সমস্ত জীবন পথেই কাটালেন! তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে, হয়তো তখনো ভারতীয় পুঁজি পুষ্ট না হওয়ায় পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে দেশেও তাঁর নেতৃত্ব পরিণত হয় নি। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, সেদিন বিষবৃক্ষের মূল গান্ধীজী কোনো রকমেই দেখতে পান নি। তাই বৃক্ষের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, অজস্র বিষফলের বিরুদ্ধে তিনি সমগ্র জীবন তাঁর আক্রমণ চালিয়েছিলেন, এক শাখায় ব'সে অন্য শাখা কাটতে গিয়েছিলেন,—ভারতীয় পুঁজির উপর নির্ভর ক'রে বৃটিশ পুঁজির পরিণতিকে করতে গিয়েছিলেন ধ্বংস, হিন্দু পুঁজির ঘাড়ে চ'ড়ে শান্ত করতে চেয়েছিলেন মুসলিম পুঁজিকে। তাই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, ক্লান্ত হয়েছিলেন, দিশেহারা হয়েছিলেন। বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, বিষফল কেবলই অজস্র-অসংখ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি অবশেষে আর্তনাদ ক'রে বলেছিলেন, এই বিভ্রান্তিকর পৃথিবী থেকে কবে তাঁর অবকাশ মিলবে। (মৃত্যুর দিন অপরাহ্ণে গান্ধীজী তাঁর স্নেহভাজনদের কাছে এইরূপ উক্তি করেছিলেন বলেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।) তাই গান্ধীজীর জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বড়ো খেদ হয়, একটি প্রচণ্ড শক্তির কী ভয়াবহ অপব্যয়ই না ঘটেছিল—যে-বারুদের স্তূপে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক মহা বিপ্লব রচিত হ'তে পারতো, কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের হ'তে পারতো অবসান, সেই বিরাট বারুদের স্তূপ মুষ্টিমেয় ভারতীয় পুঁজিবাদীদের মুনাফা-মৃগয়ায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে! পুঁজিবাদের ইতিহাসে এমন অপব্যয় কী আর ঘটেছে!

॥ পাঁচ ॥

বস্তুত, গান্ধীজী ধর্মনীতিকে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়োগ-প্রয়াসই তাঁর জীবনেতিহাস। গান্ধীজী ধর্মকে সকল দেশে ও সকল কালে অভিন্ন ও সনাতন ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন এবং সেই 'অভিন্ন ও শাশ্বত' বস্তুটিকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন অর্থনীতি ও রাজনীতির মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি বস্তুর মধ্যে।[১] কিন্তু কোনো ধর্ম বস্তুত শাশ্বত বা অভিন্ন

---

১ ধর্মকে অভিন্ন ও শাশ্বত ব'লে গ্রহণ করবার জন্যে গান্ধীজী যে রীতি আশ্রয় করেছিলেন, তা অন্যান্য সকল চয়নপন্থী বা eclecticদের মতোই সুবিধাবাদী। তিনি সকল ধর্ম থেকেই নিজের ইচ্ছামতো পছন্দমতো "নীতিকে" গ্রহণ করেছিলেন। বাইবেলে খ্রীষ্টের 'সারমন অন দি মাউণ্ট' যখন তাঁর অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, এবং ক্ষমা, তিতিক্ষা ও ত্যাগের বাণীকে যখন তিনি সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, তখনই বাইবেলের নোআ বা মোজেস-এর 'চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত লওয়ার' বাণীকে তিনি মিথ্যা ব'লে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। বাইবেলের করুণাময় ভগবান তাঁর কাছে সত্য, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ ভগবান জিহোবা তাঁর কাছে অলীক কল্পনা মাত্র। গান্ধীজী যখন খ্রীষ্টের বাণী অনুসারে সকল মানুষকে ভগবানের আত্মজ হিসাবে সমান ব'লে প্রচার করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই যখন তিনি দেখলেন ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট পল ক্রুগার বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাকেই ভারতীয় নির্যাতনের ন্যায়সংগত প্রেরণা ব'লে ভারতীয়দের বোঝাচ্ছেন, তখন তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন এবং ক্রুগারের ওল্ড টেস্টামেণ্টকে অলীক এবং তাঁর নিজের নিউ টেস্টামেণ্টকে অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন।

"তিনি (প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার) খানিকক্ষণ তাহাদের (ভারতীয়দের) কথা শুনিয়া বলেন—'তোমরা হইতেছ ইসমেলের সন্তান, সেইজন্য তোমরা ইসাউয়ের সন্তানগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য। আমরা ইসাউয়ের সন্তান, আমরা তোমাদিগকে আমাদের সমান অধিকার দিতে পারি না। আমরা যেটুকু দিই, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিও।' প্রেসিডেণ্টের এই জবাব যে ক্রোধ বা দ্বেষ-প্রণোদিত, একথা বলা যায় না। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার বাল্যকাল হইতেই পুরাতন বিধানের (Old Testament-এর) গল্প শুনিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহা সত্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।"—দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ৫৩পৃঃ।

গান্ধীজী যদি নিউ টেস্টামেণ্টের বাণীকে সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করেন, তবে ওল্ড টেস্টামেণ্টের বাণীকে সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করবার অযৌক্তিকতার যুক্তি কোথায়? আসলে গান্ধীজী এবং মিঃ ক্রুগার উভয়েরই এক ত্রুটি। তাঁরা ধর্মকে বা তার বাণীকে সাময়িক ও পরিবর্তনশীল না ভেবে তাকে সনাতন ও চিরস্থায়ী ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও গান্ধীজীর ত্রুটি অনুরূপ। গীতার কথাই ধরা যাক্। গান্ধীজী যখন গীতার নিষ্কাম কর্ম ও চাতুর্বর্ণ্যের বিষয়গুলিকে উচ্ছ্বসিত সমর্থনের সঙ্গে গ্রহণ করছেন, তখনই তিনি সুবিধামতো "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" কথাগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। দুষ্কৃতের বিনাশ সম্পর্কে গান্ধী যতোই অহিংস ব্যাখ্যা দেন না কেন, তা যে ব্যাখ্যার বিকৃতি মাত্র, তা বুঝতে দেরি হয় না। তা ছাড়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিংসাত্মক যুদ্ধই ছিল।

হ'তে পারে না। স্থান ও কালের পার্থক্যে তার রীতি ও নীতির পরিবর্তন ও বৈষম্য ঘটবেই। লিখিত শব্দের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মনুষ্য-সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সমাজের ভিন্নতর অর্থনৈতিক অবয়বের মধ্যে ধর্মীয় নীতি ও রীতির পার্থক্য ঘটেছে।[১] কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মতো ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, ও শিল্পের পরিবর্তন অতো দ্রুত ঘটে না। ফলে, অর্থনীতির অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে সমাজের ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা শিল্প চলতে পারে না। তখন ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প, এরা একযোগে বলতে থাকে, আমরা সনাতন, আমরা অভিন্ন, আমরা সকল কালে সকল দেশে এক, আমরা নড়বো না। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা বলে, অসম্ভব, আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে তোমাদের চলতেই হবে, কারণ, আমি পরিবর্তনশীল, প্রগতিশীল, আমি ভিন্ন, আমি বহুরূপী। এমনিভাবে প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক কালেই দেখা গেছে, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে সেই যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থার বিরোধ ঘটেছে, এবং প্রতিবারেই উৎপাদন-ব্যবস্থা হয়েছে জয়ী। আর এই জয়ের নামই ধর্মে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে ও শিল্পে বিপ্লব। দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা যে পথে চলবে, সে-দেশের ধর্মকে, সংস্কৃতিকে, সাহিত্যকে, শিল্পকে সে-পথেই চলতে হবে। এই টানাটানির ব্যাপারটিকে আমরা যদি গো-শকটের সঙ্গে তুলনা করি, তবে বলতে পারবো, সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা হোলো গোরু, আর সেই সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা শিল্প, এগুলো হোলো মাল-বোঝাই শকট। চলন্ত গো-শকটে আমরা গোরু আর শকটকে সর্বদাই

---

১ এখানে উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টান ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। একই খ্রীষ্টান ধর্ম সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার তারতম্যের মধ্য দিযে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রম বিক্রয়ের স্বাধীনতাকে চালু করবার চেষ্টা হয়েছে, তখনই ব্যক্তিগত ধর্ম-চর্চার হয়েছে উদ্ভব, লুথার‍্যানিজম্ বা ক্যাল্‌ভিনিজম্-এর হয়েছে জন্ম। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে চতুর্দশ শতাব্দীতে জন উইক্লিফের যুগ থেকে যে ননকন্‌ফর্মিটির সূত্রপাত হয়েছিল, তা প্রেস্‌বিটেরিয়ানিজম্, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্‌স্, কোয়েকার, ললার্ডি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এক বর্ধমান বুর্জোয়া অর্থনীতিকেই প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, বুর্জোয়া অভ্যুত্থান যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রচার করলেও সত্যিকার ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেনি, প্রোটেস্ট্যাণ্টিজ্‌ম্-ও তেমনি ধর্ম-স্বাধীনতার প্রচার ক'রেও সত্যিকার ধর্ম-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করে নি। প্রোটেস্ট্যাণ্টিজ্‌ম্‌ও ক্যাথলিসিজমের চেয়ে কম গোঁড়া বা কম আনুষ্ঠানিক নয়। বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের ফলে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। ধর্মে তার প্রতিফলনরূপে ইউরোপে আমরা রোমান ক্যাথলিক চার্চের স্থলে জাতীয় প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও জাতীয় ক্যাথলিক চার্চের জন্ম হ'তে দেখেছি। ভারতের নবোদ্ভূত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয়তা কিভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম, আর্য সমাজ প্রভৃতির মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল, তা লক্ষণীয়।

এক সঙ্গে একযোগে চলতে দেখি এবং গোরুর চেয়ে বোঝাই-করা শকটটাকেই লাগে অনেক বেশি বড়ো। গোরুর মুখ দিয়ে যখন ফেনা উঠতে থাকে, যখন সে ক্রমেই ক্লান্তিতে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়, তখন গাড়ির বোঝা মাথা উঁচিয়ে আকাশ স্পর্শ করে। এই দেখে কোনো পথিক দার্শনিক যদি ভাবেন, যেহেতু মাল-বোঝাই গাড়িটা বিরাট, এবং যেহেতু তা আকাশ স্পর্শ করেছে, আর গোরু দুটো ক্রমেই ক্ষীণ দেহে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে, সেই-হেতু চলন্ত গো-শকটের শক্তির আধার হ'লো ভেঙে-পড়া গোরু নয়, বোঝা-ভরা আকাশস্পর্শী গাড়িটা, তখন তিনি যে ভুল করবেন, যাঁরা উৎপাদন-শক্তির উর্ধ্বে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা শিল্পকে স্থান দেন, তাঁরা-ও করেন ঠিক তেমনটি। গান্ধীজী এই ভুলই করেছিলেন। তিনি গাড়ির বোঝাটাকে কেবলই আকাশস্পর্শী ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং গাড়ি যে টানে তাকে ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন ক্ষীণতর। কেবল তাই নয়, তিনি গাড়িকে শক্তির উৎস ভেবে গাড়িকেই গোরুর সামনে বেঁধে দিয়েছিলেন। ফলে আমাদের সমাজটা 'গাড়িতে টানা গোরুর' মতো একটা কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। গান্ধীজী যদি ধর্মের মধ্যে সামাজিক শক্তির সন্ধান না ক'রে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে করতেন, তবে তাঁর ধর্মের বোঝা যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছতো; কিন্তু তিনি তার উল্টোটি করায়, তাঁর ধর্মের বোঝা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছয় নি, উৎপাদন-ব্যবস্থার গোরুগুলো বেসামাল হয়ে যে-দিকে-ইচ্ছে পালাতে চেয়েছে। আর সেই টানাটানির ফলে আকাশস্পর্শী ধর্মের বোঝা পড়েছে ধ্বসে এবং সেই ধ্বসে-পড়া বোঝার চাপে শকট-চালকেরও ঘটেছে মৃত্যু!

তাই এ-কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবার ফলে তাঁর ধর্মালোচনা বা ধর্মানুশীলনে বিন্দু মাত্র ছেদ পড়লো না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনারির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঘটলো। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ব্যাপকতর হোলো। তাঁদের কারো কারো স্বধর্ম সম্পর্কে সংকীর্ণতা-ও তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে পড়াশুনো করলেন। বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে তিনি লক্ষ্য করলেন, খ্রীষ্টের প্রেমের অপেক্ষা বুদ্ধের প্রেমের প্রসার ছিল বিপুলতর। কারণ, প্রাণীমাত্রের প্রতি প্রেম যিশুর জীবনে দেখা যায় নি। তা দেখা গিয়েছিল বুদ্ধের জীবনে। অবশ্য, এই দেখার মধ্যেও একদেশদর্শিতা ছিল। যিশুর সেঁকা মাছ খাওয়ার কথা বাইবেলে আছে সত্য, কিন্তু বুদ্ধদেবও যে নিরামিষাশী ছিলেন, তেমন প্রমাণ নেই। বরং তার উল্টোটাই আছে, অতিমাত্রায় শূকর-মাংস খাওয়ার ফলেই রক্তাতিসারে যে বুদ্ধের

মৃত্যু হয়েছিল, তা বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। যাই হোক, বুদ্ধের এই "সর্বজীবে করুণার ধর্মকে" গান্ধীজী নিজের জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ছিলেন নিরামিষাশী, সর্পের প্রতিও ছিলেন স্নেহপরায়ণ।

রায়চাঁদজী এই সময়ে ধর্ম বিষয়ে গান্ধীজীকে পত্রযোগে পরামর্শ দিতেন। তিনি গান্ধীজীর পড়ার জন্যে নর্মদাশংকরের লেখা 'ধর্ম-বিচার' পুস্তকখানিও পাঠান। নর্মদাশংকর প্রথম জীবনে অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং তিনি শুদ্ধাচারী হয়ে ওঠেন। এই গ্রন্থখানি গান্ধীজীর জীবনে কিভাবে রেখাপাত করেছিল, তা তাঁর বিলাস-বিভবহীন কৃচ্ছ্র-সাধক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়। এই সময় গান্ধীজী উপনিষদের অনুবাদগুলিও পড়েন। ম্যাক্‌স্‌মুলার-রচিত 'হিন্দুস্থান কি শিখাইতে পারে' গ্রন্থখানি তাঁর স্বদেশপ্রীতিকে পুষ্ট করে এবং অনেক পরিমাণে তাঁর পাশ্চাত্য সভ্যতাবিরোধী ভ্রান্ত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের জন্যে দায়ী হয়। গান্ধীজী ঐ সময়ে কেবল যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনো করেন, তাই নয়। তিনি ওঅশিংটন আর্ভিং এবং কারলাইল, উভয়ের রচিত মহম্মদের জীবন ও বাণী-ও পাঠ করেন। জরথুস্ত্রর প্রবচনও তাঁর বাদ যায় না। লেও টলস্টয়ের লেখা 'গস্‌পেল ইন ব্রীফ' ও 'হোঅট টু ডু' বইগুলিও তাঁর ধর্মচিন্তাকে প্রভাবিত করে। এমনি ভাবে গান্ধীজী বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সকল ধর্মের প্রতি একটি সহজ প্রীতির অধিকারী হন এবং ধর্মকেই মানব জীবনের প্রথম ও শেষ আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন; তাঁর কাছে ধর্মের সঙ্গে অর্থনীতি ও রাজনীতির কোনো পার্থক্য থাকে না। তিনি ধর্ম দিয়েই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হন।

এইভাবে ধর্মনীতি ও রাজনীতির প্রাথমিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর তিন বৎসর কেটে গেলো। আদালতে ব্যারিস্টারি যেমন জমে উঠতে লাগলো, তেমনি ক্রমেই তাঁর সম্মুখে জমে উঠতে লাগলো নানা অন্যায় ও অবিচারের সমস্যা। তাই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন, স্থির করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই স্থায়ীভাবে বাস করাই যখন স্থির হোলো, তখন তিনি ভাবলেন, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে একবার ঘুরে আসা দরকার। তাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কলিকাতাগামী একটি জাহাজে চ'ড়ে বসলেন। জাহাজের দিনগুলি তাঁর প্রধানত ভাষা শিক্ষাতেই কাটলো। তিনি উর্দু ও তামিল ভাষা শিখতে লাগলেন। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

মেলামেশার জন্যে যেমন প্রয়োজন উর্দু ভাষায় জ্ঞান, মাদ্রাজীদের সঙ্গে মেলামেশার জন্যেও আবার তেমনি প্রয়োজন তামিল ভাষায় অধিকার।

চব্বিশ দিন বাদে গান্ধীজী কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। এই তাঁর প্রথম কলকাতা আসা। কলকাতা থেকে প্রয়াগের পথে তিনি সটান রাজকোটে চ'লে গেলেন। রাজকোটে এসে তিনি একটি ছোটো বই লেখেন। বইখানি লিখতে ও ছাপতে একমাস সময় লাগে। বইখানির মলাট ছিল সবুজ। তাই বইখানি "সবুজ বই" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। গান্ধীজী বলেন: "এতে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা কম ক'রেই লিখেছিলাম। কেননা আমি জানতাম, ছোট দুঃখও দূর থেকে বড়ো দেখায়।" 'সবুজ বই' দশ হাজার ছাপানো হয়েছিল। সেগুলি ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক ও নেতাদের কাছে পাঠানো হয়।

এই সময় বোম্বাইয়ে হঠাৎ মড়ক দেখা দেয়। রাজকোটেও মড়ক দেখা দেওয়ার আশঙ্কা হোলো। গান্ধীজী সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন সেবাধর্মী। মহামারীতে, যুদ্ধে, দুভিক্ষে, গৃহদ্বন্দ্বে সেবার ব্রতে তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছিল। বোম্বাইয়ে এই মহামারীর সময়ে তিনি সেই সেবার প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন। গান্ধীজীর এই সেবা আবার কয়েকদিনের জন্যে সমাজ থেকে তাঁর নিজের বাড়ির মধ্যেও সরে এলো। তাঁর ভগ্নীপতি পীড়িত হলেন। ফলে গান্ধীজী ভগ্নীপতির সেবায় লেগে গেলেন। তিনি পরে নিজের এই সেবা-প্রীতি সম্পর্কে বলেন: "আমার শুশ্রূষা করবার এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বিশাল আকার ধারণ করলো। অবশেষে তা এমন হয়ে উঠলো যে, শুশ্রূষার জন্যে অনেক সময় আমি কাজকেও উপেক্ষা করেছি, স্ত্রীকে, এমন কি সমস্ত পরিবারকেও, সেবায় নিযুক্ত করেছি।"

কয়েকদিনের মধ্যেই গান্ধীজীর ভগ্নীপতির মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সম্পর্কে দেশে প্রচার-কার্য চালাবার জন্যে বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্যার ফিরোজশা মেটার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এই সাক্ষাতের ফলে বোম্বাইয়ে যে জনসভার আয়োজন হয়েছিল, তার পূর্ব দিনেই গান্ধীজীর ভগ্নীপতির মৃত্যু হোলো। কিন্তু ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কোনো দুঃখ-শোক গান্ধীজীর জনসেবায় কোনোদিন অন্তরায় হ'তে পারে নি, সেদিনও হ'তে পারলো না। যথাসময়ে তিনি বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছলেন। পূর্বে প্রস্তুত না হয়েই তিনি সভায় বক্তৃতা করবেন স্থির করেছিলেন। স্যার ফিরোজশা কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে নিরস্ত করলেন, বললেন, এ বোম্বাই শহর, এখানে লিখিত বক্তৃতা দেওয়াই

উচিত। নইলে কাগজে অসম্ভব রকমের ভুল রিপোর্ট বেরিয়ে যাবে। গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতাটি রাতারাতি লিখে ফেললেন। তখনকার দিনে স্যার ফিরোজশার বক্তৃতা শোনার জন্যে ভিড় ক'রে লোক আসতো। এতো বড়ো বিরাট সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতা গান্ধীজীর এই প্রথম। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, শরীর কাঁপতে লাগলো। বক্তৃতাটি লিখিত থাকায় অন্য একজনে প'ড়ে শোনালেন। বক্তৃতাটি অজস্র করতালি ও প্রশংসা পেলো।

গান্ধীজীকে স্যার ফিরোজশা দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করলেন। লোকমান্য তিলক এবং গোখলের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হোলো। এই পরিচয় সম্পর্কে পরে তিনি একটি সুন্দর তুলনামূলক বর্ণনা দিয়েছিলেন: "স্যার ফিরোজশাকে আমার হিমালয়ের মতো মনে হয়েছিল, লোকমান্যকে সমুদ্রের মতো। আর গোখলেকে দেখলাম গঙ্গার মতো। তাতে অবগাহন করা যায়। হিমালয়ে চড়া যায় না, সমুদ্রে ডুবে মরবার ভয় আছে। কিন্তু গঙ্গার কোলে খেলা করা যায়, ডিঙি নিয়ে পার হওয়া যায়।" গোখলে সম্পর্কে গান্ধীজী আরো বলেন: "রাজনীতির ক্ষেত্রে গোখলে জীবিতকালে আমার হৃদয়ে যে-স্থান অধিকার করেছিলেন এবং দেহান্তরের পরে আজো যে-স্থান অধিকার ক'রে আছেন, তা আর কেউ পাননি।" পরে যথাসময়ে আমরা লক্ষ্য করবো, গোখলে এবং তিলক, ভারতীয় রাজনীতির এই দুই বিভিন্ন-ধর্মী শক্তির সমন্বয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের গঠন কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিল।

অতঃপর গান্ধীজী পুণা থেকে গেলেন মাদ্রাজ। সেখানে তাঁর 'সবুজ বই' আরো দশ হাজার ছাপা হোলো। তিনি সেখানে 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদক পরমেশ্বর পিল্লাই এবং 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে দেখা করলেন। এঁরা দুজনেই তাঁকে প্রচুর সমর্থন ও উৎসাহ জানালেন।

মাদ্রাজ থেকে গান্ধীজী এলেন ফের কলকাতা। এখানে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হোলো। কলকাতায় ঐ সময় গান্ধীজী অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও দেখা করতে আসেন। ঐ ঘটনা সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন: "যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তিনি আমাকে কোনো ভবঘুরে'ব'লেই ধ'রে নিলেন।" 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাতে গিয়েও গান্ধীজীর নাকালের একশেষ হোলো। "সম্পাদক মশায় অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ করছেন, তাঁর কাছে বহু লোক যাতায়াত করছে। তিনি আমার পানে ফিরেও তাকান না।"

বাংলা দেশের 'প্রগতিশীল' পত্রিকাগুলির এই ব্যবহারে গান্ধীজী কিন্তু হতাশ হলেন না। কলকাতায় জনসভারও আয়োজন হ'তে থাকলো। কিন্তু সে-সভা হওয়ার আগেই গান্ধীজীর কাছে ডারবান থেকে ডাক এলো: "পার্লামেণ্ট জান্থয়ারিতে বসবে। অবিলম্বে ফিরে আস্থন।"

প্রথম যে ষ্টীমার বোম্বাই থেকে পাওয়া যাবে, তাতেই যাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্যে গান্ধীজী দাদা আবদুল্লার বোম্বাই-এজেণ্টকে তার করলেন। দাদা আবদুল্লা নিজে 'কুরল্যাণ্ড' নামে একখানা ষ্টীমার কিনেছিলেন। সেই ষ্টীমারে তাঁরা গান্ধীজীকে সপরিবারে বিনা খরচে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে স্ত্রী, দুই পুত্র এবং তাঁর বিধবা ভগ্নীর পুত্রকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন। সঙ্গে আরেকখানি ষ্টীমারও ছিল। ষ্টীমারটির নাম 'নাদেরী'। ওই ষ্টীমারেরও এজেণ্ট ছিলেন দাদা আবদুল্লা। দুই ষ্টীমারে মিলে ভারতীয় যাত্রী ছিলেন প্রায় আট শ। তাঁদের অর্ধেকের বেশী যাচ্ছিলেন ট্রান্সভালে। ১৮ই কি ১৯শে ডিসেম্বর দুটি জাহাজই ডারবান বন্দরে এসে পৌঁছলো। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ পরীক্ষা ক'রে হুকুম না দিলে জাহাজ তীরে ভিড়ানো যায় না, আইনের বাধা আছে। তাই জাহাজ দুটিকে নোঙর ক'রে অপেক্ষা করতে হোলো। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়বার সময় বোম্বাইয়ে প্লেগের মড়ক চলছিল। স্থতরাং জাহাজ দুটিকে কয়েক দিনের জন্যে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে রাখা হবে, এমনি ভয়ও করা হচ্ছিল। বস্তুত হোলোও তাই। কিন্তু পরে বোঝা গেলো, কেবল ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্য এই ব্যবস্থা হয় নি। আট শত ভারতীয় যাত্রী সহ গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাদা বাসিন্দারা তুমুল আন্দোলন শুরু করেছে। তারা এখনো প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সভাসমিতি করছে, দাদা আবদুল্লাকে ধমক দিচ্ছে। এমন কি, ভারতবর্ষে জাহাজ দুটি ফেরত পাঠাবার জন্যে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লোভও দেখাচ্ছে। এ সমস্ত সংবাদই গান্ধীজীর কাছে পৌঁছতে লাগলো। গোরারা এমন ভয়ও দেখিয়েছে যে, জাহাজে যদি গান্ধী তার দলবলকে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে না যায়, তবে জাহাজ তারা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু গোরাদের এই অন্যায় দাবি ষ্টীমার কোম্পানি বা যাত্রীরা, কেউ মানতে রাজী হোলেন না। গোরাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন গান্ধীজী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুটি: প্রথমত, তিনি ভারতবর্ষে গিয়ে নাতালবাসী গোরাদের ভয়ংকর নিন্দা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ভারতীয়দের দিয়ে নাতাল ছেয়ে ফেলতে চাচ্ছেন, তাই দু জাহাজ বোঝাই ক'রে ভারতবাসী সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। গান্ধীজীর ও যাত্রীদের ওপর চরমপত্র এলো,

তাঁদের হত্যার ভয় দেখানো হোলো, কিন্তু এ ধমকেও গান্ধীজী টললেন না। ষ্টীমারের অন্যান্য যাত্রীরা-ও অটল রইলেন। সকল কিছু ক্ষতির বিনিময়ে নিজেদের ন্যায়সংগত অধিকার বজায় রাখবার জন্যে তাঁরা কৃতসংকল্প হলেন। অবশেষে বত্রিশ দিন বাদে, অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে দুটি ষ্টীমারের উপর থেকেই সংক্রমণ-অবরোধ তুলে নেওয়া হোলো। যাত্রীরা বন্দরে নামবার হুকুম পেলেন।

নাতাল সরকারের মিঃ এস্‌কম্ব জাহাজের কাপ্তেনকে ব'লে পাঠালেন, তিনি যেন গান্ধীজী ও তাঁর পরিবারকে রাত্রির অন্ধকারে নামিয়ে দেন। গান্ধীজীর উপর গোরারা খুব চটে আছে, তাই তাঁর জীবন সম্পর্কেও বিপদ দেখা দিতে পারে। গান্ধীজীকে সঙ্গে নেওয়ার জন্যে তিনি জল-পুলিশ পাঠাবেন ব'লেও জানালেন।

জাহাজের কাপ্তেন গান্ধীজীকে এই সংবাদ দিলেন। গান্ধীজী তা পালন করতে স্বীকৃত হলেন, কিন্তু এই সংবাদ পাওয়াব আধ ঘণ্টার মধ্যেই এলেন ষ্টীমার-এজেন্টের উকিল মিঃ লটন। তিনি কাপ্তেনকে জানালেন, ষ্টীমার-এজেন্টের উকিল হিসাবে তিনি মিঃ গান্ধীকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে যেতে চান। কাপ্তেন রাজী হয়ে গেলেন। অতঃপর মিঃ লটন এলেন গান্ধীজীর কাছে। তিনি গান্ধীজীকে জানালেন, মিঃ এস্‌কম্ব যে তাঁকে একাকী রাত্রিতে জাহাজ থেকে যেতে বলেছেন, তার মধ্যে যে কোনো রকম দুরভিসন্ধি নেই, তা কে বলতে পারে? এই মিঃ এস্‌কম্বই তো এখানে গোরাদের এক সময় ক্ষেপিয়েছেন, এখন তাঁর হঠাৎ এতো দরদ কেন? তা ছাড়া, লটন আরো বললেন, আপনি যে লুকিয়ে চোরের মতো শহরে প্রবেশ করবেন, তাও অত্যন্ত অশোভন। তার চেয়ে আপনার যদি প্রাণের ভয় না থাকে, তবে চলুন, মিসেস্ গান্ধী ও ছেলেমেয়েদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা দুজনে তাঁদের পেছু পেছু পায়ে হেঁটেই যাই। আমার মনে হয়, কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতেও সাহস পাবে না।"

মিঃ লটনের কথাগুলি গান্ধীজীর খুবই মনঃপূত হোলো। তাঁর কথা মতোই তিনি জাহাজ থেকে নামলেন।

রস্তমজী শেঠের বাড়িতে গান্ধী-পরিবারের ওঠার কথা ছিল। ষ্টীমারঘাট থেকে তা দু মাইল পথ হবে। গান্ধীজীর দুই পুত্র সহ মিসেস্ গান্ধী গাড়িতে ক'রে আগে রওনা হয়ে গেলেন। গান্ধীজী জাহাজ থেকে নামলে কয়েকজন গোরা ছোকরা তাঁকে দেখতে পেয়ে 'গান্ধী' 'গান্ধী' ব'লে চেঁচাতে লাগলো। চীৎকার ক্রমেই বেড়ে চললো। সেই সঙ্গে জমতে লাগলো ভিড়। গান্ধীজী ও মিঃ লটন এগিয়ে চললেন। তাঁদের পেছনে জনতার লেজুড়টা খুব বিড়ালের লেজের মতো ক্রমেই স্ফীত ও দীর্ঘ

হয়ে উঠলো। মিঃ লটন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মুহূর্তমধ্যেই জনতার মধ্য থেকে বৃষ্টি হ'তে লাগলো ঢিল আর পচা ডিম। একজন গান্ধীজীর মাথার পাগড়ি টেনে ফেলে দিলো। মিঃ লটন ক্ষিপ্ত জনতাকে রুখতে পারলেন না। দেখতে দেখতে গান্ধীজীর উপর শুরু হোলো প্রহার। চড়, কিল, ঘুষি, লাথি। গান্ধীজীর মাথা ঘুরে গেলো, তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

এই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশের প্রধান কর্তা মিঃ আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আগেই গান্ধীজীর পরিচয় ছিল। তিনি ভিড় ঠেলে ভেতরে এসে নিজের ছাতার আড়ালে গান্ধীজীকে রক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে একজন ভারতীয় যুবক থানায় খবর দিয়েছিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার গান্ধীজীকে বাঁচাবার জন্যে অবিলম্বে একদল পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশের তত্ত্বাবধানে গান্ধীজী পার্শী রুস্তমজীর বাড়িতে কোনো রকমে এসে পৌঁছলেন।

কিন্তু গোরারা নিরস্ত হোলো না। তারা রুস্তমজীর বাড়ির সম্মুখেও আবার উন্মত্ত তাণ্ডব জুড়ে দিলো। চীৎকার করতে লাগলো—'গান্ধীকে আমাদের হাতে দাও।' 'গান্ধীকে আমাদের চাই।' ইত্যাদি।

ঐ সময় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার সেখানে পৌঁছে তাদের কাউকে ধমক দিলেন, কাউকে বা মিষ্টি কথায় বোঝালেন। কিন্তু জনতা ক্রমেই এমন ভয়ংকর হয়ে উঠলো যে, তিনিও অবশেষে বিপদ গনলেন, বাড়ির ভেতরে গান্ধীজীর কাছে সংবাদ পাঠালেন, গান্ধীজী যদি তাঁর বন্ধুর বাড়ি এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে চান, তবে তিনি যেন অবিলম্বে গোপনে এখান থেকে পালিয়ে যান। এই অবস্থায় গোপনে কেমন ক'রে পালানো সম্ভব, সে-পরামর্শও দিলেন মিঃ আলেকজাণ্ডার স্বয়ং।

গান্ধীজী ভারতীয় সেপাইয়ের পোশাক পরলেন। মাথায় ডাণ্ডা মারলে যাতে মাথা না ফাটে, সেজন্যে মাথায় একটা রেকাবি বসিয়ে তার ওপর মাদ্রাজী বড়ো একটা ফেটা জড়ালেন। গান্ধীজীর সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের দুজন লোক ছিল, তারাও ছদ্মবেশ পরলো। তারপর গান্ধীজী জনতার ভেতর দিয়েই বাড়ির বার হয়ে গেলেন। ফলে সেদিনকার জনতার উন্মত্ত ভাবটা ছেঁদা বেলুনের মতো চুপসে গেল। এইভাবে সেদিন গান্ধীজী তাঁর বন্ধুর বাড়ি ও নিজের স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করলেন।

এই ঘটনাটি কিন্তু গান্ধীজীর জীবনের অন্তর্গত ব'লে মনে হয় না। এ যেন চাণক্য বা মেকিয়াভেলির জীবনের কোনো ঘটনা, যাদের নীতি ও রীতি 'শঠে

শাঠ্যম্।' এই প্রতারণা যতোই প্রয়োজনীয় হোক, এ যে প্রতারণা মাত্র, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গান্ধীজীর সত্যের নীতি তখনো তাঁর মধ্যে সুদৃঢ় পরিণতি লাভ করে নি, যে পরিণতি একদিন তাঁকে মৃত্যুর সম্মুখেও বুক পেতে দিতে দুঃসাহসী করেছিল!

ঐ সময় মিঃ চেম্বারলেন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সচিব। গান্ধীজীর নির্যাতনের কথা তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছল। তাঁর নির্দেশে মিঃ এস্‌কম্ব গান্ধীজীকে জানালেন, তিনি যদি আক্রমণকারীদের মধ্যে কাউকে চিনে থাকেন, তবে যেন নালিশ করেন।

গান্ধীজী কিন্তু মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "যাঁরা আক্রমণ করেছিল, তাদের চেয়ে দোষ আপনাদের বেশী। কেননা আপনারা তাদের ঠিক পথে চালিত করতে পারেন নি। আমি ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের তীব্র নিন্দা করেছি ব'লে রয়টার যে খবর দিয়েছিল, আপনারা তাই বিশ্বাস করেছেন এবং সেই বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সত্য সংবাদ প্রকাশিত হ'লে আক্রমণকারীদের অনুশোচনা হবে। আমি তাদের দু-একজনকে চিনি। কিন্তু চিনলেও অভিযুক্ত করতে চাই না।"

এই ঘটনা থেকে গান্ধীজীর যে-অভিজ্ঞতা হয়, তা তাঁর দুটি মতামতকে অনেক পরিমাণে পুষ্ট করেছে।

এই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত সদাশয়তা ব্যক্তির প্রতি গান্ধীজীর বিশ্বাসটিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ব্যক্তির প্রতি এই বিশ্বাস গান্ধীজীর আদর্শের অন্যতম প্রধান দৌর্বল্য। কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে পুষ্ট করবার জন্যে যে-সমাজ ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রচার করে, ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসও সেই সমাজই শিক্ষা দেয়। সেই সমাজে ব্যক্তির প্রতি এই বিশ্বাস পরিণতি লাভ করে ব্যক্তিগত মোক্ষের মধ্যে, অর্থনীতিতে একছত্র পুঁজিবাদে, এবং রাজনীতিতে ফাশিবাদী স্বৈরতন্ত্রে। রায়চাঁদজী, রস্তমজী বা আবদুল্লা শেঠের মতো ব্যবসায়ী এবং মিঃ আলেকজাণ্ডারের মতো সরকারী কর্মচারী, এঁরা যে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে গান্ধীজীর মনে একটি বিশেষ করুণা ও স্নেহের স্থান গ'ড়ে তুলেছিলেন, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া, গান্ধীজী ছিলেন সেই সমাজেরই ফসল, যে-সমাজে শাসন ও শোষণের জন্যে স্বার্থলোভীরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, সাহিত্যে-ইতিহাসে, শিল্পে-বিজ্ঞানে নিজেদের সুবিধামতো ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী ক'রে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। নাতালে গোরাদের বিক্ষোভের জন্যে গান্ধীজী সংবাদপত্রগুলিকেও যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী করেন। তাদের মিথ্যাপ্রচারের ফলেই এরূপ ঘটেছিল, গান্ধীজীর বিশ্বাস। তিনি জীবনে

বহুবার সংবাদসেবীদের কর্তব্যপরায়ণ এবং সত্যনিষ্ঠ হ'তে উপদেশ দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বাহ্ণেও তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনেকখানি দায়িত্ব সংবাদসেবীদের ওপর আরোপ করতে কুণ্ঠিত হন নি। সংবাদপত্রের মিথ্যা-প্রচার সম্পর্কে গান্ধীজীর জীবনে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এ-বিষয়ে টলস্টয়ের উপদেশও যে তাঁর মধ্যে কোনো কাজ করে নি, এ-কথা বলা চলে না। টলস্টয়ের কাছেও সংবাদপত্র-পাঠ ছিল মিথ্যার নিয়মিত অনুশীলনের মতো জঘন্য। সংবাদের নামে একরাশ মিথ্যাকে প্রতিদিন গ্রহণ করবার ব্যাপারটিকে টলস্টয় মানব-কল্যাণের অনুকূল মনে করতেন না।

যাই হোক, নাতালের গোরারা যখন জানলো, গান্ধীজী বৃটিশ ও নাতাল সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ করেন নি, 'কুরল্যাণ্ড' এবং 'নাদেরি' জাহাজের আট শত ভারতীয়ের অধিকাংশই দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতন বাসিন্দা এবং ভারতে গান্ধীজী কর্তৃক গোরাদের নিন্দা প্রচারের পরিমাণটা-ও যথেষ্ট গুরুতর নয়, গান্ধীজীর মতে, তখন তাদের মধ্যে অনুশোচনা দেখা দিলো। সংবাদপত্রগুলিও গান্ধীজীর পক্ষ সমর্থন করলো। এমনিভাবে নাকি ভারতীয়দের সংগ্রামের পক্ষে খানিকটা সুবিধা হোলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংসার জয় হোক, আর নাই হোক, নাতাল সরকার যে ভারতীয়দের সম্পর্কে আরো কঠিন ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে লাগলেন, তা একান্ত সত্য। একে একে দুটি আইন পাস হোলো। একটির ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হোলো, অপরটির ফলে সেখানে ভারতীয়দের যাওয়ার বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধের হোলো ব্যবস্থা। ভাগ্যক্রমে ভারতীয়দের ভোটের অধিকারটা কোনো রকমে টিকে গেলো। এই সমস্ত আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে আন্দোলনও হোলো প্রচুর। আইনগুলি সম্পর্কে বিতর্ক বিলাত পর্যন্ত গড়ালো। এইভাবে নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস ক্রমেই অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে তাঁর আত্মিক অনুশীলনও চললো। তাঁর চির-আদরের বস্তু ছিল সেবাব্রত। তিনি সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে লাগলেন[১], সাধারণ হাসপাতালে সেবার কাজ নিলেন। এমন কি তিনি নিজের স্ত্রীর সূতিকাচর্যাও করলেন। এই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালনের কথা-ও

১ খ্রীষ্টের সঙ্গে তুলনা করুন :

"And there came a leper to him beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, If thou wilt thou canst make me clean. And Jesus moved with compassion, put forth his hand, and touched him and said unto him, I will, be thou clean." (Mark. I, 40, 41 and Matt. XVIII. 2. 3.)

তাঁর মনে হোলো। তাঁর মতে, "কেবল যখন সন্তান লাভের ইচ্ছা হবে, তখনই পুরুষ স্ত্রী-সংসর্গ করবে। রতি-সুখ এক স্বতন্ত্র পদার্থ, এ-কথা মনে করা ঘোর অজ্ঞতা।"[১] এই কারণেই গান্ধীজী জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠলেন, যদিও সে-বিরোধিতা তাঁর পূর্বেই ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য বলতে গান্ধীজী কেবল দৈহিক মিলনের বিরতিকেই বোঝেন নি। তাঁর মতে কুচিন্তাও ব্রহ্মচর্যের অন্তরায়। ব্রহ্মচর্যের উপায় রূপে গান্ধীজী নির্দেশ করেন আস্বাদগ্রাহী রসনার সংযম। তাই গান্ধীজী আহারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি বলেন, "ব্রহ্মচারীর খাদ্য যে ফলমূল তা আমি নিজে ছ বৎসর পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। আমি যখন টাটকা ফলাদির উপর নির্ভর করতাম, তখন যে-প্রকার বিকারশূন্যতা লাভ করেছিলাম, খাদ্য পরিবর্তনের পর তা আর অনুভব করতে পারি নি।"

গান্ধীজী তাঁর নিজের জীবন থেকে সর্বপ্রকার ভোগবিলাস বিসর্জন দিতে স্থির সংকল্প করলেন। গৃহের পারিপাট্য গেলো, পোশাক-পরিচ্ছদে এলো সারল্য, আদালতের পোশাক পর্যন্ত তিনি নিজ হাতে ইস্ত্রি ক'রে নিতে লাগলেন। নিজের চুল নিজেই ছাঁটলেন। স্বাবলম্বন ও সাধারণভাবে জীবনযাপনের নেশা গান্ধীজীকে পেয়ে বসলো। ইংল্যাণ্ডে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেই যে গান্ধীজীর এই সরল জীবনযাপন ও স্বাবলম্বনের মূলটি নিহিত ছিল, তা বলা চলে।

তবে এই স্বাবলম্বনের প্রেরণা সম্ভবত তিনি হজরত মহম্মদের জীবনেই পেয়েছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কারলাইলের "Heroes and Hero-worship" গ্রন্থখানি পড়েন। কারলাইল-বর্ণিত মহম্মদের চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করে: "His household was of the frugalest; his common diet was barley, bread and water: sometimes for months there was not a fire once lighted on his hearth. They record with just pride that he would mend his own shoes, patch his own cloak. A poor hard-toiling ill-provided man; careless what vulgar men toil for."

গান্ধীজীর মৃত্যুর সময়ে অনেকে তাঁর সঙ্গে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের তুলনা করেছেন। গান্ধীজীর মতোই সক্রেটিসও নিজের জীবনাদর্শের জন্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু এই তুলনার এখানেই শেষ নয়। প্রথম জীবনে সক্রেটিসও

---

১ "We have to conquer our passions. It is called *Brahmacharya* in Sanskrit. ......It is a breach of *Brahmacharya* to hear questionable language or obscene song. It is licenticus of the tongue to utter foul abuse instead of reciting the name of God, and so with the other senses."—৬ই অক্টোবর, ১৯৩১

ছিলেন গান্ধীজীর মতোই রাজনৈতিক যোদ্ধা। তিনি আথেন্সের পক্ষে মাসিডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। গান্ধীজীর মতোই সক্রেতিস ছিলেন স্বল্পবাস পরিধানের পক্ষপাতী; বরফে ঢাকা পথ দিয়েও তিনি খালি পায়ে হাঁটতেন। গান্ধীজীর মতোই আহারে তাঁর বিন্দুমাত্রও বিলাস ছিল না, আহার ছিল সামান্য এবং সরল। রসনার অনুভূতিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। সক্রেতিসও গান্ধীজীর মতোই কোনো কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লেই তাঁব 'অন্তরতর বাণীর' পরামর্শ নিতেন। গান্ধীজীর উপর সক্রেতিসের প্রভাব সুপ্রচুর। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করবো।

এইভাবে এক সঙ্গে গান্ধীজী তাঁর ধর্ম, সেবা এবং বাজনীতির অনুশীলন করতে লাগলেন।

এই সময় এলো বুয়ার যুদ্ধ।

বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজী যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তা বহু মতের সৃষ্টি করেছে। তাই বুয়ার যুদ্ধ এবং বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজীর ভূমিকাকে যথাযথ দৃষ্টিতে দেখতে হ'লে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেত উপনিবেশগুলি স্থাপনের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবো।

॥ ছয় ॥

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ভূমিকা বা সেখানে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে যুদ্ধের রীতি ও নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, এগুলি কোনো আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। কারণ, গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, তার তিন শ বছর আগে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। আর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের এই সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল ইউরোপীয় বণিকরা। বাণিজ্যের নামে তারা এশিয়া মহাদেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরে যে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন শুরু করেছিল, তার ফল একই সঙ্গে ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃহত্তর এক ইতিহাস রচনা করেছিল, সে ইতিহাসের প্রকাশ-ভঙ্গি দুই খণ্ড মহাদেশে যতোই ভিন্নতর হোক না কেন। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনেব ধারাটি আমাদের লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। তাতে আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটি যেমন স্পষ্টতর হয়ে উঠবে, তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক তথা দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ভূমিকাটিও হবে সহজবোধ্য।

তখন ইউরোপের উদীয়মান বণিক পুঁজির যুগ, তখন এশিয়ার সঙ্গে, বিশেষত ভারতবর্ষের সঙ্গে, ইউরোপের একটি বাণিজ্য সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চলছিল। কিন্তু দুর্গম দুস্তর স্থলপথ ছাড়া ভারতের সঙ্গে তখনো বাণিজ্যিক কোন যোগাযোগ ছিল না। অথচ সমুদ্রপথে ভিন্ন পণ্যসম্ভার বহনের অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। তাই ভারতে আগমনের জন্য জলপথ আবিষ্কারের জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের 'প্রিন্স হেনরি দি নেভিগেটর' এই সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্যে একটি নৌবহর পাঠান। নৌবহর কেপ বোগাডর পর্যন্ত আসে। প্রিন্স হেনরির মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পোর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার একটি আবিষ্কারক নৌবহর পাঠান। তার পরেও কয়েক বার এই সমুদ্রপথের সন্ধানে সদলবলে আবিষ্কারক পাঠানো হয়। কিন্তু অবশেষে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো ডা-গামা তাঁর 'সান রাফায়েল' জাহাজ নিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন ও সমুদ্রপথে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের সন্ধান দেন। ভাস্কো ডা-গামা

দক্ষিণ আফ্রিকার যে অঞ্চলের মাটি প্রথম ছুঁয়েছিলেন, সেই অঞ্চলের তিনি নাম দেন 'তেরা নাতালিস'—যার বর্তমান নাম নাতাল। কারণ, ঐদিন ছিল যিশুর জন্মদিন।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিল প্রধানত বান্টু কাফ্রীদের[১] বাস। তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে এসে এখানকার পূর্ববর্তী অধিবাসীদের বিতড়িত ক'রে এখানে বসবাস করছিল। তাছাড়া বেচুয়ানা, বাসুতো প্রভৃতি জাতি-উপজাতিগুলিও ছিল। বান্টু কাফ্রীদের মধ্যে জুলুরাই ছিল দেখতে-শুনতে সবচেয়ে সুশ্রী ও শক্তিশালী। এদের শক্তির পরিচয় আমরা পরে পাবো।

ভাস্কো ডা-গামার পরে ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ প্রদক্ষিণ ক'রে জাহাজের অজস্র ডানা মেলে ভারতের দিকে রওনা হোলো। প্রথমে এসেছিল পোর্তুগাল ও স্পেন। তাদের পশ্চাতে এলো হল্যাণ্ড, এলো ইংল্যাণ্ড। ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে কাড়াকাড়ির যুদ্ধে হল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ড একযোগে লড়তে লাগলো। বহু যুদ্ধ, খণ্ড-যুদ্ধ ঘটলো আদেনে, সিংহলে আর মসলার দেশ মালয় দ্বীপপুঞ্জে। এই বণিক পুঁজির যুগে পোর্তুগালই কিন্তু পূর্বদেশে পুরোপুরি এক শতাব্দীকাল আধিপত্য বজায় রাখলো। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজরা তাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করলো ভারতবর্ষে—গোয়ায়।

এ পর্যন্ত ইউরোপের বাণিজ্য ব্যক্তিগতভাবেই চলছিল। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ কয়েকটি ব্যক্তিগত কারবারকে একত্রিত ক'রে একটি বণিক প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হোলো বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে প্রাচ্যে ব্যবসায়ের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হোলো। ইংল্যাণ্ডের দেখাদেখি হল্যাণ্ডও অনুরূপ একটি বণিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললো, ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে—ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হেড কোয়ার্টার্স স্থাপিত হোলো যবদ্বীপে, বাতাভিয়ায়। ফরাসীরাও স্থির রইলো না। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরির রাজত্বকালে তারাও একটা কোম্পানি গ'ড়ে তুললো। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হোলো না। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানির পুনর্গঠন হোলো। কিন্তু তাও বড়ো একটা কাজে এলো না। অতঃপর ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে রিশল্যু একটি কোম্পানি খাড়া করলেন—'লা কঁপানি

---

১ কাফ্রী কথাটি আরবিক কাফর্ বা অবিশ্বাসী কথার অপভ্রংশ। অষ্টম শতাব্দীতে বান্টুদের সঙ্গে মুসলমানদের কাজ-কারবার ছিল। ফলে মুসলমানরা এদের নাম দিয়েছিল কাফের বা কাফ্রী।

দেজিন্দ' বা ভারতীয় কোম্পানি। এই কোম্পানিটিও আবার ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হোলো, আরো চার বৎসর বাদে তারা মাদাগাস্কারে একটি নৌবহর পাঠালো এবং ভারতবর্ষের সুরাটে প্রথম ফরাসী কুঠি প্রতিষ্ঠা করলো। এমনিভাবে সারা সপ্তদশ শতাব্দী ধ'রে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী, এই তিন জাতি পূর্ব মহাদেশে ও পূর্ব মহাসাগরে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা বিস্তার করতে লাগলো।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পাঁচটি জাহাজ এণ্ড্রিউ শিলিং এবং হাম্‌ফ্রি ফিজ্‌হার্বার্টের অধীনে টেব্‌ল্‌ উপসাগরে এসে পৌছলো। ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যাওয়ার অর্ধপথে বিশ্রামস্থল রূপে দক্ষিণ আফ্রিকা অত্যন্ত উপযোগী, এ-কথা তাঁদের মনে হয়। তাই তাঁরা সিগ্‌ন্যাল হিলে ইংল্যাণ্ডের পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকা-উত্তোলন উৎসবে ওলন্দাজ জাহাজের ক্যাপ্টেন ও বণিকরাও অংশ গ্রহণ করলেন। এইভাবে সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার আকাশে ইংল্যাণ্ডের পতাকা প্রথম উড়লো এবং কয়েক শতাব্দীব্যাপী একটি রক্তাক্ত ইতিহাসের সূচনা করলো।

কিন্তু ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ভারতযাত্রার মধ্যপথে বিশ্রামস্থল রূপে নির্বাচন করলো সেণ্ট হেলেনা দ্বীপকে। পোর্তুগীজরা করলো মোজাম্বিক, আর ফরাসীরা মাদাগাস্কার। এ-পর্যন্ত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপটিকে বিশ্রামের জন্যে ডাচ:ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই ব্যবহার করতো। তারা বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার যে অংশে ত্রিশ বছর আগে একদা বৃটিশ পতাকা উড়েছিল, সেখানেই তাদের নিজেদের আশ্রয়ী বন্দর গ'ড়ে তুললো।

প্রায় একশ বছর ধ'রে পূর্ব মহাসাগরগুলিতে ওলন্দাজদের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে বণিক পুঁজি শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের তেজ ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এলো, এবং ধীরে ধীরে তারা এশিয়ার মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ছাড়া আর সর্বত্র থেকে হোলো বিতাড়িত। বহু আর্থিক ও সামরিক বিপর্যয়ের ফলে হল্যাণ্ড ক্রমেই ক্লান্ত ও হতবীর্য হয়ে পড়েছিল। অবশেষে এলো ফরাসী বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে ওলন্দাজদের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরেও ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হোলো—১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হোলো বাতাভিয়ান রিপাবলিকের।

অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজরা সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। টেব্‌ল্‌ উপসাগরে 'হারলেম' নামে একটি জাহাজ ডুবে গেল। ঐ জাহাজের নাবিক-লস্কর ও যাত্রী, যারা কোনক্রমে তীরে গিয়ে উঠেছিল, বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক লোপ পেলো। ফলে, এই আশাহীন আশ্রয়হীন মানুষগুলি নতুন

আশায় ভর ক'রে নূতন আশ্রয় রচনার কাজে লেগে গেলো। শুরু হোলো কৃষি। গ'ড়ে উঠলো গির্জা। এইভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সেদিন ওলন্দাজদের বসবাস শুরু হোলো—যারা ভবিষ্যতে বুয়ার জাতি বলে পরিচিত হোলো।[১]

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই 'এডিক্ট অব নান্টেস' আইনটি বাতিল ক'রে দেন। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন আতঙ্কগ্রস্ত ইউগেনো[২] দলের বহু লোক ফ্রান্স ছেড়ে পালান। তাঁদের প্রায় সাত-আট শ জন ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মারফত দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে আসেন ও বসবাস করেন। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফরাসীদের সঙ্গে ওলন্দাজদের সংমিশ্রণ শুরু হয়। এখানে যে-শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচলিত হ'তে থাকে, ফরাসী কিংবা ওলন্দাজ, কোন্ ভাষা তার মাধ্যম হবে, এ নিয়ে ফরাসী ও ওলন্দাজদের মধ্যে বিবাদ-বচসাও কিছু চলে। কিন্তু ফরাসীরা এখানে ছিল আশ্রয়প্রার্থী, আর ওলন্দাজরা আশ্রয়দাতা। সুতরাং অবশেষে ওলন্দাজ ভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, এ পর্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যে পূর্ব দেশে আধিপত্য স্থাপনে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড একযোগে কাজ ক'রে এসেছে।[৩] কিন্তু ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডর মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। আর হল্যাণ্ড বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো ফ্রান্সকে। ফলে অবিলম্বে সিংহলে ও বাতাভিয়ায় ইউরোপে যুদ্ধ বাধার সংবাদ পাঠানো হোলো। (আমাদের মনে রাখতে হবে, তখনো তার বা বেতারের আবিষ্কার হয় নি। সুতরাং সংবাদ অবিলম্বে পাঠানো হ'লেও তা পৌঁছতে সেকালে বেশ বিলম্বই হোলো।) এ-দিকে ইংল্যাণ্ড হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা উত্তমাশা অন্তরীপ অধিকারের সিদ্ধান্ত করলো এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে

---

১ বুয়ারদের মধ্যে ওলন্দাজ রক্তের প্রাধান্যই বেশী। অবশ্য, এই রক্তের সঙ্গে ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয়, এমন কি এশীয়, রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

২ ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজ যখন সবেমাত্র গ'ড়ে উঠছিল, তখন ধর্মেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। সেই প্রতিফলনের ফল রূপে বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের গোড়ার যুগে ফ্রান্সে যে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রচার শুরু হয়, তার প্রতিনিধি ছিলেন ইউগেনোরা। সামন্ততান্ত্রিক শাসন একদিকে যেমন বুর্জোয়াদের দলন করতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে করতে থাকে ইউগেনোদের।

৩ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালিতে পুঁজি উন্নত হয়ে ওঠে। কিন্তু শীঘ্রই তার স্থান অধিকার করে হল্যাণ্ড। আবার বৃটেনে যখন পুঁজি গ'ড়ে উঠতে থাকে, তখন থেকেই ওলন্দাজ পুঁজির অবনতি শুরু হয় এবং তারা মহাজনি ও তেজারতিতেই বেশী জোর দেয়। ইংল্যাণ্ডে পুঁজি শক্তিশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে হল্যাণ্ডের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন হয় এবং তা প্রকাশ্য শত্রুতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কমডোর জনস্টনের অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি নৌবহর পাঠানো হোলো। ফরাসী গুপ্তচররা কিন্তু এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে গেলো এবং তারা বৃটিশ নৌবহরকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলো। ফরাসীদের আশা ছিল, তারা যদি জয়লাভ করে, তবে উত্তমাশা অন্তরীপ তাদের অধিকারে আসবে। তখন ভারতবর্ষের পন্দিচেরিতে ছিল ফরাসীদের সৈন্যাবাস। তাই পন্দিচেরি থেকে ফরাসী নৌবাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলো।

কিন্তু বৃটিশ নৌবহর উত্তমাশা পর্যন্ত অগ্রসর হ'লো না। সালডানা উপসাগরে তাদের সঙ্গে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পণ্যবাহী জাহাজের সাক্ষাৎ ঘটলো। বৃটিশ নৌবহর সেই বহুমূল্য পণ্যসম্ভার লুণ্ঠন ক'রে দেশে ফিরে গেলো। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বেলজিয়ামের স্থাপিত হোলো সাময়িক শান্তি। ইংল্যাণ্ড পূর্ব মহাসাগরগুলিতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেলো, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছু সম্পত্তিও তাদের হাতে এলো।

কিন্তু যুদ্ধের ভঙ্গিতে শীঘ্রই পরিবর্তন দেখা গেলো। শত্রু মিত্র হয়ে উঠলো, মিত্র হয়ে উঠলো শত্রু। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যে তাদের সামন্ততান্ত্রিক অবয়ব ছেড়ে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, তার চূড়ান্ত প্রমাণ মিললো ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের শুরুতে। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দল গ'ড়ে উঠলো হল্যাণ্ডে—'পাট্রিঅটেন' বা 'প্যাট্রিঅট' দল। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ রাজবংশের প্রতি তারা ছিল বিরূপ। তাই ইংল্যাণ্ডের শাসকরা ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন না থাকায় এখন অরেঞ্জ রাজবংশের সমর্থক হয়ে উঠলো। এদিকে ফরাসী বিপ্লবের আলোড়ন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এসে লাগলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে যাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদের জন্যে নির্বাসিত অনেকেও ছিলেন। তাছাড়া হল্যাণ্ডে 'পাট্রিঅটেন' দল শক্তিশালী হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজরাও ফরাসী বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবের সমর্থক ওলন্দাজ 'পাট্রিঅটেন' দলের সমর্থন করতে লাগলো। শীঘ্রই খবর এলো, প্রিন্স অব অরেঞ্জ হল্যাণ্ড ত্যাগ ক'রে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আর সেই আশ্রয়দানের উপসংহাররূপে বৃটিশ নৌবহর অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকা 'রক্ষা' করতে চাইছে। কিন্তু হল্যাণ্ডে 'পাট্রিঅটেন' দলের হাতে ক্ষমতা থাকায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরে বাতাভিয়ান রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা ঘটায় স্থানীয় অধিবাসীরা বৃটিশ 'রক্ষা-ব্যবস্থাকে' মেনে নিলো না এবং তারা সশস্ত্রভাবে বৃটিশ নৌবাহিনীর প্রতিরোধ করতে লাগলো। প্রতি মুহূর্তেই তারা আশা করতে লাগলো, ফরাসী

মুক্তিফৌজ তাদের সাহায্যে এসে পৌঁছবে। কিন্তু ফরাসী মুক্তি ফৌজ এসে পৌঁছলো না। অবশেষে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারা পরাজয় স্বীকার করলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ পতাকা ভূলুণ্ঠিত হোলো। বৃটিশ পতাকা আবার মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে বৃটেনের সঙ্গে ফরাসী রিপাবলিকের সন্ধি হোলো। সন্ধি-শর্ত অনুসারে উত্তমাশা অন্তরীপ বাতাভিয়ান রিপাবলিকের হাতে গেলো। ইংল্যাণ্ড পেলো সিংহল ও ত্রিনিদাদ।

কিন্তু ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে নূতন আকারে আবার যুদ্ধ বাধলো। সুতরাং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সময়ে ইংল্যাণ্ডের এক ঝাঁক রণতরী দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে পৌঁছলো। নৌবহরের সেনাপতি ছিলেন স্যার ডেভিড বের্ড।[১] ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ সেনাপতি যান্‌সেনের অধীনে সৈন্য ও জনসাধারণের এক যুদ্ধ হোলো। বৃটিশ সৈন্যেরা যুদ্ধে জয়লাভ করলো। এইভাবে স্যার ডেভিড বের্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘস্থায়ীভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ডেভিড। অচিরেই বৃটেনের হুইগ সরকার তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হুকুম করলো। বহু অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে ডেভিড বের্ড দেশে ফিরলেন।[২]

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের হাতে এই পরাজয়কে স্থানীয় ওলন্দাজ বাসিন্দা অর্থাৎ বুয়াররা স্বীকার ক'রে নিলো না। তাদের অসন্তোষ ও বিদ্বেষ বৎসরের পর বৎসর ধ'রে ক্রমাগত ধূমায়িত হ'তে লাগলো। স্থানীয় কাফ্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা ইংরেজদের 'সমুদ্রে তাড়িয়ে' দেওয়ার জন্যে বিদ্রোহ করলো। ইংরেজরা কিন্তু এই বিদ্রোহকে নৃশংসভাবে দমন করলো। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় ভেঙে পড়েছিল। দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য হয়ে উঠেছিল অসহনীয়। সে-জন্যে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বহু ইংরেজ দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়িভাবে বসবাসের জন্যে এলো। ফলে ইংরেজেরাও বেশ দলভারি হয়ে উঠলো। এদিকে ইংরেজদের কাছে লাঞ্ছনা অত্যাচার সইতে না পেরে বুয়ারদের একটা প্রকাণ্ড অংশ উত্তর দিকে রওনা হোলো। এইভাবে বুয়ার উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়লো।

---

১ স্যার ডেভিড বের্ড ভারতবর্ষেও বহুদিন ছিলেন। ভারতে ইংল্যাণ্ডের-সাম্রাজ্যলোভী বহু সংগ্রামেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হায়দর আলির কারাগারে তিনি চার বৎসর অতিথিরূপেও ছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তন্‌ আক্রমণকালে তিনি নেতৃত্ব ক'রে যথেষ্ট 'কৃতিত্ব' অর্জন করেছিলেন।

২ পাঠক, 'হতভাগ্য' লর্ড ক্লাইভের কথা স্মরণ করুন।

নাতালে তখন ছিল জুলুদের প্রবল প্রতাপ। তাদের রাজা ছিলেন চাকা। চাকা দুর্দান্ত ব্যক্তি। তিনি জুলু জাতিকে সামরিক শিক্ষায় গ'ড়ে তুলেছিলেন এবং অন্যান্য উপজাতিগুলি তাঁর ভয়ে দেশের পর দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল। চাকা এক সময় অসুস্থ হ'লে ইংরেজ ডাক্তার হেনরি ফাইন তাঁর চিকিৎসা করেন। ফলে চাকা ইংরেজদের বন্ধুত্বের চোখে দেখেন। ডাক্তার হেনরি ফাইনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে চাকা এফ. সি. ফেয়ারওএল অ্যাণ্ড কোম্পানিকে একখণ্ড বিস্তৃত ভূমি দান করেন। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে বর্তমান ডারবান বন্দরটিও ছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট তারিখে ঐ মাটির ওপর বৃটিশ পতাকা তোলা হোলো এবং কামানের তোপে এই অঞ্চলকে বৃটিশ সম্পত্তি ব'লে ঘোষণা করা হোলো। ডাক্তার হেনরি ফাইন আরো অনেক ভূসম্পত্তি পেলেন। অতঃপর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেয়ারওএল সাহেব খুন হ'লে তাঁর সম্পত্তি তাঁর বাকী দুজন অংশীদারের হাতে এলো। তাঁরা জুলু রাজার অধীনে জমিদার হিসাবে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ে নাতালে ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও আসতে আরম্ভ করলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডারবান[১] শহরের পত্তন হোলো। তখন সেখানে ইংরেজ অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫।

প্রায় ঐ সময়েই বুয়াররা বর্তমান ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের অর্ধেকখানি অধিকার ক'রে নিলো। নাতালেও তাদের সঙ্গে জুলুদের বিবাদ বাধলো। তখন চাকাকে হত্যা ক'রে তাঁর ভাই ডিংগান জুলুদের রাজা হয়েছেন। সাদা চামড়া সম্পর্কে ডিংগানের ধারণা যে মোটেই উচ্চ নয়, এ কথা শীঘ্রই বোঝা গেলো। ফলে বুয়ারদের সঙ্গে ইংরেজরাও যোগ দিলো। বুয়ারদের সঙ্গে জুলুদের যে যুদ্ধ হোলো, সেই যুদ্ধে পরবর্তী বুয়ার যুদ্ধের নেতা তরুণ পল ক্রুগারও ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ডিংগান পলায়ন করলেন। ডিংগানের ভাই পাণ্ডা বুয়ারদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করলেন যে, বুয়াররা তাঁকে রাজা হবার জন্যে সাহায্য করবে। ডিংগান নিহত হলেন। জুলুরাও বুয়ারদের তাঁবে এলো।[২]

অনতিবিলম্বেই বুয়ার নেতা আন্‌দ্রিস প্রিটোরিয়াস এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে একটি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা হোলো ব'লে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইংরেজরা এই রিপাবলিককে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারলো না। ফলে আন্‌দ্রিস প্রিটোরিয়াসের অধীনে বুয়াররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং তাদের পরাজিত ক'রে দক্ষিণ

১ স্যার বেঞ্জামিন ডারবানের নাম অনুসারে।
২ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় কূটনীতির ইতিহাসও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আফ্রিকান রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করলো। এই রিপাবলিকটিই বর্তমান ট্রান্সভাল। রিপাবলিকটি ভাল্ নদীর উত্তর পারে অবস্থিত থাকায় নাম হোলো ট্রান্সভাল। ভাল্ নদীর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের বুয়াররা কিন্তু ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলেও তারা ক্রমাগতই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করতে লাগলো। অবশেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সে অধিকার স্বীকৃত হোলো। এই অঞ্চলেব নাম হোলো 'অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট'।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আন্‌ড্রিস্ প্রিটোরিয়াসেব পুত্র মার্টিনাস প্রিটোবিয়াস্ পল ক্রুগারের সঙ্গে একযোগে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট এবং ট্রান্সভাল নিয়ে একটি সংযুক্তরাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতে চাইলেন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট থাকা কালেই অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটেরও প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন। এইভাবে, আইনত না হ'লেও, বস্তুত, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট মিলিত হোলো।

দক্ষিণ আফ্রিকার আর্থিক অবস্থা এই সময় অত্যন্ত মন্দ ছিল। কিন্তু ঐ সময় অকস্মাৎ একটি শিশু অরেঞ্জ নদীতে এক টুকরো হীরক কুড়িয়ে পেলো। অরেঞ্জ নদীর এই অংশ ছিল কেপ কলোনির উত্তর অঞ্চলে। তাই ভালেব তীর ধ'রে সকল জাতির ও দেশের খনি-শ্রমিকরা এসে ভিড করতে লাগলো। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনিতেও স্বায়ত্তশাসনশীল একটি সরকার গঠিত হোলো।

কিন্তু ট্রান্সভালের গোরাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হয়ে পড়ছিল। ফলে জুলুদের প্রতাপও বাড়ছিল ক্রমেই। তাই এমন কি পল ক্রুগার পর্যন্ত বৃটিশ উপনিবেশের সঙ্গে ট্রান্সভালকে যুক্ত ক'রে দিয়ে বৃটিশ সরকারের অধীনে একটি চাকরি নিয়ে থাকতে চাইলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সভাল বৃটিশ উপনিবেশের সঙ্গে যুক্ত হোলো।

কিন্তু ব্যবস্থাটা নিতান্ত দায়ে প'ড়েই গ্রহণ করেছিল বুয়াররা। তাই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বুয়ারদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধের নেতৃত্ব করলেন পল ক্রুগার ও মার্টিনাস প্রিটোরিয়াস। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা বুয়ারদের সঙ্গে সন্ধি করলো। ট্রান্সভাল পেলো স্বায়ত্তশাসন। তবে বৃটিশের সার্বভৌমতা গেলো না। পল ক্রুগার ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন। মনে রাখতে হবে, এই পল ক্রুগারই গত বুয়ার যুদ্ধের সময় অধিনায়কত্ব করেন। এঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জার্মান। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রচার এঁকে হুন দস্যু ও এটিলার সমগোত্র ক'রে চিত্রিত করেছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সভালে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা

সমৃদ্ধ স্বর্ণখনি হোলো আবিষ্কৃত। ট্রান্সভালে স্বর্ণ-শকুনদের ভিড় জমে উঠলো। গ'ড়ে উঠলো জোহানেস্‌বার্গ শহর।

পরে ট্রান্সভালের এই স্বর্ণখনি নিয়েই স্থানীয় শ্বেত-অধিবাসী বুয়ার এবং বৃটিশের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে, তারই নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বুয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে গান্ধীজী সদলবলে অংশ গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ট্রান্সভাল বৃটিশ কলোনিভুক্ত হয়। এর পর-ও এখানে ওখানে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে শান্তি স্থাপিত হয়। আরো আট বৎসর বাদে দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি উপনিবেশ নিয়ে গঠিত হয় একটি যুক্তরাষ্ট্র—নাম হয় 'ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা'।

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা বলতে এই ইউনিয়নকেই বোঝায়।

॥ সাত ॥

এ-হেন এক বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজীকে অবতীর্ণ হ'তে হোলো।

বুয়ারদের প্রতি গান্ধীজীর সহানুভূতি থাকলেও বৃটিশ প্রজা হিসাবে তিনি বৃটিশের প্রতি আনুগত্যকেই কর্তব্য ব'লে ভাবলেন। এইভাবে তিনি 'ন্যায়ের' নামে অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন ক'রে বসলেন। এমনিভাবেই গান্ধীজীর বিবেকী ন্যায় (casuistry) অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে মাৎস্য ন্যায়ের সমর্থক ক'রে তুলেছে। বৃটেনের পক্ষ সমর্থন করবার সময় যে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, একথা গান্ধীজী বিস্তৃতভাবে স্বীকার বা বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব তাঁকে যে-উপসংহারে উপনীত করেছিল, এমন কি গান্ধীজীর কাছ থেকেও, তাকে নিঃসংশয় চিত্তে গ্রহণ করা স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। গান্ধীজী তখনো ভাবতেন, ভারতের পূর্ণ সমৃদ্ধি বৃটিশ-শাসনের অধীনেই হ'তে পারে। সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে তিনি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী। বহু জাতির বা দেশের একত্রে স্বেচ্ছায় থাকার অর্থ এক, এবং কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে কতিপয় দেশের একত্রে থাকার অর্থ যে আর, তা গান্ধীজী পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন না থাকায় বুঝতে পারেন নি। তাই সাম্রাজ্য-বাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকলে বন্ধুত্বের রাখী এবং ছদ্মবন্ধুত্বের শৃঙ্খলের মধ্যে পার্থক্যটি তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সেবা ও সাহায্য দিয়ে কখনো পুষ্ট করতে চাইতেন না। কারণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সেবার নামে—মানবিকতার নামে—সাহায্য করবার সহজ অর্থ এই ছিল যে, মানবিকতার নামে মানুষকে হত্যা ক'রে তার রক্ত-মাংস দিয়ে হিংস্র ব্যাঘ্রকে পোষণ করা!

তবে গান্ধীজীকে সহজে প্রতারিত করবার মতো অন্য একটি কারণও ছিল। বুয়ার যুদ্ধের অন্যতম কারণ রূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ঘোষণা করেছিল, ভারতীয়দের প্রতি ট্রান্সভালের বুয়ারদের অমানুষিক অত্যাচার। গান্ধীজী সরল উদার মনে তা বিশ্বাস করেছিলেন। চিরদিনই তাঁর নীতি ছিল, অবিশ্বাস ক'রে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস ক'রে ঠকাই ভালো। কিন্তু মানবিকতার নামে, সভ্যতার নামে, আলোকিত করবার নামে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরদিনই তার পরদেশ লুণ্ঠন শুরু ক'রেছে ও চালিয়েছে। যেখানে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল হয়েছে, সেখানেই সে দলে দলে মিশনারী পাঠিয়েছে। এ নীতি তার নূতন নয়। তাই দেখি, খ্রীষ্টান মিশনারীর ভগীরথ বৃটিশ

সাম্রাজ্যবাদের প্লাবনকে দেশে-দেশে ডেকে নিয়ে এসেছে। অথচ এই ঐতিহাসিক সত্যও গান্ধীজীকে সতর্ক করে নি।

যাই হোক, গান্ধীজী বুয়ার যুদ্ধের সময় যে-সেবাদল গঠন করেছিলেন, তাতে প্রায় এগারো শ লোক ছিল। এই এগার শ-র মধ্যে স্বাধীন ভারতীয় ছিল প্রায় তিন শ, বাকী গিরমিটিয়া। বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে সাহায্য করায় ভারতের কি উপকার হয়েছিল, সে সম্বন্ধে গান্ধীজী তাঁর স্বাভাবিক আশাবাদিতার সঙ্গেই বলেছেন :

"আমাদের ক্ষুদ্র কার্য তখন খুবই প্রশংসা লাভ করেছিল এবং ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট বেড়েছিল। 'ভারতীয়রাও একই সাম্রাজ্যের সন্তান' এই ব'লে গান পর্যন্ত রচিত হয়েছিল।"

যে-সব সাম্রাজ্যবাদী আজকের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশকে রাশিয়ার সঙ্গে থাকার ফলে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ব'লে প্রচার করতে কুণ্ঠিত হয় না, তারাই সেদিন ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকায় শতমুখে তার প্রশস্তি গেয়েছিল। কেন যে গেয়েছিল, তার কারণটা কিন্তু গান্ধীজী বিচার ক'রে দেখেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি, এদের একত্র থাকার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের একত্র থাকার একটা সুগভীর পার্থক্য আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে এক-পরিবার-ভুক্ত বলা চলে। তারা একান্নবর্তী। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য—যেখানে সকলের অন্নে একের পুষ্টি হয়, তাকে একান্নবর্তী বলা চলে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সুবিধা-মতো বিশেষ সময়ে কখনো বা একান্নবর্তিতার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গেয়েছে, আবার কখনো বা স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের নামের সম্মিলিত রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মঘাতী সংগ্রাম বাধিয়ে দিতেও চেষ্টা করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই ভারতবর্ষ, আয়ারল্যাণ্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়াকে করতলগত রাখতে চেয়েছে, তখনই তারা কমনওয়েল্থের বা একান্নবর্তিতার গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আবার যখন এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেখেছে, কোনো দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষা করতে চলেছে, তখনই সেখানে সে 'self-determination' বা স্বাধিকারের নামে গৃহবিরোধ ও বিভেদের জন্যে উশ্‌কানি দিতে ছাড়েনি। তাই ফরাসী গৃহযুদ্ধের সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্যে এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ বাধাবার জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। কেবল তাই নয়, তাদের সুবিধাবাদী চেষ্টার ফলেই ভারত

আজ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে—হিন্দু ও মুসলমান তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যরও স্বাধিকারের বিষফল নিয়ে মাতামাতি করছে। তাই বলা চলে, গান্ধীজী যদি সাম্রাজ্যবাদীদের সুচতুর ছলাকলা সম্পর্কে আরো সচেতন হতেন, তবে সে-দিন 'ভারতীয়রাও একই সাম্রাজ্যের সন্তান', এই গানের মধ্যে আনন্দিত হবার মতো কিছুই পেতেন না। দেখতে পেতেন, এই মৈত্রীর আসল রূপ, তার বিষকুম্ভ-পয়োমুখিতা। কেবল বুয়ার যুদ্ধের সময়ে কেন, আরো বহুবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের প্রীতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রতিবারই তার সে-প্রীতির ছদ্মবেশ খুলে পড়েছে, প্রকট হয়ে উঠেছে তার দানবীয় বিকট মূর্তি। একটি কথা আছে: মানুষের অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় না। গান্ধীজীব জীবনেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেব চাটুবাক্য, স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারিতা সম্পর্কে প্রচুব অভিজ্ঞতা জন্মেছিল, কিন্তু তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর কোনো কাযকরী জ্ঞান হয় নি। তাই মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে গেছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া বিষপাত্রকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছেন।

তাই গান্ধীজী সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যেব অনুরক্ত প্রজা হিসাবেই বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। সেজন্যে তাঁকে যে তাঁব প্রতিপক্ষীয়দের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়নি, এমনো নয়।

যাই হোক, বুয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিবতে চাইলেন। "লডাইয়ের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমার মনে হোলো যে, আমার কার্যক্ষেত্র এখন আর দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়,—ভাবতবর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে কিছু কিছু সেবার কাজ যে করা যায় না, এমন নয়। কিন্তু মনে হোলো, পয়সা রোজগারই যেন এখানে বড়ো কাজ।"

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মীরা গান্ধীজীকে সহজে ছুটি দিতে চাইলেন না। শর্ত হোলো: যদি এক বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের জন্যে ডাক পড়ে, তবে তাঁকে ফিরে আসতে হবে। ভারতবর্ষে ফেরবার পথে গান্ধীজী মরিসাস দ্বীপে নামেন এবং সেখানে কিছুদিন থেকে মরিসাসবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে সন্ধান নেন। গান্ধীজী আগেই একথা বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষে গিয়ে যদি রাজনীতিতে যোগ দিতে হয় বা জনসেবা করতে হয়, তবে ভারতবর্ষকে কেবল মানচিত্রের মারফত নয়—চাক্ষুষভাবেও দেখা দরকার। গান্ধীজী তাই ভারতবর্ষে নেমেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের জন্যে বার হলেন।

ঐ সময় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল

কলকাতায়। সভাপতি ছিলেন দীনশা এডুলজি ওয়াচা। গান্ধীজী স্থির করলেন, কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর যাওয়া দরকার। কংগ্রেসে তাঁর এই প্রথম পদার্পণ।

বোম্বাই থেকে যে-গাড়িতে স্যার ফিরোজশা মেটা রওনা হয়েছিলেন, গান্ধীজীও সেই গাড়িতেই চ'ড়ে বসলেন। স্যার ফিরোজশার জীবনযাপনের পদ্ধতিটা ছিল নিতান্তই রাজসিক। একটি পৃথক সেলুনে তিনি যাচ্ছিলেন। পথে এক স্টেশনে নেমে গান্ধীজী স্যার ফিরোজশার কামরায় এসে উঠলেন, দেখলেন, সেখানে দীনশা ওয়াচা এবং চিমনলাল শীতলবাদও উপস্থিত আছেন। তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা হচ্ছে।

স্যার ফিরোজশা গান্ধীজীকে নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন। তবু গান্ধীজী যখন তাঁকে ভারতীয় কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি বড়ো একটা উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, "প্রস্তাব না হয় একটা পাস ক'রে দিলাম। কিন্তু আমাদের দেশেই বা কোন্ স্বাস্থ্য পাওনা আমাদের মেলে? আমার বিশ্বাস, আমাদের নিজেদের দেশে আমাদের অবস্থা যতোদিন না বদলাবে, ততোদিন উপনিবেশে আমাদের অবস্থা বদলাতে পারে না।"

গান্ধীজীর উৎসাহ অনেকখানি ক'মে গেলো। কিন্তু তবু প্রস্তাবটা পাস করিয়ে নেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করলেন।

কলকাতায় নেমে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বাসস্থানে এসে উঠলেন। সেখানে লোকমান্যের সঙ্গেও তাঁর ফের সাক্ষাৎ হোলো। গান্ধীজী কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ ক'রে নিলেন এবং অবিলম্বে সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর সেবার কাজ শীঘ্রই সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিলো। তিনি মেথরের কাজগুলি পর্যন্ত নিয়মিত নির্বিকারচিত্তে করতে লাগলেন।

কংগ্রেস বসতে তখনো দু'দিন বাকী। গান্ধীজী কংগ্রেসের আরো কিছু কাজ করতে চাইলেন। তাঁকে একটি সাধারণ কেরানীর কাজ দেওয়া হোলো। সেদিন কে জানতো যে, এই উৎসাহী, সৌম্য, শান্ত যুবকটিই একদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে উঠবেন! সেদিন তিনি কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক মিঃ ঘোষালের জামায় বোতাম পরিয়ে দিচ্ছিলেন, আর মিঃ ঘোষাল বড়াই ক'রে শোনাচ্ছিলেন, "জামায় বোতাম লাগাবার মতো ফুরসত কি কংগ্রেস-সম্পাদকের আছে? তাঁর কতো কাজ!"

আজ এই দৃশ্যটি ভাবলে বড়ো হাসি পায়। সেদিন যদি মিঃ ঘোষাল কল্পনাও

করতেন যে, এই মানুষটিই মাত্র পনেরো-বিশ বৎসর বাদে 'মহাত্মা গান্ধী' হয়ে উঠবেন, তাঁর লজ্জা-সংকোচের কি অবধি থাকতো! পূর্বপুরুষদের বড়ো সৌভাগ্য যে, উত্তর-পুরুষদের খবর তাঁরা রাখেন না। মৃত্যু তাঁদের বহু লজ্জা থেকেই নিষ্কৃতি দেয়।

অতঃপর যথাসময়ে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হোলো।

নানা আলোচনা ও প্রস্তাব-পাঠে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসে প্রস্তাবগুলির উত্থাপন ও পাস ক্রমেই দ্রুততর হ'তে লাগলো। স্পষ্টই বোঝা গেলো, সমাগত কংগ্রেস সভ্যদের প্রস্তাবের চেয়ে প্রস্থানের দিকেই লক্ষ্য বেশি। গান্ধীজী উস্‌খুশ করছিলেন, সাহস ক'রে কিছু বলতে পারছিলেন না। উপস্থিত সকলেই বয়োবৃদ্ধ, রথী, মহারথী। কিন্তু আর বিলম্ব করাও তো চলে না। চুপি চুপি গান্ধীজী গোখলের কাছে গিয়ে বললেন, "কই, আমার একটা ব্যবস্থা করুন।"

ব্যবস্থা হোলো। মঞ্জুর হোলো মাত্র পাঁচ মিনিট। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী প্রস্তাবটি কোনো রকমে পাঠ করলেন। কিন্তু প্রস্তাব শোনার দিকে কারো আগ্রহ দেখা গেলো না। প্রস্তাবটি গোখলে আগে পড়েছেন শুনে সবাই ধ'রে নিয়েছিলেন, ঠিক আছে। ফলে প্রস্তাব দ্রুত পাস হয়ে গেলো। কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব পাস হওয়া সম্পর্কে আর কোনো মোহ গান্ধীজীর রইলো না। তবু তিনি বুঝলেন, প্রস্তাবটি পাস হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের আন্দোলনের প্রচুর উপকারই হবে। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আন্দোলনের পেছনে যে ভারতের অখণ্ড জনমত রয়েছে, এ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কংগ্রেস শেষ হবার পর গান্ধীজী কলকাতায় আরো মাস খানেকের জন্যে রয়ে গেলেন। চেম্বার অব কমার্স এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল। তখনকার দিনে ইণ্ডিয়া ক্লাবেই ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আস্তানা হোতো। তাঁদের সকলের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হবে, এই আশায় গান্ধীজীও সেখানেই উঠলেন। গোখলে ওখানে না থাকলেও প্রায়ই ওখানে বিলিয়ার্ড খেলতে আসতেন। তিনি তরুণ গান্ধীকে ক্লাব থেকে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। গান্ধীজী তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে আমাদের জানিয়েছেন যে, গোখলের গৃহে তাঁর সঙ্গে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরই পরিচয় হয়েছিল। তবে যে-ব্যক্তিটিকে বহু বৎসর বাদেও তাঁর সর্বাগ্রে মনে পড়েছিল, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

গোখলের বাসার কাছেই থাকতেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাই তিনি গোখলের বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় গোখলে বলেছিলেন :

"ইনিই অধ্যাপক রায়। মাসে আট শ টাকা মাইনে পান। নিজের জন্যে মাত্র চল্লিশ টাকা রাখেন। বাকিটা খয়রাতে যায়।"

কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের এই পরিচয় গান্ধীজীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সেটুকু বোঝা যায়, তাঁর জীবনব্যাপী যন্ত্র-বিরোধিতা থেকে। বাস্তবিক পক্ষে বলা চলে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তখনকার ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অনেকখানি বিরুদ্ধ শক্তি। গান্ধীজী তাঁর সহজ, সরল, গ্রাম্য জীবনের মোহে ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থাকে এমন একটি জায়গায় টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যাকে বলে পশ্চাদ্‌গতি। সেই অবস্থায় প'ড়ে থেকে ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা বহু শতাব্দী কাল ধ'রে স্থাবর ও পঙ্গু হয়েই ছিল। অন্যপক্ষে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পকে ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় প্রথায় গ'ড়ে তুলতে—শ্রমশিল্পের সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই তাকে বিশ্বের দরবারে পৌছে দিতে। তাই অর্থনীতির দিক থেকে গান্ধীজী ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল, আর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন প্রগতিশীল। ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের দিকেই ভারতবর্ষ আজ এগিয়ে চলেছে, তার কলকারখানা উঠেছে বেড়ে। অন্যপক্ষে, গান্ধীবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা আজ শখের আদর্শমাত্রে পরিণত হয়েছে। বিড়লা, ডালমিয়ার মতো তাঁর প্রিয় শিষ্যরাই তার প্রমাণ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অর্থনৈতিক আদর্শ গান্ধীজীকে প্রভাবান্বিত না করলেও গোখলের দেশপ্রীতি যে প্রচুর পরিমাণে করেছিল, তা নিঃসন্দেহ। তখন ছিল গান্ধীজীর রাজনৈতিক শিক্ষানবিশির যুগ। আর গোখলেই ছিলেন তখনকার দিনের আদর্শ দেশ-নেতা। মহম্মদ আলি জিন্নাও তাঁর প্রথম জীবনে গোখলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'মুসলিম গোখলে' হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উচ্চাশা। গান্ধীজী বলেন :

"গোখলের কর্মপদ্ধতি দেখে আমার যেমন আনন্দ হোতো, তেমনি হোতো শিক্ষালাভ। একটি মুহূর্তও তিনি নষ্ট হ'তে দিতেন না। দেখতাম, তাঁর সকল কাজই ছিল দেশের কাজ, তাঁর সকল কথাই ছিল দেশের কথা।"

ঐ সময় গান্ধীজী কলকাতায় কালী-মন্দির দর্শন করলেন ও ছাগবলি দেখে

আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তাঁর মনে পড়লো বুদ্ধের বাণী, চৈতন্যের ধর্ম। চৈতন্যের বাংলায় হিংসার এই বীভৎস মূর্তি দেখে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য, বাংলা দেশে শাক্ত ধর্মের বর্তমান প্রতাপ দেখে তিনি কৌতূহলীও হয়ে উঠেন। ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল জন্মে। তরুণ গান্ধী ঐ সময় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের লোভে বেলুড় পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজী তখন কলকাতায়, অসুস্থ। তাই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। সাক্ষাৎ হ'লে সেদিন হয়তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতো—মন্ত্রস্নানের প্রচারক জনের সঙ্গে যিশুর সাক্ষাতের মতো। তবে বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর ধর্মের কয়েকটি সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দের ধর্ম পৌরাণিক ও 'ভারতীয়'। আর 'ভারতীয়' ব'লেই তা উগ্র জাতীয়তাবাদী। গান্ধীজীর ধর্ম 'অভৌগোলিক', তাই তাতে জাতীয়তাবাদের অমন ঝাঁঝ নেই—তা 'বৈদিক খ্রীষ্টধর্ম'—ব্রাহ্ম ধর্মের অনেকখানি অনুরূপ, তার জন্ম সাম্রাজ্যবাদে। বিবেকানন্দ শাক্ত বাংলার মানুষ, তাই তাঁর সেবা ও অহিংসা ছিল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব অহিংসা নিয়ে তা আদৌ ব্যস্ত হয় নি। এমন কি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল না। নবজাগ্রত ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের বিদ্রোহী শক্তি গোখলে ও তিলকের মধ্যে যেমন অনেকখানি ভিন্নতরো রূপে প্রকাশলাভ করছিল, তেমনি তার ধর্মের রূপও ভিন্নতরো ভাবে প্রকাশলাভ করেছিল বিবেকানন্দ ও গান্ধীর মধ্যে। এ পার্থক্যটা তাই জাতের নয়, কেবল গোত্রের।

গান্ধীজী ঐ সময়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে খুব বেশী সন্তুষ্ট হন নি। বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপেও যে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতেন, এ-কথা আমার মনে হয় না। তাঁরা দু'জনে ছিলেন একই বৃক্ষের দু'টি ফুল, তবে তাঁদের মধ্যে রঙের ভিন্নতা এমন প্রচুর ছিল যে, তাঁরা দু'জনে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে পরস্পরকে সজাতীয় ব'লে চিনতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ঐ সময়কার দৈনন্দিন কর্মসূচী সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন :

"আমি প্রতি দিনের কাজ এইভাবে ভাগ ক'রে নিয়েছিলাম : দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের জন্যে কলিকাতায় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলিকাতার ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সন্ধান এবং সেগুলির সঙ্গে পরিচয়।"

অর্থাৎ সংক্ষেপে, ধর্ম ও রাজনীতি।

গান্ধীজীর এই কর্মসূচী তাঁর জীবনের সাময়িক কোনো ঘটনা নয়। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী একটি অনুষ্ঠান—তাঁর চরিত্রের দু'টি মূল দিক।

বস্তুতপক্ষে, তাঁর জীবনে রাজনীতির চেয়ে ধর্মের প্রাধান্যই বেশী। তাঁর পরবর্তী জীবনে, আমরা লক্ষ্য করবো, এই ধর্মপরায়ণতার জন্যে ভারতীয় রাজনীতির বিপুল আয়োজনকেও বিনা দ্বিধায় তিনি পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং আর অগ্রসর হবার আগে গান্ধীজীর ধর্মনীতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। তাছাড়া, তাঁর ধর্মের স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ ক'রে না দেখলে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপও নিতান্তই দুর্বোধ্য লাগবে। তাই পরবর্তী পরিচ্ছেদে গান্ধীজীর ধর্মনীতিই আমাদেব আলোচ্য বিষয় হবে। তাঁর নীতি-ধর্ম।

॥ আট ॥

একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, গান্ধীজী সুদীর্ঘকাল ধ'রে যে-ধর্মের অনুশীলন করেছিলেন, তা আসলে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান বা পারসিক, কোনো ধর্মই ছিল না। তা ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত, স্বরচিত একটি ধর্ম—বিভিন্ন ধর্ম থেকে সংকলিত, নিজের ইচ্ছামতো নির্বাচিত কয়েকটি নীতির সমষ্টিমাত্র। তাঁর এই ধর্মের নাম তিনি দিয়েছিলেন, 'নীতি-ধর্ম' বা Ethical Religion.

আমি পূর্বে যখন বলেছি, গান্ধীজী ধর্মকে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রয়োগ করেছিলেন এবং ধর্ম দিয়ে ইতিহাসের গতি রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তখন আমি তাঁর এই স্বরচিত 'ভৌগোলিক-সীমা-বর্জিত' নীতি-ধর্মের কথাই বলেছি।[১] সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন eclectic বা চয়নপন্থী। ধর্মেও এই চয়ন-রীতি পরিপূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও মুসলমান—সকল ধর্ম থেকেই তাঁর তথাকথিত সনাতন সত্যকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের জীবনে ও সমাজ-জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নি যে, যাকে তিনি সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করছেন, তা নিতান্তই কালোপযোগী—কালের খরস্রোত সেই সত্যের মৃত্তিকা সঞ্চিত করেছে, হয়তো তাতে মূল্যবান ফসল উঠেছে, হয়তো তাতে আগাছা জন্মেছে,···আবার এসেছে কালস্রোত, ক্ষয়ে খসে ধ্বসে ধুয়ে মুছে গেছে পুরাতন সত্যের মৃত্তিকা, এসেছে ভাঙন, প্লাবন, আবার নূতন সত্যের মৃত্তিকা দেখা দিয়েছে, উঠেছে নূতনতরো ফসল, হয়তো নূতনতরো বিফলতা। গান্ধীজী লক্ষ্য করেন নি যে, ধর্মের কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। সে ইতিহাস উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[২] ভারতবর্ষে যখন নয়া বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠলো, তখন তার ধর্ম প্রধানত আত্মপ্রকাশ করলো ভিক্টোরিয়ান বুর্জোয়া খ্রীষ্টান

১ **"My religion has no geographical limits."—Ethical Religion by M. K. Gandhi.**

২ **"Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms of consciousness, thus no longer retain the semblance of independence They have no history, no development; but men developing their material production and their material intercourse alter, along with this their real existence, their thinking and the products of their thinking. Life is not determined by consciousness, but consciousness by life."**

Karl Marx and Frederich Engels—The German Ideology.

ধর্মের এক ভারতীয় সংস্করণ—ব্রাহ্মধর্মরূপে। বেদ-উপনিষদের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্মের সূত্রের সন্ধান করলেন ভারতীয়রা—এবং সে সন্ধান তাঁরা পেলেন-ও।

রজনী পাম দত্ত তাঁর India To-day গ্রন্থে বলেছেন: বৃটিশ-বুর্জোয়া সমাজের সাম্রাজ্যবাদী সংস্পর্শে ভারতবর্ষ না এলেও ভারতে স্বতঃই একটি বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠতো এবং সেই উদীয়মান বুর্জোয়ারা প্রাচীন ভারতের বেদ, উপনিষদ্ ও গীতা থেকেই তাঁদের নৈতিক আদর্শের সূত্র খুঁজে বার করতেন। কথাটি একান্ত সত্য।[১] বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতে এলো, তখন তাদের প্রচারক হিসাবে খ্রীষ্টান মিশনারী এবং পাদ্রিরা-ও এলেন দলে দলে। বৃটিশ-বুর্জোয়াদের সংস্পর্শে এসে ভারতে যেমন একটি হিন্দু-বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল, তেমনি বৃটিশ-বুর্জোয়া-বাহিত খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় বুর্জোয়া ধর্ম-ও গ'ড়ে উঠলো প্রধানত ব্রাহ্ম সমাজের মধ্য দিয়ে এবং ভারতবর্ষে বুর্জোয়া খ্রীষ্টান ধর্ম বৈদিক আকার ধারণ করলো। স্থানীয় বুর্জোয়াদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অর্থনীতি ও রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের জন্ম হোলো, তেমনি ধর্মে-ও দেখা দিলো জাতীয়তাবাদ—যার প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটলো বিবেকানন্দের মধ্যে। বিশ্বের দরবারে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবি করলেন। নবজাত হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ বিশ্বের দরবারে যে-স্থান দাবি করছিল, বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ ধর্মের নামে নিজের অজ্ঞাতে তারই দাবি জানিয়ে এলেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে একদিকে যেমন স্থানীয় বুর্জোয়াদের হোলো জন্ম, তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যও হয়ে উঠলো অসহনীয়। জনসাধারণের সেই হাহাকারও বিবেকানন্দের ধর্মের মধ্যে মূর্তিলাভ করলো। জনসেবাই হোলো তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। তিনি হোলেন 'সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ'—'Vivekananda the Socialist.' কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্ম ছিল যেমন বুর্জোয়া ধর্ম, তাঁর সোস্যালিজ্‌ম্‌ও রইলো তেমনি বুর্জোয়া সোস্যালিজ্‌ম্‌।

এইভাবেই আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করি, সকল সময়েই ধর্মের মধ্যে সেই সময়কার অর্থনীতির প্রতিফলন ঘটে। তাই গান্ধীজী যখন সনাতন ধর্মের সন্ধান করতে লাগলেন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতে কালোপযোগী কয়েকটি নীতি-সূত্রকেই গ্রহণ করলেন মাত্র। এইভাবেই রচিত হোলো তাঁর ধর্ম-নীতি—তাঁর নীতি-ধর্ম।

---

১ অহিংস যোদ্ধা গান্ধী যেমন তাঁর সমর্থন পেয়েছিলেন গীতার মধ্যে, তেমনি সন্ত্রাসবাদীরাও গীতার মধ্যেই পেয়েছিলেন তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস। ভারতবর্ষ যদি কখনো সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে, তখনো সে তার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থন গীতার মধ্যেই পাবে:

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥" (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৭)

কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন যতো সত্বর ও সহজে ঘটে, কোনো গৃহীত ধর্মনীতির পরিবর্তন ততো সহজে সম্ভব হয় না। ফলে যে ধর্মনীতি একদিন কোনো অর্থনৈতিক শক্তির প্রকাশ বা প্রচাররূপে গৃহীত হয়, তা-ই অবিলম্বে তারই অন্তরায় হয়ে ওঠে। তাই আমরা দেখি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ বা পরিণতির ফলে গান্ধীজী স্বাভাবিকভাবে যে ধর্ম-নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে তা-ই নিতান্ত অকার্যকরী হয়ে উঠলো এবং নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি করলো। কারণ, ইতিমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং গান্ধীজীর ধর্মনীতি সেই পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চললো না। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, গান্ধীজী যখন ধর্মানুশীলন শুরু করেছিলেন, তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। তখন ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়ারা বৃটিশের প্রসাদে আপনাদের পুষ্ট করছে, তখনো তারা সহযোগী—এমন কি তখনো তাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অপরিণত সংগ্রামী শক্তিরও জন্ম হয় নি। তাই তারা তখন খ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে বহুল পরিমাণে বেদ, উপনিষদ্ ও গীতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করছে। ধর্ম-সূত্রের মধ্যে ত্যাগের, ক্ষমার, তিতিক্ষার ও সহিষ্ণুতার বাণীকেই গ্রহণ করছে শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ব'লে। কারণ, বৃটিশ শোষকরা তখন প্রায় শতাব্দীকাল ধ'রে একদিকে ভারতবাসীকে বৃটিশ শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করবার জন্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যেমন ত্যাগ, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে নবজাত ভারতীয় বুর্জোয়ারা আত্মপুষ্টির জন্যে বৃটিশ শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণকে শান্ত রাখবার উদ্দেশ্যেও সেই সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ব'লে সহজে ও সানন্দে গ্রহণ করছিল। তাই রাজনীতিতেও আমরা এই সময়ে গোখলে প্রভৃতির মতো 'মডারেট' নেতাদের দেখি; তাঁরা ত্যাগ, ক্ষমা ও মীমাংসার মধ্য দিয়েই ভারতের জনসাধারণের উন্নতির জন্যে বৃটিশের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা দাবি করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামী শক্তি যখন পরে অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়েছে, তখন তারা বুদ্ধের বাণী অপেক্ষা কালীর খড়্গের মধ্যেই তাদের ধর্মকে লক্ষ্য করেছে, গীতার শ্রেষ্ঠ বাণীর সন্ধান পেয়েছে মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যে—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। তাই দুষ্কৃতদের বিনাশে তাদের গোপন আগ্নেয়াস্ত্রগুলি মুখর হয়ে উঠেছে। আত্মা অবিনশ্বর, গীতার এই বাণীই তাদের হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া শক্তির বিকাশ মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের চেয়ে সহযোগিতার মধ্য দিয়েই গ'ড়ে ওঠে। তাই ভারতে ঐ সময়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষাই ধর্মের প্রধান কথা হয়ে উঠেছিল।

গান্ধীজী যখন ধর্মালোচনা শুরু করেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। তাই তিনি ঐ সময়ে আত্মকল্যাণ ও জনকল্যাণের জন্যে পরিপূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ হয়েই গীতার বিষয়াসক্তি-ত্যাগের ও ফলনিরপেক্ষ কর্মের বাণীকেই শ্রেষ্ঠতম ব'লে গ্রহণ করলেন। যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের, তেমনি ভারতীয় বুর্জোয়াদের উপকারার্থে গীতার এই বাণীটিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ, কোটি কোটি জনসাধারণের নিরাসক্ত কর্মের এবং বিষয়াসক্তি-ত্যাগের—অর্থাৎ নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের মধ্যেই তো বিদেশী ও স্বদেশী বুর্জোয়াদের সিদ্ধিলাভ সম্ভব! কিন্তু গান্ধীজী একথা বোঝেন নি। তাঁর মতো প্রতিভার পক্ষেও তা তখন বোঝা সম্ভব ছিল না। কারণ, মানুষ যতোই শক্তিশালী হোক, সে নিজের অর্থনৈতিক সীমাকে কখনো লঙ্ঘন করতে পারে না। প্রতিভা-ও কালের পুতুল মাত্র। সুতরাং গান্ধীজী সেদিন যাকে 'ভৌগোলিক সীমাবিরহিত' ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তা যে তদানীন্তন ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ ছিল, তা বোঝেন নি। তাই তাঁর গীতা-পাঠ নিরপেক্ষ হোলো না। কারণ, এই 'চতুরবয়ব' (four-dimensional) পৃথিবীতে[১] সবই আপেক্ষিক। গান্ধীজীর ধর্মালোচনা-ও তাই নিতান্ত আপেক্ষিক হয়ে রইলো—যদিও তাকে তিনি শাশ্বত ও সনাতন ব'লেই গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য সবাইকেও সেইভাবেই গ্রহণ করাতে চাইলেন। অবশ্য, এ বিষয়ে পাঠকের সতর্ক হ'তে হবে যে, এর মধ্যে গান্ধীজীর কোনোরূপ অসাধুতা বা স্বার্থপরতা ছিল না। তিনি ছিলেন কালের পুতুল মাত্র। না, কালের মুকুর বলা-ও চলে। তাই যখন তিনি নিজের আত্মাকে বা নিজের ধর্মকে সত্য ও সনাতন ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন, তখন তিনি সেই ভুল করেছিলেন, মানুষ আয়নার মধ্যে কোনো বস্তুর প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে যখন তাকেই প্রকৃত বস্তু ব'লে গ্রহণ করে বা প্রচার করে। আয়নার মধ্যে কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি যেমন নিরপেক্ষ নয়, তা প্রতিভাত বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তেমনি কোনো প্রতিভা-ও নিরপেক্ষ নন, তাঁর মধ্যে বিশেষ স্থান ও কালের প্রতিফলন ঘটে মাত্র। আর কেবল সেই মানুষকেই সেই যুগে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ব'লে গ্রহণ করা হয়, যে মানুষের মধ্যে সেই যুগের সর্বাপেক্ষা

---

১ আমরা সচরাচর বিশ্বকে ত্রি-অবয়ব (three-dimensional) মনে করি। এই অবয়বগুলি হোলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা। বিশ্বকে যাঁরা স্থির ও সনাতন ব'লে ভাবেন, তাঁরাই এই তিন অবয়বের প্রচারক। আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, পৃথিবী চতুরবয়ব। এই চারিটি অবয়ব হোলো: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা ও গতি (flux)। আর এই গতিই সমস্ত বিশ্বকে আপেক্ষিক ক'রে তুলেছে, তার সনাতনত্ব গেছে ঘুচে।

পূর্ণতম রূপ আত্মপ্রকাশ করে। তাই সেদিন গান্ধীজী গীতাকে এমনভাবে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা বর্তমানের সংগ্রামী জনসাধারণের কাছে বিকৃত ও সুবিধাবাদী হয়ে উঠেছে। গীতাকে তিনি অহিংস রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গীতার নিস্পৃহ ও নিষ্কাম ধর্ম হিংসাত্মক যুদ্ধেরই প্রচারপত্র হিসাবে একদা আত্মপ্রকাশ করেছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল হিংসাত্মক। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে এই হননকার্য অসম্ভব। ফলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন: "এরা সকলে পূর্ব থেকেই আমার দ্বারা নিহত হয়ে আছে। তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।" অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে তুমি নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে হনন-কার্য সুসম্পন্ন করো। তুমি ঘৃণা ক'রে হত্যা কোরো না বা ভালোবেসে হত্যা থেকে বিরত হোয়ো না—এই নির্লিপ্তি বা non-attachment-ই গীতার মর্মবাণী। কেবল তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেন যে, ধর্মসংস্থাপন এবং দুষ্কৃতের বিনাশের জন্যে তিনি যুগে যুগে জন্মলাভ করেন। 'বিনাশ' কথাটিকে গান্ধীজী তাঁর অহিংসার খাতিরে (সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই) যেমন ভাবেই এড়িয়ে যান বা বিকৃত ব্যাখ্যা করুন না কেন, তা যে বিনাশ, সে বিষয়ে কোনো গীতাধ্যায়ীর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। সুতরাং গান্ধীজীর গীতা-অনুশীলনের মধ্যেও সেই একই কালোপযোগী eclecticism বা চয়নপন্থিতাই আমরা লক্ষ্য করি।

গান্ধীজীর গীতা-পাঠ বা গীতার অনুশীলন যেমন চয়নপন্থী ছিল, তেমনি বুদ্ধদেবের বাণীকেও তিনি পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি। ইংরেজী ভাষার মারফত তিনি প্রথম গীতা পাঠ করেছিলেন। গীতার ইংরেজী অনুবাদগুলির মধ্যে তিনি স্যার এডুইন আর্নল্ডের অনুবাদ 'Songs Celestial'-কেই শ্রেষ্ঠ ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। বুদ্ধের বাণীর প্রথম পাঠও তিনি ইংরেজী কাব্যের মারফতই পেয়েছিলেন। এবং সে-বিষয়ে স্যার এডুইনের কাছেই তিনি ঋণী ছিলেন। স্যার এডুইনের The Light of Asia কাব্যখানিই তাঁকে এ-বিষয়ে প্রভাবিত করে। কিন্তু The Light of Asia গ্রন্থখানি একটি বৃহৎ দোষে দুষ্ট। হিন্দু দেবদেবী এবং হিন্দু উপকথার মধ্য দিয়ে স্যার এডুইন বুদ্ধদেবকে চিত্রিত করছেন। তাই স্যার এডুইনের বুদ্ধ একটি হিন্দু বুদ্ধ বা ভেজাল বুদ্ধে পরিণত হয়েছেন।[১] কিন্তু স্যার এডুইন আর্নল্ড বুদ্ধের যে আসল

১ বাংলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধচরিত' নাটক দ্রষ্টব্য। এই নাটকখানি 'লাইট অব এশিয়ার' প্রভাবে রচিত। তাই সেখানেও আমরা বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্মের অবতার রূপেই দেখি। গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য' নাটকখানিও লক্ষণীয়। যে শঙ্করাচার্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী, এমন কি দ্বৈতবাদে-ও (Dualism) ঘোরতর অবিশ্বাসী, তাঁকেও গিরিশচন্দ্র বহুদৈবিক (polytheistic) এক হিন্দুধর্মের মহাদেবের অবতাররূপে চিত্রিত করতে কুণ্ঠিত হন নি।

রূপটিকে তাঁর কাব্যে বজায় রাখতে পেরেছিলেন, গান্ধীজী তাকেও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। বুদ্ধদেবের সেই পরমতম প্রশ্ন :

"I would not let one cry
Whom I could save! How can it be that Brahma
Would make a world and keep it miserable,
Since, if all-powerful, he leaves it so,
He is not good, and if not powerful,
He is not God?"

বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেছিলেন :

আমার সাধ্য থাকতে আমি তো একটিমাত্র প্রাণীকেও কাঁদতে দেবো না। অথচ এ কেমন ক'রে সম্ভব যে, ব্রহ্ম এই বিশ্বের সৃষ্টি ক'রে তাকে দুঃখ-বেদনায় পূর্ণ ক'রে রেখেছেন? কারণ, তিনি যদি সর্বশক্তিমান্ হন, আর বিশ্বের এই দুঃখ-বেদনার প্রতিকার না করেন, তবে তিনি মঙ্গলময় নন। আর যদি তিনি সর্বশক্তিমান্ না হন, তবে তিনি কেমন ভগবান?···

ব্রহ্ম সম্পর্কে এই প্রশ্ন বুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর তথাগত বুদ্ধও যেমন দিতে পারেন নি, আধুনিকতম কোনো ধর্মপ্রচারকও তেমনি দেন না। বিশ্বের বেদনাকে তাঁরা বলেন ভগবানের লীলা এবং এমনিভাবেই মানুষের হাতে গড়া দুঃখ ও দারিদ্র্যকে তাঁরা চিরন্তন লোক-রহস্যের অতীত ব'লেই ঘোষণা করেন এবং শোষণকে, পীড়নকে একটি বিবেকসংগত ন্যায্যতা লাভের সুযোগ দেন। কিন্তু কেবল মানুষের বেদনায় নয়, সমস্ত প্রাণজগতের বেদনাতেই বুদ্ধের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল। তিনি পৃথিবী থেকে বেদনাকে বিদূরিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ভগবানের লীলায় বিশ্বাস করেন নি, উপদেশ দিয়েছিলেন :

ব্রহ্মের বা ব্রহ্মের মধ্যে সৃজনারম্ভের সন্ধান কোরো না। ব্রহ্মকেও পাবে না, কোনো জ্ঞানও লাভ করবে না।

"Look not for Brahma and the Beginning there!
Nor him, nor any light."

কারণ, বুদ্ধ বলেন, যতোই পর্দার পর পর্দা তুলবে, ততোই দেখবে পর্দার পর আরো পর্দা রয়েছে :

"Veil after veil will lift—but there must be
Veil upon veil behind."

তাই বুদ্ধদেব সৃষ্টির আদি সম্পর্কে ব্যস্ত হন না; অনাদি ব্রহ্মের সম্পর্কে

জ্ঞানলাভের জন্যেও বড়ো একটা চিন্তিত নন। তাঁর চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে, ভবিষ্যৎকে নিয়ে। তিনি বলেন: যখন জীবন-মৃত্যু রয়েছে, রয়েছে আনন্দ-বেদনা, কার্য-কারণ, কাল-স্রোত—তখন সেগুলিই কি যথেষ্ট নয়? কী প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানে, সৃজনারম্ভের তথ্যে?

"This is enough
That life and death and joy and woe betide,
And cause and sequence, and the course of time."

তাই বুদ্ধদেব ভগবান সম্পর্কে নীরব থাকেন। কিন্তু গান্ধীজী হিন্দু ধর্মের প্রভাবমুক্ত হ'তে পারেন নি। তিনি ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁর সমস্ত কাজেই তিনি ভগবানের নির্দেশ চান, ভগবানের কাছে করেন অবিরত প্রার্থনা। প্রার্থনা তাঁর কাছে ভিক্ষামাত্র নয়। আত্মশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান—অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প।[১] কিন্তু বুদ্ধদেব বলেন:

প্রার্থনা কোরো না। অন্ধকার আলোকিত হয় না। যা নীরব, তাকে প্রশ্ন কোরো না। নৈঃশব্দ্য বাক্‌শক্তিহীন।

"Pray not! the Darkness will not brighten! Ask
Nought from silence, for it cannot speak!"

জীবন সম্পর্কে বুদ্ধদেব ছিলেন অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী। তাঁর কথা আধুনিক শোপেনহাউএরকে অনেকক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবন ও মৃত্যু তাঁর কাছে এক সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বেদনার ইতিহাস মাত্র। এখানে সকল আনন্দই অলীক, সকল দুঃখই সত্য। আনন্দের পরিণতি যন্ত্রণায়, যৌবনের বার্ধক্যে, প্রেমের বিরহে, প্রাণের নিষ্প্রাণ মৃত্যুতে। কেবল তাই নয়, মৃত্যুতেই এ জীবনের শেষ হয় না। মৃত্যুর পর মৃত্যুর পথ বয়ে আসে অসংখ্য জীবন। আর এইভাবেই জীবনের চক্র অসত্য আনন্দ এবং সত্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিরবধি ঘূর্ণিত হ'তে থাকে।[২] তাই

---

১ **"But my faith is increasing in the efficacy of silent prayer. It is itself an art—perhaps the highest art requiring the most refined diligence."—Gandhi.**

মহম্মদও বলেন, পৃথিবীতে তিনটি বস্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়: শিশু, নারী ও প্রার্থনা। শিশুও গান্ধীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তবে, নারী সম্পর্কে কথাটা অবশ্য আলাদা।

২ **"...Pleasures end in pain, and youth in age,
And love in loss, and life in hateful death,
And death in unknown lives which will but yoke
Men to their wheel again to wheel the round
Of false delights and woes that are not false."**

বুদ্ধদেব পৃথিবীর বিপুল বেদনায় কাতর হয়ে ওঠেন, অনুভব করেন পার্থিব আনন্দের অসারতা, উচ্চ-নীচ সকল প্রাণীর অসহ্য আর্ততা।

"...I see, I feel
The vastness of the agony of earth,
The vainness of its joys, the mockery
Of all its best, the anguish of its worst...."

পৌরাণিক হিন্দু বা খ্রীষ্টান ধর্মীর জীবনে ভবিষ্যতের স্বর্গ আছে। মুসলমানের জীবনেও তাই। কিন্তু বৌদ্ধের জীবনে স্বর্গ নেই—আছে নির্বাণ। সেখানে দীপ-শিখা নির্বাপিত হয়। সেখানে কোনো সুন্দরতর লোকে জীবনাগ্নি সুন্দরতর হয়ে উদ্দীপিত হয় না। সেখানে জীবনের শেষে মহাজীবনের সম্ভাবনা নেই—আছে জীবনের মহানির্বাপণ।

বৌদ্ধদের মতে, জীবন দুঃখময়, বেদনাময়। কিন্তু, তাঁদের কাছে জীবনেরও মূল্য আছে। কারণ, এই জীবনের পথেই নির্বাণের লক্ষ্যে জীবকে অগ্রসর হ'তে হবে। বুদ্ধদেব বলেন, সকল জীবই সেই এক নির্বাণ পথের যাত্রী। তাই তিনি উপদেশ দেন, জীবহত্যা কোরো না। কেননা, জীবহত্যার দ্বারা জীবকে তার নির্বাণের যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত করা হয়। উদ্বর্তনবাদীরাও বলেন, এক পরম লক্ষ্যের পানে সমগ্র জীবলোক অহরহ আবর্তিত হচ্ছে।[১] কিন্তু প্রাচীন বুদ্ধদেবের মতের সঙ্গে আধুনিক উদ্বর্তনবাদীদের মতের মূল পার্থক্য তিনটি:

প্রথমত, তাঁদের কাছে জীবন কেবল দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ নয়; আনন্দ-উল্লাসও আছে – যা দুঃখ-বেদনার মতোই সম্পূর্ণ সত্য। দ্বিতীয়ত, তাঁদের মতে জীবের উদ্বর্তন অবিরাম উর্ধ্বতর লোকেই ঘটছে। অন্য পক্ষে, বুদ্ধদেবের মতে, নির্বাণ-লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবন নিরন্তর নিম্ন থেকে উচ্চে এবং উচ্চ থেকে নিম্নে আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি জীবের যাত্রা নির্বাণের উদ্দেশ্যে। এই যাত্রা-পথে জীব আপন কর্মফলে পরজন্মে কখনো নিম্নতর জীবনে প্রত্যাবর্তন করে, কখনো বা উচ্চতর জীবনে উন্নীত হয়। আর এইভাবেই "The wheel of birth and death turns low and high." তৃতীয়ত, উদ্বর্তনবাদীরাও জীবের পরজন্মে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে-পরজন্মলাভ ব্যক্তিগতভাবে ঘটে না, ঘটে সমাজগতভাবে। মানবসমাজ উদ্বর্তনের ফলে মানবোত্তর সমাজে উদ্বর্তিত হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত মানব কর্মের অধিকারী হিসাবে ব্যক্তিগত-ভাবে ভবিষ্যৎ সমাজে উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। কারণ, মৃত্যুতেই ব্যক্তির শেষ।

[১] তাই বার্নার্ড শ-ও জীবহত্যার বিরোধী, নিরামিষাশী।

গান্ধীজী উদ্‌বর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বুদ্ধের জীবনচক্রে বিশ্বাসী[১], আবার বুদ্ধদেবের জীবনচক্রেও তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী নন। পৌরাণিক হিন্দু, খ্রীষ্টান বা মুসলমানের মতোই তিনি ছিলেন স্বর্গে বিশ্বাসী। যাই হোক, ব্যক্তিগত পরজন্মে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি সমাজের অপেক্ষা ব্যক্তির উপরেই অনেক বেশি নির্ভরশীল। যে অর্থনীতি সমাজবিরোধী ব্যষ্টিবাদকে সমাজের পক্ষে চূড়ান্ত শ্রেয় ব'লে বর্ণনা করে, সেই অর্থনীতির আশ্রয়ে থেকে ধর্মচর্চার ফলে ব্যক্তিগত পরজন্মে বিশ্বাসী হওয়াও নিতান্ত অবান্তর নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত পরজন্মে বা উদ্‌বর্তনে বিশ্বাসী হ'লে এবং সেই বিশ্বাসকে কার্যত প্রয়োগের চেষ্টা করলে চাই পূর্ণতম জীবন—যে জীবনে শ্রেয় কর্ম সাধনের অবাধ সুযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে সকলের। সুতরাং ব্যষ্টিতে পরম বিশ্বাসী বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং গান্ধীকে সমাজেই ফিরে আসতে হয় অবশেষে। বুদ্ধ প্রচার করেন করুণার বাণী, দেন সংঘ-জীবন পালনের উপদেশ; নাজারেথের ছুতোর মিস্ত্রী যিশু হয়ে ওঠেন সমাজতন্ত্রী; গান্ধী বলেন, তিনিও 'কমিউনিস্ট'। কিন্তু এঁদের কাছে ব্যক্তি মুখ্য, সমাজ গৌণ। আবার, পরজন্মে ও পরলোকে তাঁরা বিশ্বাসী। তাই পার্থিব বা বর্তমান জীবনে তাঁদের অবিশ্বাস; পার্থিব তাঁদের কাছে অপার্থিবের সোপান মাত্র, বর্তমান অবর্তমানের। তাই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও গান্ধী করুণার বাণী প্রচার করেন, কারণ, জীবের হননে জীবের ব্যক্তিগত কর্মের সুযোগ দূরীভূত হয়। প্রতিটি জীবকে সুযোগ দিতে হ'লে চাই হত্যায় বিরতি—চাই অহিংসা, করুণা। এখানেও আমরা লক্ষ্য করি, এই করুণা ও অহিংসা উপায় মাত্র। কিন্তু গান্ধীজীর বেলায় যেমন তাঁর উপায় তাঁর ধর্মে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমনি হয়েছিল বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের জীবনেও। গান্ধীজীর মতোই করুণা ও অহিংসা বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ধর্ম হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্ট বলেছিলেন: "all they that take the sword should perish with sword." (Matt. xxvi, 52)

অস্ত্রেই অস্ত্রধারীর মৃত্যু ঘটে।[২] করুণাশীলই লাভ করেন করুণা: "Blessed

১ "আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না। কিন্তু পুনরায় যদি জন্মগ্রহণ করি, তবে যেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই জন্মি। তাহাতে আমি তাহাদের অসুবিধার অংশ গ্রহণ করিতে পারিব। তাহাদের মুক্তির জন্য পরিশ্রম করিবার সুযোগ পাইব।"—গান্ধী, (১৭ই এপ্রিল, ১৯২১)

২ অবশ্য, গান্ধীজী অস্ত্রধারণ না করলেও অস্ত্রাঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। যিশু খ্রীষ্টেরও অপঘাত ঘটেছিল। অস্ত্রধারণ সম্পর্কে গান্ধীজী শ্রমিকদের যে উপদেশ দেন, তা যে যিশু খ্রীষ্টেরই মুখামৃত, তা অতি সহজেই বলা চলে। গান্ধীজী শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ত্যাগ করতে বলেন:

"To use violence for securing rights may seem an easy path, but it proves to be

are the merciful, for they shall obtain mercy." (Matt. v, 7) এড্‌উইন আর্নল্ডের বুদ্ধ-ও[১] বলেন ওই একই কথা: "mercy cometh to the merciful." (The Light of Asia, Book v.)

কেবল অহিংসা ও করুণার দিক থেকেই নয়,—আরো বহুদিক থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব গান্ধীজীর উপর অত্যন্ত বেশি ছিল। অবশ্য, ভগবান সম্পর্কে বুদ্ধের মতামত গান্ধীজীকে আদৌ চিন্তিত করে নি। ভগবানের কথা বাদ দিলেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের আরো বহু আদেশ পালন ক'রে চলতেন। এখানে সেগুলির প্রধান দু'টি উল্লেখ করা চলে।

স্যার এড্‌উইনের বুদ্ধ বলেন:

"Govern thy lips
As they were palace-doors, the king within.
Tranquil and fair and courteous be all words"...

গান্ধীজীর মৌন এবং বাক্‌সংযম জগৎবিখ্যাত। ভাষণ এবং আলাপনের মধ্যেও তাঁর প্রশান্ত ভাবটি চিরকালই অতুলনীয় ছিল।

মাদকদ্রব্য সম্পর্কে গান্ধীজীর এবং টলস্টয়ের মতামত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বুদ্ধের নিম্নলিখিত উপদেশটিও গান্ধীজীর উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা-ও বলা যায়:

"Shun drugs and drinks which work the wits abuse,
Clear minds, clean bodies need no Soma Juice."[২]

---

throny in the long run. Those who live by sword die also by sword. The swimmer often dies by drowning.' (Young India, p. 728)

অস্ত্র-বিদ্বেষী গান্ধীজীর আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যু হয়েছে এ যেমন সত্য, এই সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীতে সাঁতার-না-জানা মানুষরাই যে জলে ডুবে বেশী মরে, তাও তেমনি সত্য। আপনি সাঁতার শিখবেন না, সুতরাং জলের পাশে যাবেন না, কিন্তু জল আপনার কাছে আসবে। আপনার সাঁতার না শেখার জাদুমন্ত্র আপনাকে জলোচ্ছ্বাস প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আপনি অস্ত্রধারণ করবেন না, কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র নিরস্ত্র থাকবে না। এণ্ড্রোক্লিসের উপকথায় গান্ধীজী বিশ্বাস করতে পারেন—তিনি সাপ পোষার ব্যবস্থাও করেছিলেন তাঁর আশ্রমে, কিন্তু মানুষ-বাঘের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি। সশস্ত্ররা অস্ত্রে মরে, সন্তরণবীরেরা প্লাবনে ভেসে যায়, এ কথা সত্য; কিন্তু নিরস্ত্ররা যে অস্ত্রাঘাতে মরে, সন্তরণ-বিরোধীরা যে স্নান করতে গিয়ে মারা পড়ে, এই সত্যকে লক্ষ্য না করার মধ্যেই আছে গান্ধীজীর একদর্শিতা—বলতে পারেন প্রতিভা!

১ অবশ্য আর্নল্ড মূলত অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত' অবলম্বনেই তাঁর Light of Asia রচনা করেছিলেন।

২ এই কথাগুলি সহজেই বার্নার্ড শ-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি তাঁর পান-বিরোধিতা সম্পর্কে মিসেস

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের তুলনা ক'রে গান্ধীজী বৌদ্ধধর্মের অহিংসাকে ব্যাপকতর মনে করেছিলেন। গান্ধীজী বলেন, বুদ্ধদেবের প্রেম ও অহিংসা সকল প্রাণীতেই ছিল প্রসারিত।[১] কিন্তু খ্রীষ্টের প্রেম ও অহিংসা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মনুষ্য জাতির মধ্যে। খ্রীষ্ট মৎস্যাহার বা মাংসাহারের বিরোধী ছিলেন না। নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত তাঁর জীবন-কাহিনীগুলিতে তাঁর সশিষ্য আমিষ-ভোজনের উল্লেখ আছে।[২]

কেবল খাদ্য সম্পর্কেই যে খ্রীষ্ট সহিংস ছিলেন, তা নয়। তাঁর ভগবান সম্পর্কিত ধারণাটিকেও যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর ভগবান কারুণিক পরম পুরুষ নন। নিউ টেস্টামেণ্টে কথিত খ্রীষ্টের বাণী এবং কাহিনীগুলিতে যে-ভগবানের বর্ণনা আছে, তা দণ্ডদাতা, কঠোর, প্রতিহিংসাপরায়ণ বিধাতা এবং অনেক ক্ষেত্রে জেহোভার সঙ্গে তাঁর বড়ো-একটা পার্থক্য নেই। তিনি সকলকে করুণা করেন না। তিনি পাপীকে দেন শাস্তি, সাধুকে দেন পুরস্কার। তিনি বিচারক ভগবান, প্রলয়কালে তিনি সাধুকে রক্ষা করেন, দুষ্কৃতকে দণ্ড দেন।

"Then shall two be in the field ; the one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left." (Matt. xxiv, 40, 41)

"দুইজন লোক ক্ষেতে কাজ করবে। একজনকে তিনি (ভগবান) গ্রহণ করবেন, অপরজনকে করবেন পরিত্যাগ। দুইজন মেয়ে জাঁতায় কাজ করবে, তাদের একজনকে তিনি গ্রহণ করবেন, অপরজনকে করবেন পরিত্যাগ।"

চার্চিলকে (উইনস্টন চার্চিলের মাকে) যা বলেছিলেন, সে যেন এ কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি। মিঃ চার্চিল-রচিত 'Great Contemporaries' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১ বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই জীবে দয়ার ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এই ধর্মের প্রথম প্রচারক ছিলেন জৈনধর্মের আদিগুরু ঋষভ দেব। তাঁকে আদিনাথ-ও বলা হয়। আদিনাথ ঋষভদেবের অধস্তন ২৩শ তীর্থংকর মহাবীর ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। গান্ধীজীর জন্মস্থান গুজরাটে এই জৈনধর্মের প্রভাব আজো প্রচুর রয়েছে।

২ এই বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠা দেখুন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নিরামিষ ভোজনের সমর্থনে গান্ধীজী হাউয়ার্ড উইলিয়াম্‌সের লেখা 'আহার-নীতি' বা Ethics of Diet নামক বইখানি পড়েন। এই বইখানিতে যিশু যে নিরামিষাশী ছিলেন, তা প্রমাণ করবার চেষ্টাও ছিল ব'লে গান্ধীজী বলেছেন। দুঃখের বিষয়, এই বইখানি আমি সংগ্রহ করতে পারি নি। সুতরাং মিঃ উইলিয়াম্‌স্ কি তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তা জানবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। যাই হোক, গান্ধীজী হাউয়ার্ড উইলিয়াম্‌সের যুক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন, এমন আমি মনে করি না। মানুষের মধ্যেই যিশুর অহিংসা এবং করুণা সীমাবদ্ধ ছিল, গান্ধীজীর এই সমালোচনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

"I tell you, in that night there shall be two men in one bed ; the one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together ; the one shall be taken, and the other shall be left. Two men shall be in the field ; the one shall be taken, and the other left." (Luke xvii, 34, 35, 36.)

"আমি তোমাদের বলছি, সেই রাত্রিতে দু'জন একই শয্যায় শায়িত থাকবে ; তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপরজন হবে পরিত্যক্ত। দু'টি মেয়ে একই জাঁতায় কাজ করবে, তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপরজন হবে পরিত্যক্ত। দুটি পুরুষ মাঠে কাজ করবে ; তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপরজন হবে পরিত্যক্ত।"

খ্রীষ্ট তাঁর রূপক কাহিনীগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে ভগবানের সঙ্গে মনিবের এবং মানুষের সঙ্গে অলস বা অবিশ্বস্ত ভৃত্যের তুলনা করছেন। এই মনিবটিকে আমরা প্রায়ই কঠোর এবং সূক্ষ্মবিচারপরায়ণ রূপেই দেখি। তাছাড়া, নিউ টেস্টামেণ্টে একটি সতর্কবাণী প্রায়ই দেখা যায় : "there shall be weeping and gnashing of teeth." খ্রীষ্টের যিনি ভগবান, তাঁর রাজ্যে সকলের স্থান নেই। কেবল সাধু এবং সজ্জনই সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তাই তাঁর আদেশ, উপদেশ : সাধু হও, সজ্জন হও, নিঃসম্বল হও, আপনাকে বিনত করো, ত্যাগ করো।

কিন্তু খ্রীষ্ট যখন মানুষের কল্যাণের (এই কল্যাণ মূলত পারলৌকিক) জন্যে ভগবানের কঠোর বিচারের ভয় দেখাতেন, তখন বুদ্ধ আশ্রয় নিতেন পরজন্মের। কারণ, ভগবান সম্পর্কে বুদ্ধ ছিলেন নীরব ; সর্বশক্তিমান্ হয়েও ভগবান পৃথিবীকে দুঃখে-গ্লানিতে, বেদনায় পূর্ণ রেখেছেন, এ যেমন তিনি ভাবতে পারতেন না, তেমনি একথাও তাঁর কল্পনাতীত ছিল যে, ভগবান সর্বজ্ঞ হয়ে, জীবের সর্বকর্মের অধিনায়ক হয়ে, কৃতকর্মের জন্যে জীবকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন। তাই এই দুর্জ্ঞেয়কে তিনি জানতে চান নি। তাই জীবন-চক্রের উত্থান-পতনই তাঁর কাছে স্বর্গ ও নরক হয়ে উঠেছে—পারলৌকিক জীবন তাঁর কাম্য ছিল না, জীবনের চির-নির্বাপণই ছিল তাঁর চির লক্ষ্য। তাই বুদ্ধ যখন মানুষকে পরজন্মের ধমক দিচ্ছেন, তখন খ্রীষ্ট দিচ্ছেন নরকাগ্নির,—দণ্ডদাতা বিধাতার কঠোর দণ্ডের। জন্মান্তরের বিষয়ে খ্রীষ্টের কোনো উদ্বেগও ছিল না। কারণ, তাঁর কাছে কেয়ামতের বিচারের মুহূর্ত ছিল আসন্ন। তাঁর সমসাময়িকদের জীবিতকালেই যে পৃথিবীতে 'রামরাজ্য' (Kingdom of God) প্রতিষ্ঠিত হবে, এবিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না। কারণ, তাই ছিল তাঁর পূর্ববর্তী ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী। সুতরাং জন্মান্তর সম্পর্কে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ছিল না খ্রীষ্টের। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন :

"But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God." (Luke ix, 27.)

"আমি তোমাদের একটি সত্য জানিয়ে রাখি, এখানে এমন অনেকে আছে যারা তাদের মৃত্যু আসবার আগেই পৃথিবীতে বিধাতার সাম্রাজ্য দেখে যাবে।"

"Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled." (Luke xxi, 32)

"আমি তোমাদের সত্যই বলছি, বর্তমান পুরুষ বিগত হবার পূর্বেই সমস্ত কিছু পূর্ণ হবে। (অর্থাৎ, বিধাতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।)

কিন্তু গান্ধীজী হিন্দুধর্মের আওতায় মানুষ, যে হিন্দুধর্ম অদ্বৈত থেকে বহুদৈবিক, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন থেকে শৈব, শাক্ত—সকল প্রকার স্বতঃবিরুদ্ধ মতবাদকে নির্বিকারভাবে আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং বুদ্ধের জীবনচক্রে এবং খ্রীষ্টেব কেয়ামতে একই সঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে ওঠা গান্ধীজীর পক্ষে বিন্দুমাত্রও অসম্ভব ছিল না। খ্রীষ্টের মতোই[১] গান্ধীজীকে একটি বিচারপরায়ণ কঠোর সূক্ষ্মদর্শী ভগবানে বিশ্বাসী ব'লে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনা আমাদের সহজে মনে পড়ে। বিহার ভূমিকম্পের সময়ে যখন বহু নরনারী এবং শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হোলো, তখন গান্ধীজী ঘোষণা করলেন: পাপ। মানুষেব পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। রবীন্দ্রনাথ তখন গান্ধীজীর এই উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন, "কিন্তু কি পাপ করলো শিশুরা?"[২] এই যুক্তিই গান্ধীজীর উক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিল।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের মতোই একটি ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দু শতাব্দী আগে। ইউরোপে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে যখন ভূমিকম্প হোলো, তখন

১ আবার কখনো যিশু তাঁর ভগবানকে বিচারবিহীন অবারিত করুণার মহত্ত্বেও ভূষিত করেছেন:

"...he (God) maketh his sun to rise on the evil and on the good and sendeth rain on the just and on the unjust." (Matt. v, 45)

গান্ধীজীর মধ্যেও তাঁর ভগবান সম্পর্কে এই স্বতবিরুদ্ধ উক্তি প্রায়ই দেখা যায়।

২ এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ করুন। সেগুলি যেন খ্রীষ্টান গান্ধীর কথাগুলির তীব্র প্রতিবাদ করে:

"Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell and slew them, think ye that they are sinners above all men that dwelt in Jerusalem?" (Luke XIII, 4)

"কিংবা সিলোমের মিনার ভেঙে পড়ায় যে আঠারো জনের মৃত্যু ঘটলো, তোমরা কি ভাবো, জেরুসালেমে যতো পাপী ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাপী ছিল তারাই?"

যুক্তিবাদী ভল্‌তের পৃথিবীতে ভগবানের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি প'ড়ে ফরাসী দার্শনিক রুশো ভল্‌তেরকে বিদ্রূপ ক'রে বলেন : "Voltaire in seeming always to Lelieve in God, never really believes in anybody but the devil."

খ্রীষ্টের ভগবানের মতোই গান্ধীজীর ভগবানও যেমন বিচারপরায়ণ, কঠোর, দণ্ডদাতা, আবার তেমনি ক্ষমাশীল, পরম কারুণিক-ও। তিনি যেমন অতি সহজে অপরাধ নেন, রাগ করেন, শাস্তি দেন, তেমনি অতি সহজেই আবার খুশীও হয়ে ওঠেন। ভারতীয় মেয়েরা যদি মাঞ্চেস্টারে তৈরি ফিনফিনে শাড়ির বদলে মোটা ধবধবে খদ্দরের শাড়ি পরেন, তাতে গান্ধীজীর ভগবানের আনন্দের আর সীমা থাকে না! গান্ধীজী মেয়েদের উপদেশ দিয়ে বলেন :

"Certainly God will be pleased with those who wear the spotless Khadi Sari, as symbol of the inner purity than with those who are gaudily dressed."[১]

এই কথাগুলির মধ্যে আমরা এ-ও লক্ষ্য করি যে, গান্ধীজীর এই ভগবান সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। অনেকখানি ইস্রায়েল-বংশীয়দের কল্পিত ভগবানের মতোই।[২]

তাই গান্ধীজীর ভগবানকে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, আমার কিংবা আপনার দাদামশায়ের মতো। বৃদ্ধ মানুষ; স্নেহশীল; তবে মেজাজটি বড় রুক্ষ।

১ টলস্টয়ের উক্তি সহজেই মনে পড়ে। তিনি বলেন : Dirt is God's worship. অপরিচ্ছন্নতাই ভগবানকে খুশী করে। কারণ, কৃষক ও শ্রমিকরা সর্বদাই অপরিচ্ছন্ন থাকে। পরিশ্রম করা এবং পরিচ্ছন্ন থাকা একই সঙ্গে মানুষের কপালে ঘটে না। অথচ পরিশ্রমই ভগবানের পূজা; সুতরাং অপরিচ্ছন্নতাও ভগবানের পূজা। গান্ধীজীর কথাগুলির মধ্যে spotless কথাটি লক্ষণীয়।

২ গান্ধীজীর জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাঁর আন্তর্জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব ও আপস যেমন লক্ষণীয়, তাঁর ধর্ম ও ভগবান সম্পর্কে ধারণার মধ্যেও তেমনি। জুডিয়া তখন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকার ফলে খ্রীষ্টের ধর্ম ইস্রায়েল-বংশীয়দের মতো গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ছিল না। তা বহুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্ট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি ইস্রায়েল-বংশীয় পাপীদের উদ্ধারের জন্যেই আসিনি।" "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." (Matt. XV, 24). গান্ধীজীর কালে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাঁর ভগবানও আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন। গড্, আল্লাহ্, মাজ্দা, কৃষ্ণ, রাম—সব একত্রে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরও তিনি ছিলেন অধিনায়ক! তাঁর ধর্মে সেই জাতীয়তাবাদেরও প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর ভগবান তাই মাঞ্চেস্টারে তৈরী কাপড়ের চেয়ে চরকার কাটা সুতোয় তৈরী কাপড়ে বেশী খুশী।

বার্ধক্যের দোষ। নাতনী সাদাসিদে পোশাক পরলে তিনি খুশী হন; আবার যদি নাতনী তাঁর বন্ধুর পানে মৃদু হেসে আড় চোখে একটু তাকান, তবেই আর রক্ষা থাকে না।

ভগবান সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা জন্মাবার জন্যে আমাদের শৈশবই দায়ী। ভগবান সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণাটিও শৈশবেই গ'ড়ে উঠেছিল। আর সেই ধারণাকে তাঁর অন্যান্য বহু ধারণার মতোই পরবর্তী জীবনে তিনি কেবল পুষ্ট করেছিলেন, বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন নি।

গান্ধীজী বহুবার স্বীকার করেছিলেন যে, বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব-বিস্তার করেছিল। সেকথা অত্যন্ত সত্য। নিউ টেস্টামেণ্ট তাঁর জীবনের নিত্য সহচরও ছিল। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থকে তিনি এইভাবে অনুসরণ করেন নি।[১] তিনি বলেন: "জীবনে আমার এমন অনেক সময় এসেছে, যখন বুঝতে পারি নি, কি আমার কর্তব্য। তখনই আমি বাইবেলের আশ্রয় নিয়েছি। বিশেষত, নিউ টেস্টামেণ্টের। এবং বাইবেলের বাণী থেকেই আমি শক্তি সংগ্রহ করেছি।"[২]

সুতরাং গান্ধীজীর জীবনে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব সত্যি কতোখানি ছিল, তার সন্ধান ও বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। সর্বপ্রথমে একথা উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী খ্রীষ্টধর্ম থেকে যে বাণী বা নীতিসূত্রগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি গীতা বা বৌদ্ধধর্ম থেকে তাঁর সংগৃহীত বাণী ও নীতিসূত্রের মতোই ছিল আংশিক এবং চয়নপন্থী। খ্রীষ্টের জীবনেতিহাস এবং বিভিন্ন বাণী তাঁর চারজন মূল জীবনীকারের লেখা চারটি জীবনীতে 'সংরক্ষিত' আছে। এই জীবনীকারদের নাম সেণ্ট ম্যাটিউ, সেণ্ট মার্ক, সেণ্ট লিউক এবং সেণ্ট জন। কিন্তু চারজন জীবনীকার-কথিত খ্রীষ্টের চারটি জীবনী বহুক্ষেত্রে এমন ভিন্নরূপ যে, সেগুলিকে নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য বা সত্যের মর্যাদা দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠাবোধ হয়। ইতিহাসের চেয়ে সংকলিত জনশ্রুতি ব'লেই সহজে মনে হয় সেগুলিকে। তাই বুঝি সেগুলিতে অধিকাংশ ঘটনার স্থান, কাল ও বিবরণ ভিন্নরূপ দেখা যায়। কেবল তাই নয়, এই জীবনীগুলিতে অলৌকিক ঘটনার বিবরণী এতো বেশি যে, সেগুলির মধ্যে সত্যিকার মানুষ যিশু অতি সহজেই

১ রেভারেণ্ড হোম্‌স্ বলেন: "But when I think of Gandhi, I think of Jesus Christ. He lives his life, he speaks his words, he suffers, strives, and will some day nobly die, for his kingdom upon earth."

২ "There have been many times when I did not know which way to turn. But I have gone to the Bible, and particularly the New Testament, and have drawn strength from its message."—'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিত এস. ডব্লিউ. ক্লেম্‌সের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

হারিয়ে যান। বাস্তবিকপক্ষে, মানুষ যিশুকে গোপন ক'রে তাঁকে অলৌকিক ক'রে তোলার একটি গভীর বাসনাও এই জীবনীগুলির পশ্চাতে কেবলই সারাক্ষণ উঁকি দিতে থাকে। সেণ্ট জন তাঁর খ্রীষ্টের জীবনীতে এই উদ্দেশ্যকে গোপন করবার কোনো চেষ্টা-ও করেন নি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন :

"But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God…" (St. John, XX, 31)

তাই খ্রীষ্টের এই চারিটি জীবনীই পরিণত হয়েছে অলৌকিকতার অরণ্যে। সেখানে লৌকিক খ্রীষ্টকে সন্ধান করা পরম দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষরা যখন যুক্তিবাদী হয়ে উঠলেন, তখন তাঁরা এই জীবনীগুলিকে ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সহকারে 'ঐতিহাসিক' এবং 'যুক্তিসম্মত' ক'রে তুলতে চাইলেন। তাঁরা যে কেবল অলৌকিকের চেয়ে লৌকিককে এবং অপার্থিবের চেয়ে পার্থিবকে প্রাধান্য দিলেন তাই নয়, তাঁরা খ্রীষ্টের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ও বাণীর উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে সেগুলিকে স্ব স্ব কালের উপযোগী এবং স্ব স্ব যুক্তির সমর্থক হিসাবেই প্রচার করলেন। এঁদের মধ্যে রেনাঁ, ভল্‌তের, টমাস পেইন, টলস্টয় এবং বার্নার্ড শ'র কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এঁরা সবাই খ্রীষ্টকে 'ঐতিহাসিক' করবার নামে নিজেদেব কালের ইতিহাসকে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন মাত্র। খ্রীষ্টের মূল জীবনী চারটিতেই খ্রীষ্টের এমন সমস্ত বাণী 'সংরক্ষিত' আছে, যেগুলি স্বতবিরোধী। তাই আধুনিক যুক্তিবাদী লেখকরা খ্রীষ্টের জীবনী লিখতে গিয়ে এই স্বতবিরোধী বাণীগুলির কতকগুলিকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং বাকীগুলিকে সন্দেহের সঙ্গে পরিত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টকে স্বতবিরুদ্ধতার হাত থেকে 'নিষ্কৃতি' দিয়েছেন। তাঁরা এইভাবে খ্রীষ্টের জীবনের মধ্যে 'লজিক' খুঁজতে চেষ্টা ক'রে সৃষ্টি করেছেন এক-একটি 'লজিক্যাল' খ্রীষ্ট। সুতরাং তাঁদের সৃষ্ট খ্রীষ্ট তাঁদের কালের উপযোগী হ'লেও যে সম্পূর্ণ বা সত্যিকার খ্রীষ্ট হন নি, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু বস্তুত, খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীতে যে স্বতবিরুদ্ধতা দেখা যায়, সেই স্বতবিরুদ্ধতা তাঁর এককালীন অস্তিত্বের নির্ভুল প্রমাণ মাত্র। দ্বন্দ্বময়, শ্রেণীময় সমাজে থেকে তিনি যে-জীবন যাপন করেছিলেন, যে-দর্শন প্রচার করেছিলেন, তা স্বতবিরুদ্ধ না হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক। গান্ধীজী যদি সেই যুগের মানুষ হ'তেন, যখন রচনা-শিল্পের বা তথ্যের দিক থেকে ইতিহাস এমন উন্নত হয় নি, তবে গান্ধীজীর জীবন ও বাণীও এই তথাকথিত যুক্তিবাদীদের বিভ্রান্ত ক'রে দিতে যথেষ্ট ছিল। গান্ধীজীকে আমরা যখন তাঁর দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করি,

তখন তাঁর কার্যে ও বাণীতে অনেক সময় এমন স্বতবিরুদ্ধতা দেখি যে, হাজারো বছর বাদে মানুষ তাঁকে 'অনৈতিহাসিক' ব'লে ভাবতে পারেন। তখন তাঁরাও হয়তো গান্ধীজীর স্বতবিরুদ্ধ কাজ ও কথাগুলিকে ঝেড়ে-মুছে একটি 'ঐতিহাসিক এবং যুক্তিসংগত গান্ধী' খাড়া ক'রে তোলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু, বস্তুত, খ্রীষ্ট বা গান্ধীকে তাঁদের সত্যিকার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ করতে হ'লে, তাঁদের এই স্বতবিরুদ্ধতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই করতে হবে। কারণ, খ্রীষ্ট ও গান্ধী দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বশীল সমাজেরই মানুষ, এবং এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাঁরা সচেতন না থাকায় দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধ তরঙ্গাঘাতকে তাঁরা এড়াতে পারেন নি। তাই তাঁদের জীবনে ও তাঁদের দর্শনে দ্বন্দ্ব এবং স্বতবিরুদ্ধতা তাঁদের অজ্ঞাতেই পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, সত্যিকার যুক্তিসম্মত ঐতিহাসিক খ্রীষ্ট বা গান্ধী হ'লেন স্বতবিরুদ্ধ। আর এই স্বতবিরুদ্ধতা তাঁদের কাপট্য নয়—তাঁদের আন্তরিকতারই প্রমাণ!

জুডিয়ার রাজা হেরডের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আর্কেলস জুডিয়া থেকে বিতাড়িত হন এবং জুডিয়া সরাসরি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্বে রাজা হেরডের অধীনে জুডিয়া যখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখনই সেখানে রোমান সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত অসংকীর্ণ সংস্কৃতির বন্যা এসেছিল। হেরডের পর সেই সাংস্কৃতিক প্রবাহ একদিকে যেমন ব্যাপকতর এবং গভীরতর হোলো, অন্যদিকে তেমনি রাজকরের গুরুভার বহনের ফলে ইহুদীদের মধ্যে দেখা দিলো প্রবলতর দারিদ্র্য, সংকীর্ণতর জাতীয়তাবোধ এবং হিংসাত্মক জাতীয় চিন্তা।[১] এমনি একটি বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীগুলি পরিণতি লাভ করেছিল। তাই খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, একই সঙ্গে হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক বাণীর প্রচার, একই সঙ্গে দারিদ্র্যের স্তুতি ও দীনতার সান্ত্বনা,—বিচারক ভগবানের নির্মম অমোঘ দণ্ড, বিচারবিহীন ক্ষমা। গান্ধীজীর মধ্যেও এই স্বতবিরুদ্ধতা আমরা সহজেই লক্ষ্য করি। কারণ, তিনি একদিকে যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিশ্বমানাবকতা এবং শান্তির বাণীতে হয়েছিলেন উদ্‌বুদ্ধ[২], অন্যদিকে তেমনি ছিলেন

---

১ ৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীরা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিদ্রোহ করেন।

২ সাম্রাজ্যবাদ যখন বিশ্বশোষণে বহির্গত হোলো, তখন তার সঙ্গে গেল বিশ্বমানবিকতা, শান্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণী। এমনিভাবেই আন্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্র একটি তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির জন্ম দিলো। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে যেমন অন্ধকার জগৎ তীব্রভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অগ্নিকাণ্ডের

জাতীয় সংগ্রামের অধিনায়ক। তাই শান্তি ও সংগ্রাম একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে মূর্তি লাভ করেছিল। তিনি শোষক ও শোষিত, উভয়ের ভিন্নমুখী সংগ্রামের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই তিনি একদিকে যেমন ছিলেন রাষ্ট্রবিরোধী, তেমনি অন্য পক্ষে আবার ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠক। তাই তাঁর ধর্ম একদিকে যেমন পৃথিবীর সকল ধর্মকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তেমনি অন্যদিকেও আবার হিন্দুধর্মকে গোঁড়া হিন্দুর মতোই করেছিল জাহির। তিনি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী—একই সঙ্গে!

পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রেই আমরা দেখি, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অংশকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে ঘোষণা করা হয় এবং সেগুলির সত্যতা ও সাধুতা স্বীকার করা হয় না। খ্রীষ্টের মূল জীবনীগুলির মধ্যে স্বতবিরুদ্ধতা লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হ'তে পারে যে, সেগুলির বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত। খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে স্বতবিরোধিতার একটি প্রধান কারণ আমি পূর্বেই নির্দেশ করেছি। তাছাড়া, প্রক্ষিপ্ত অংশ যদি বা কিছু থাকে, সেগুলিকে অসত্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। সেগুলি বিভিন্ন কালের চরণচিহ্ন মাত্র।

ইউরোপে খ্রীষ্টের বাণীর বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন কালে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে, আমরা লক্ষ্য করি। নিউ টেস্টামেণ্টে খ্রীষ্টের মুখে অনেক হিংসাত্মক বাণীরও সন্ধান মেলে। খ্রীষ্টান ধর্মযুদ্ধ থেকে হিটলারি যুদ্ধ পর্যন্ত সকল হিংসাত্মক সংগ্রামের কালেই প্রয়োজন অনুসারে সেগুলিকে মূল সত্য ব'লে প্রচার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় খ্রীষ্টের কয়েকটি বাণী, যা মঁসিয়ে নাপলেঅঁ থেকে হের হিটলার পর্যন্ত যুদ্ধবিদ্‌রা সকলেই সহজে ব্যবহার করতে পারতেন:

মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ লাভ করলো তার রবীন্দ্রনাথকে। ভারতবর্ষে জন্ম নিলো এক বিশ্ব-সাহিত্য, এক বিশ্ব-সংস্কৃতি। তাই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর কাছে আমরা বিশ্বমানবিকতা, ত্যাগ, করুণা ও তিতিক্ষার যে তীব্র আলোক পেলাম, তা জাতীয় জীবনের উৎসবের আলোক-সমারোহ থেকে নয়,—তা আমরা পেলাম সমগ্র জাতির জীবনে যে আগুন জ্বলেছিল, তারই প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত থেকে। তবে এ-কথা-ও স্বীকার্য যে, দুর্গম সূচিভেদ্য তমিস্রার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডের আলো-ও শ্রেয়। সেই আলোতেই মানুষ অগ্নিনির্বাপক বারির সন্ধান পাবে।

এই প্রসঙ্গে মার্কস্ এবং এংগেলস্-এর কথাগুলি স্মরণীয়:

"The bourgeoisie has through its exploitation of the world market given a cosmopolitan character to production and consumption in every country...and as in material, so also in intellectual production. The intellectual creations of individual nations become common property. National one-sidedness and narrow-mindedness become more and more impossible, and from the numerous national and local literatures there arises a world literature."—*The Communist Manifesto.*

খ্রীষ্ট বলেন :

"Think not that I am come to send peace on earth · I come not to send peace, but a sword." (Matt. x, 34)

"ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করতে এসেছি : আমি বিস্তার করতে এসেছি শান্তি নয়—তরবারি।"

"I am come to send fire on earth ;···Suppose ye that I am come to give peace on earth " I tell you, Nay, but rather divison." (Luke xii, 49, 51)

"আমি পৃথিবীতে আগুন ছড়াতে এসেছি। তোমরা কি ভাবো যে, আমি এসেছি পৃথিবীকে শান্তি দিতে ? না, আমি তোমাদের বলছি, আমি দিতে এসেছি শান্তি নয়—বিচ্ছেদ।"

"And he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one." (Luke xxii, 36)

"এবং যার তরবারি নাই, সে তার পরিচ্ছদ বিক্রয় ক'রে একখানি তরবারি ক্রয় করুক।"

এই কথাগুলি নিঃসন্দেহে আর্ম্‌স্‌ ফ্যাক্‌ট্রিগুলির তরফ থেকে স্বচ্ছন্দে ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনরূপে প্রচার করা যেতে পারে।

"If thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him." (Luke xvii, 3)

"যদি তোমার ভাই তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাকে তিরস্কার করো, যদি সে অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা করো।"

["তিরস্কার করো" এবং "যদি অনুতাপ করে" কথাগুলি লক্ষ্য করুন।]

"But I say unto ye, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment." (Matt. v, 21)

"আমি তোমাকে বলছি, বিনা কারণে কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তবে বিচারের কালে তার বিপদের কারণ হবে।"

["বিনা কারণে" কথাগুলি লক্ষণীয়।]

খ্রীষ্টের এই ধরনের বহু বাণীই 'নিউ টেস্টামেণ্টে' ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলি যুদ্ধের বা হিংসার সমর্থনে ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট। কেউ যদি খ্রীষ্টের অন্যান্য বাণী সম্পর্কে সচেতন না থেকে কেবলমাত্র উপরের উদ্ধৃত বাক্যগুলি পড়েন, তবে সহজেই তাঁর মনে

হবে, যিশু খ্রীষ্ট ছিলেন হিংসার পূজারী, এবং নাপলেঁ বা হিটলার তাঁরই বাণীবাহক। তাই আজকের পৃথিবীতে যখনই যুদ্ধ বাধে এবং খ্রীষ্টান জাতিগুলির নিজ নিজ স্বার্থে আঘাত পড়ে, তখনই উচ্চতম পোপ থেকে ক্ষুদ্রতম পাদ্রি পর্যন্ত সবাই সৈন্যসংগ্রহের বা সমর-সম্ভার উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্যার্থে এই ধরনের বাণীগুলিরই আশ্রয় নেন।

লেনিন ও স্তালিন যদি মার্ক্সবাদী না হয়ে খ্রীষ্টান হ'তেন, তবে তাঁরাও দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক শোষকের বিরুদ্ধে অসংখ্য জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার জন্যে অতি সহজেই খ্রীষ্টের বাণী থেকে সাহায্য নিতে পারতেন। রুশ বা চীনদেশের গণ-বিপ্লবের রূপটিকে সমগ্র জাতির ব্যবচ্ছেদ-চিকিৎসার সঙ্গে তুলনা করা চলে। রুশ-বিপ্লব সম্পর্কে আমি এই তুলনা পূর্বেও করেছি।

এই সম্পর্কে খ্রীষ্টের নিম্নলিখিত বাণীগুলি লক্ষ্য করুন:

"And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee : for it is profitable for thee that one of the members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell."

"And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee : for it is profitable for thee that one of the members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell." (Matt. v, 29,30 ; Mark ix, 43, 45, 47)

"এবং তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমায় পীড়া দেয়, তা উৎপাটিত ক'রে তোমা থেকে দূরে নিক্ষেপ করো: কারণ, তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হবার চেয়ে তোমার একটি অংশ বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়। এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমাকে পীড়া দেয়, তা কর্তন ক'রে তোমা থেকে দূরে নিক্ষেপ করো: কারণ, তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হবার চেয়ে তোমার একটি অংশ বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়।"

বাইবেলের এই কথাগুলি কি ব্যক্তির, কি জাতির, উভয়ের ব্যবচ্ছেদের বিষয়েই সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আধুনিক খ্রীষ্টান সার্জনরা, যাঁরা ব্যবচ্ছেদের ব্যবসায় ক'রে জীবিকা উপার্জন করেন, তাঁরা বিনা দ্বিধায় খ্রীষ্টের এই বাণীগুলিকে দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজেদের ড্রইং রুমে বা অপারেশন থিয়েটারের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পারেন। তাতে তাঁদের বিবেক ও ব্যবসায়, দুয়েরই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে!

কিন্তু গান্ধীজী খ্রীষ্টভক্ত হ'লেও তাঁর নিজের এবং তাঁর কালের সুবিধামতো ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে খ্রীষ্টের এই বাণীগুলিকে অকুণ্ঠিত চিত্তেই এড়িয়ে গেছেন। গান্ধীজী জাতির জীবনেও যেমন ব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনেও। বার্নার্ড শ-ও ব্যবচ্ছেদ-চিকিৎসার বিরোধী। অবশ্য, জাতির জীবনে শ নিঃসংকোচে এই ব্যবচ্ছেদের বাণীকে প্রয়োগ করতে না চাইলেও, এ-বিষয়ে তাঁর যে দ্বিধাগ্রস্ত বিশ্বাস ছিল, তা নিঃসন্দেহ। তাই গান্ধীজী যখন বলশেভিজমের ঘোরতর বিরোধী, তখন বার্নার্ড শ তার উচ্ছ্বসিত প্রচাবক।[১]

বিপ্লবীরা কেবল যে উপরোক্ত রূপক থেকেই সহজে তাঁদের কাজের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারতেন, এমন নয়। সশস্ত্র বিপ্লবের অনুকূলে অনুরূপ আরো বহু বাণীই বাইবেলে পাওয়া যায়।[২] কারণ, খ্রীষ্টের ভগবান যেমন জেহোভাকে ছেড়ে অধিক দূর অগ্রসর হ'তে পারেন নি, তেমনি খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যেও নোআ ও মোজেজ-এর বাণীর প্রতিধ্বনি প্রায়ই সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টের বাণীগুলিকে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ আছে। খ্রীষ্টান দেশগুলিতে এরূপ ব্যবহারও সর্বদা হয়েছে, এবং হচ্ছে। দেশে যখনই আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার—অর্থাৎ বাধাহীন শোষণের—ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে, তখনই সেই সমাজে শ্রেণী-বিদ্বেষকে বিদূরিত করবার জন্যে খ্রীষ্টের অহিংসা, ক্ষমা এবং সহনশীলতার বাণীগুলির উপর অধিক পরিমাণে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণীয় যে, ঐ সময়ে ঐ সমাজের যে সমস্ত প্রতিভা ঐ সকল বাণীর প্রচারক হিসাবে দেখা দিয়েছেন, তাঁরা যে কোনো প্রকার স্বার্থসিদ্ধির অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ওই কাজ করেছেন, তাও নয়। তাঁরা বোঝেন নি যে, একটি অর্থনৈতিক বিধানের প্রচার তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে মাত্র। তাই জনসাধারণের কল্যাণকল্পে তাঁদের সমস্ত মাঙ্গলিক আন্তরিকতা একদিকে যেমন জনসাধারণকে প্রতারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রতারিত করেছে তাঁদের নিজেদেরকেও।

বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রচারক হিসাবে শাসক-শোষকরা যখন স্বদেশে ও সাম্রাজ্যে জনসাধারণকে শাস্ত্র থেকে 'জাতির কল্যাণে' ত্যাগ ও তিতিক্ষা অনুশীলনের উপদেশ

১ বার্নার্ড শ ও সিডনি ওয়েবের সেই বিখ্যাত কথাগুলি স্মরণীয়: "Lenin's side is our side."

২ যথা: "And now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire." (Luke. III, 9)

দিতে চেয়েছে, তখনই তাদেরই শিক্ষায় ও দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মপরায়ণ ও সংস্কৃতি-পরায়ণ ব্যক্তিরাও অনেকক্ষেত্রে নিজেদের অগোচরেই শান্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণীর প্রচারক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁরা যখন শোষক-গোষ্ঠীর হাতে তাদের প্রচারযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছেন, তখনও তাঁদের নিঃস্বার্থ মানব-হিতৈষিণা জনসাধারণের করুণ বেদনাতে তাঁদের হৃদয় বিগলিত করেছে। ফলে, তাঁরা একদিকে যেমন ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণী প্রচার ক'রে পরোক্ষে শোষক-শ্রেণীর সাহায্য ক'রে বসেছেন, তেমনি অন্যদিকে দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত জনসাধারণের সেবায় ও সান্ত্বনায় করেছেন আত্মনিয়োগ—তাদের দিয়েছেন পরকালের স্বর্গের ভরসা, বর্তমানকে অবহেলায় উৎসর্গ করবার শিক্ষা ও সাহস। এইভাবেই এই নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরা বিনা দ্বিধায় হয়ে উঠেছেন ত্যাগ ও তিতিক্ষার উপাসক: শান্তিবাদী, বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী—লেনিন যাঁদের রূঢ় হ'লেও যথার্থই বলেছেন: "hired coolies of the pen of imperialism and the petty-bourgeois reactionaries."

তাই এই সকল তথাকথিত শান্তিবাদী সমাজতন্ত্রীরা খ্রীষ্টের জীবন ও বাণী থেকে এমন সমস্ত ঘটনা ও বাণী সংগ্রহ করেছেন, যা ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সহনশীলতার প্রচার করে, দারিদ্র্যকে গ্রহণের জন্যে উৎসাহ দেয়, মানুষ ভাই-ভাই এই ভাঁওতায় শ্রেণী-চেতনাকে চাপা দিয়ে শ্রেণীময় সমাজকে চিরস্থায়ী করতে—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—সাহায্য করে। তাঁরা অহিংসা এবং ত্যাগ ও দারিদ্র্যের স্তুতিকেই খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠতম বাণী ব'লে বিজ্ঞাপিত করেন—প্রপীড়িত জনসাধারণকে বোঝান যে, তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠের উদয় হবে। এই শ্রেণীর বহু প্রচারকের জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে। আধুনিককালে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন দুই ব্যক্তি, টলস্টয় ও গান্ধী। এবং এই দুই ব্যক্তির মধ্যে এই প্রচার এমন একটি সৌম্য-সমাহিত গাম্ভীর্যের রূপ নিয়েছে, যা বিস্মিত করেছে, স্তম্ভিত করেছে, বিভ্রান্ত করেছে কোটী কোটী মানুষকে।

বাইবেলের প্রথম পাঠ গান্ধীজী টলস্টয়ের কাছেই পেয়েছিলেন। এই পাঠ গান্ধীজী যে সমাজের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছিলেন, তার পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছিল। টলস্টয় খ্রীষ্টের ত্যাগ ও অহিংসার বাণীকেই শ্রেষ্ঠ এবং সত্য ব'লে বেছে নিয়েছিলেন। আর এই দু'টি বাণীই গান্ধীজীর যৌবনের শিক্ষিত ভারতবর্ষে অত্যন্ত সহজে গ্রহণীয় ছিল।

পূর্বে আমরা খ্রীষ্টের হিংসাত্মক (!) বাণীরও কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে টলস্টয় ও গান্ধী এমন নির্বিকার যে, সেগুলি যে নিউ টেস্টা-

মেণ্টের পৃষ্ঠার কোথাও আছে, সে কথা যাঁরা নিউ টেস্টামেণ্ট পড়েন নি, তাঁদের কাছে নিতান্তই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে উঠবে।

টলস্টয় ও গান্ধী তাঁদের স্বকীয় কালের ও স্বকীয় শ্রেণীর উপযোগী রূপে খ্রীষ্টের যে সমস্ত বাণীকে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, নিম্নে সেগুলির কয়েকটি দেওয়া গেলো :

"But I say unto you, That ye resist no evil : but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also."

"কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, অন্যায়ের প্রতিরোধ কোরো না, কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে অপর গালটিও তার কাছে পেতে দিও।"

"But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and prosecute you ;... '

"কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, শত্রুকে তোমরা ভালোবাসো ; যে তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাকে আশীবাদ করো , যে তোমাদের ঘৃণা করে, তার মঙ্গল কামনা করো ; যে তোমাদের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহার করে, অত্যাচার করে, তার জন্যে প্রার্থনা করো।"

এই সকল বাণীর আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আজকের দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীময় সমাজে এই প্রচার জনসাধারণের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সহায়ক হয়েছে বেশী। ফলে, এর ব্যবহারিক অর্থ এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শাসক যদি তোমার উপর অত্যাচার করে, তা নীরবে সহ্য করো—আরো অত্যাচারিত হও। শত্রুকে ক্ষমা করো, নিঃস্ব হয়ে শোষককে শোষণের সুযোগ দাও। (বুদ্ধের জাতকগুলির মধ্যেও এই ধরনের বহু কাহিনীর সন্ধান মেলে। পরবর্তী কালে শোষক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন বৌদ্ধধর্মের সকল চিহ্নকে ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করতে চেয়েছিল, এই ধরনের আত্মত্যাগের বৌদ্ধ কাহিনীগুলিকে কিন্তু তারা জীইয়ে রেখেছিল সযত্নে। গীতার প্রচারবাণীর উদ্দেশ্যও ছিল তা-ই।) ফলে, পার্থিব থেকে অপার্থিবের দিকে জনসাধারণকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে—দেহ থেকে আত্মার দিকে। শোষকের শোষণে তোমার উদরে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই। কিন্তু তাতে কি ? অন্নহীনতায়, বস্ত্রহীনতায় আত্মার কোনো হানি হয় না। অনাহারে, অত্যাচারে, অপুষ্টিতে, অস্বাস্থ্যে যদি তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মরে, এমন কি যদি তুমি নিজেও মরো, তবু নীরবে সহ্য ক'রে যাও। কারণ, তোমার বা তোমার

স্ত্রী-পুত্র-কন্যার তো মৃত্যু নেই—আত্মা অবিনশ্বর। মানুষ তো মরে না, কেবল দেহ-ত্যাগ করে! তাই শাসক ও শোষকের পক্ষ থেকে জনসাধারণের আত্মার 'উন্নতির' জন্যে কতো সতর্কতা, কি ভয়াবহ প্রচার! খ্রীষ্টের বাণীতে তার সমর্থনও মেলে:

"And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul." (Matt. x, 28)

"যারা আত্মাকে হত্যা করতে পারে না, এবং কেবল দেহকেই হত্যা করে, তাদের ভয় করো না।"—দেহ নয়, আত্মা; অন্ন নয়, মোক্ষ; অর্থ নয়, পরমার্থ!

তাই আজকের পৃথিবীতে যারা দু'টি অন্নের ব্যবস্থা করে না, রোগের ঔষধ দেয় না, আত্মিক শক্তি নিয়েই তাদের বড়ো কারবার। যারা দু'টি খেতে চায়, পরনের একখানি বস্ত্র চায়, ওদের প্রচারে তারা হয়ে ওঠে এক-একটি ভয়াবহ প্রাণী—বস্তুবাদী, materialist. আর যারা আত্মার নামে দেহকে অস্বীকার করে, পরকালের নামে মানুষকে ইহকাল থেকে করে বঞ্চিত, পরমার্থের নামে সাধারণের অর্থকে করে আত্মসাৎ তারা এবং তাদের প্রচারকরাই হয়ে ওঠে—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, এক-একটি আদর্শবাদী—idealist. এই হ'ল আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের গোড়ার কথা।

সুতরাং আসে ত্যাগের প্রশ্ন। অসংখ্য জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করলে, মুষ্টিমেয় শোষক তা আত্মসাৎ করে কেমন ক'রে? সুতরাং ত্যাগের মহিমা বেড়ে যায়—জমিদার টলস্টয় এবং বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার গান্ধী কৃষক সেজে দরিদ্রপনা করেন।[১] তাঁরা বারেকের জন্যে কল্পনাও করেন না যে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং সত্যিকার ত্যাগী হ'লে-ও সমাজগতভাবে নিজেদের অজ্ঞাতেই একটি বিশেষ শ্রেণী-স্বার্থের প্রচারক হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁরা সংকোচহীন চিত্তে 'খ্রীষ্টান সাম্যবাদের' প্রচারে লেগে যান। বাইবেল থেকে খ্রীষ্টের বাণীর কোটেশন চলতে থাকে:

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust dost corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal." (Matt. vi, 19, 20)

"তোমাদের সম্পদ্ তোমরা পৃথিবীতে সঞ্চয় ক'রো না। কারণ, পৃথিবীতে শ্যাওলা

১ "দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ যুদ্ধের সময় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ, যতোটা গিরিমিটিয়াদের মতো করা যায়, করিয়াছিলাম।"—গান্ধীজীর 'আত্মকথা'

ধরে, মরচে পড়ে, চোর আসে, চুরি যায়। তোমাদের সম্পদ্ তোমরা সঞ্চিত ক'রো স্বর্গে—সেখানে শ্যাওলাও ধরে না, মরচেও পড়ে না, চোরও আসে না, চুরিও যায় না।"

কথাগুলিতে ধনরত্ন সঞ্চয়ের নিন্দাই করা হয়েছে। আজকের সমাজের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, দুঃখ ও দৈন্যের জন্যে আমরা মূলত দায়ী করি পুঁজিকে—যে পুঁজির জন্ম হয়েছে সঞ্চয় থেকে, সে সঞ্চয়ের উৎস বঞ্চনা কিংবা উদ্‌বৃত্তি যার মধ্যেই থাক। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই বাণীর প্রচার, পুঁজির বিরুদ্ধে প্রচার ব'লেই মনে হবে। কিন্তু কার্যত এই প্রচার থেকে যে ফসল উঠেছে, তার রূপটা সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, এই বাণীতে কোটী কোটী জনসাধারণ, যারা বঞ্চিত হয়েছে, তারা সান্ত্বনা পায়, তারা শান্ত হয়, আর সেই সুযোগে মুষ্টিমেয় সঞ্চয়ীরা সমাজে সর্বনাশের আগুন জ্বালাতে থাকে। তাই খ্রীষ্ট যেমন পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি গান্ধীজী। তাঁদের ত্যাগ ও অসঞ্চয়ের বাণীই হয়ে উঠেছে বঞ্চনার অস্ত্র। তাই খ্রীষ্টান ধনিকরা দেশে দেশে গির্জা গড়িয়ে দেন, করেন বাইবেল-বিতরণ। আর গান্ধীবাদী (!) ভারতীয় ধনিকরা প্রচার করেন সস্তায় গান্ধী-সাহিত্য। প্রতিরোধ-হীন ত্যাগের বাণী দস্যুকে ত্যাগী করে না। যারা বঞ্চিত, তাদের আত্মতৃপ্তির এবং অপৌরুষের সুযোগ দেয়।

খ্রীষ্ট যখন বলেন বা গান্ধীজী যখন পুনরাবৃত্তি করেন যে, "It is easier for camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God" (Mark, x, 25), তখন স্বর্গ-প্রবেশের জন্যে খ্রীষ্টান ধনীদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা দেখা যায় না, তেমনি দেখা যায় না গান্ধীবাদী পুঁজিপতিদের মধ্যে। কারণ, পৃথিবীতে এমনিভাবে শোষণ, শাসন আর লুণ্ঠন চালাবার সুযোগ থাকলে স্বর্গে যাবার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই থাকে না! পৃথিবীই তাঁদের স্বর্গ। অন্যপক্ষে, যারা সমস্ত জীবন ধ'রে দুঃখ সইলো, দৈন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করলো, পৃথিবী তাদের কাছে নরক—স্বর্গের সান্ত্বনা তাদের বঞ্চিত জীবনের একমাত্র আশ্রয়, তাদের পরমতম নিষ্কৃতি। তাই তাদের নিঃস্বতাকে তারা বলে ত্যাগ, বলে বিত্তের চেয়ে বড়ো চিত্ত, উদরের চেয়ে আত্মা। তারা তাদের ক্লীবত্বের তোষণ করে, নিজেদের দেয় সান্ত্বনা, প্রচার করে শান্তি: অর্থলোভী হোয়ো না; ধনিকরা যখন কৃপাপরবশ হয়ে তোমাদের শোষণ করে এবং শোষণের দ্বারা তোমাদের বিত্তের ভার হরণ করে, তখন ক্রুদ্ধ হোয়ো না, বরং হোয়ো কৃতজ্ঞ। তখন তারা খ্রীষ্টের কথা স্মরণ করে, স্মরণ করে গান্ধীজীর বাণী: কেউ যদি তোমার সম্পত্তি প্রতারণা বা

বলপ্রয়োগের দ্বারা গ্রহণ করে, তার প্রতিবাদ কোরো না, প্রতিরোধ কোরো না, কোরো সাহায্য। "...and him that taketh away thy cloak forbid not to take thy coat also;" "and of him that taketh away thy goods ask them not again." (Luke, vi, 29, 30) এইভাবে এই বাণীর ফল সমাজে ও অর্থনীতিতে গিয়ে সুদূরবিস্তৃত হয়ে পড়ে: ধনিকের শোষণে সাহায্য করো, সাম্রাজবাদী লুঠেরাদের দাও সুবিধা!

দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও স্বদেশী ধনিকদের শোষণ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে, দেশে দেশে শ্রমিক-সমস্যা প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় বেকার, তখন কর্মহীন বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করবার জন্যে চলে খ্রীষ্টের দোহাই। খ্রীষ্ট বলেছেন: "কর্মের কি প্রয়োজন?"

"Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither spin. (Matt. vi, 28)

"ক্ষেতের শাপলা দেখো, তারা কেমন বাড়ে। তারা পরিশ্রম করে না, সুতো-ও কাটে না।"

সুতরাং বেকার থাকতে তোমাদের অরুচি কেন?

গান্ধীজী মুক্তকণ্ঠে ঐ বাণী প্রচার করেন। আমরা লক্ষ্য না ক'রে পারি না, শাপলা ফুল সুতো কাটে না সত্য, কিন্তু গান্ধীজীকেও সুতো কাটতে হয়, গিরমিটিয়া চাষী সাজতে হয়। সুতরাং যখন মানুষের কাজ জোটে না, বা কাজ ক'রেও জোটে না খাদ্য, জোটে না বস্ত্র, তখনও আবার খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হওয়া চলে:

"Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put up. (Matt. vi, 25) (Luke xii, 22, 23-ও দ্রষ্টব্য)।

"তুমি কি আহার করবে, পান করবে, পরিধান করবে, সেজন্যে—তোমার জীবনের জন্যে—চিন্তিত হোয়ো না।"

অর্থাৎ তোমার ক্ষুধা, তোমার তৃষ্ণা, তোমার শীতাতপের প্রয়োজন—এগুলি তোমার রক্ত-মাংসের প্রয়োজন; এগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ো না। অন্নহীন, বস্ত্রহীন হয়ে থাকো;[১] শীতে কুঁকড়ে মরো, স্যাঁৎস্যাতে বস্তিতে থাকো; বৃষ্টিতে, রৌদ্রে তোমার মাথার উপরে একখানি ছাদেরও বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। আত্মার অন্ন

১ প্রায়োবেশন শ্রেণীসমাজের অন্যতম নীতি। বুর্জোয়া সমাজে ঐ নীতি প্রচারের প্রয়োজন আছে। কারণ, একদিকে যেমন অতিভোজন, অন্যদিকে তেমনি অল্পভোজন—অনাহার। যারা অতিভোজন করে,

লাগে না, বস্ত্র লাগে না, শীতাতপে আবরণের প্রয়োজন হয় না ![1] আত্মা ব্যাধিতে ভোগে না, না খেয়ে মরলেও আত্মা মরে না ! যে সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোটী কোটী মানুষকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, বিত্তহীন ক'রে রাখতে চায়, সেখানে মানুষের দেহকে অস্বীকার ক'রে গোটা মানুষকে এক-একটা আত্মা বানিয়ে ফেলাই যে নিরাপদ, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুতরাং শ্রেণী-সমাজে মানুষ হয়ে ওঠে আত্মা[2] এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ—মহাত্মা !

যাই হোক, এমনিভাবেই টলস্টয় বা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে যখন মানব-সমাজের পরম কল্যাণ করতে চাইলেন, তখন তাঁরা সমাজগতভাবে করলেন ঠিক তার বিপরীত। তাঁরা নিমেষের জন্যেও সন্দেহ করলেন না যে, সমসাময়িক সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রচারযন্ত্র রূপেই তাঁদের স্ব স্ব জীবন আত্মপ্রকাশ করছে। ব্যক্তিগত-ভাবে সে জীবন নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ হওয়ায় তা শোষক সমাজের উপযোগী হয়েছে আরো বেশী। ফলে, যাদের জন্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রচার, তারা হয়েছে বিভ্রান্ত। আলোয় অবগাহন করতে গিয়ে তারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে—তারা মুহূর্তের জন্যেও বোঝেনি যে, এই ত্যাগ ও তিতিক্ষার আলো—মহামানবতার বাণী—জাতীয় জীবনের এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখা মাত্র। প্রেম, অহিংসা, ক্ষমা ও বিশ্বমানবতা —এই মহাজ্ঞানের আলোক তারা চায়, নিত্য দিন চাইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, সে আলো আমরা চাই শ্রেণী-শোষণের প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড থেকে নয়—চাই শ্রেণীহীন, শোষণহীন জাতীয় জীবনের উৎসব-রজনীর দীপমঞ্চ থেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেমন টলস্টয় ও গান্ধীকে বোঝে নি, তেমনি টলস্টয় ও গান্ধীও

মাঝে মাঝে অনাহার তাদের প্রয়োজন। অন্যপক্ষে, যারা অল্পভোজন করে বা অনাহারে থাকে,—তাদের তো অনশন অপরিহার্য। কারণ, অনশন ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নেই। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে অনশনের নীতিটিকে চলু করবার যথেষ্ট প্রযোজন ছিল। গান্ধীজী নিজের অজ্ঞাতসারে শ্রেণীসমাজের শোষণমূলক 'নীতির' বহু সূত্রকেই আত্মিকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়োবেশনের ব্রতটিকেও সেই নীতিসূত্রগুলিরই শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

গান্ধীজীর স্বল্পবস্ত্রতা এবং বেশভূষার পারিপাট্যের বিরোধিতাও এই একই বুর্জোয়া নীতিরই প্রকাশ মাত্র।

১ গীতার বাণী স্মরণীয় : মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥
দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৪ শ্লোক।

২ রাশিয়ার গোলামদের বলা হতো "আত্মা"। এই আত্মাদের বেচাকেনা চলতো সমাজে। এই সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নিকলাই গগলের সুবিখ্যাত উপন্যাস "Dead souls" বা "মরা গোলাম" প'ড়ে দেখতে পারেন। তাতে মানুষকে "আত্মা" বানাবার মহিমা অনেকখানি বোধগম্য হবে।

বোঝেন নি নিজেদের। কারণ, তাঁরা ছিলেন একটি বিশেষ সমাজের, একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রকাশের প্রত্যঙ্গ মাত্র। তাই সেই সমাজ ও শ্রেণীর প্রচার তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছিল। ফলে, ব্যক্তিগতভাবে ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভিত্তিতে যে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা তাঁরা করতে চেয়েছিলেন, তা কেবল কল্পনাতেই পর্যবসিত হয় নি, তা পরিণত হয়েছিল তাঁদের স্ব স্ব শ্রেণীর উপযোগী ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াতে।

লেও টলস্টয়ের মারফত গান্ধীজী তাঁর কালের ও শ্রেণীর উপযোগী যে খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে তিনি গীতার 'ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ' ইত্যাদি শ্লোকের নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করলেন:

"For where your treasure is, there will your heart be also." (Matt. vi, 21) (Luke xii, 34)

"তোমার বিষয় যেখানে থাকবে, তোমার হৃদয়ও থাকবে সেখানে।"

আবার, "No man can serve two masters : ye cannot serve God and Mammon." (Matt. vi, 25)

'মানুষ দু'জন মনিবের সেবা করতে পারে না : ভগবান ও কুবেরের সেবা একসঙ্গে অসম্ভব।"

বাস্তবিকপক্ষে, গান্ধীজী তাঁর সমগ্র জীবন পদে পদে খ্রীষ্টকে অনুসরণ, এমন কি, অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। অলৌকিকতার কথা বাদ দিলে খ্রীষ্টের জীবনে দেখা যায়, তিনি মানুষের দুঃখে, বেদনায়, পীড়ায় ব্যথিত একটি মানুষ, করুণায় কাতর, সেবায় ব্যস্ত—a great nurse. গান্ধীজীও খ্রীষ্টের মতোই ছিলেন বিরাট এক শুশ্রূষাকারী। খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাকে লৌকিক হিসাবে দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি কুষ্ঠ রোগীরও সেবা করেছিলেন। গান্ধীজীও কুষ্ঠ রোগীর সেবা করতেন। খ্রীষ্ট বলেছিলেন:

"And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all." (Mark, x, 44)

"তোমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন, তিনিই সবার সেবা করবেন।"

খ্রীষ্টের এই বাণীটি গান্ধীজীর কাছে বুঝি অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ-জীবনে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সর্বত্রই তিনি সেবার বাণী প্রচার ক'রে গেছেন। অবশ্য, এ বিষয়ে তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক ব'লে মনে হয়।[১]

---

১ হিন্দু বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের ফসল হিসাবে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ গ'ড়ে উঠেছিল, বিবেকানন্দের,

খ্রীষ্টের জীবনী পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী দ্রষ্টাদের বাণীগুলি দিয়ে নিজেকে একদা অত্যন্ত পুষ্ট করেছিলেন এবং পরে যখন তাঁর ধারণা হোলো যে, তিনিই তাঁর পূর্ববর্তী দ্রষ্টাদের বাণীতে বর্ণিত সেই ত্রাণকর্তা, পূর্ববর্তী দ্রষ্টারা ত্রাণকর্তার যেমন যেমন বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সেগুলিকে নিজের জীবনেও তেমনিভাবে অনুকরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শাস্ত্রে লেখা ছিল, ইস্রায়েলদের ত্রাণকর্তা গাধার পিঠে চ'ড়ে একদা আসবেন। সুতরাং একদা খ্রীষ্টকে নিতান্ত অকারণে এবং অযৌক্তিকভাবেই একটা বাচ্চা গাধার পিঠে চড়ে বসতে হোলো।[১] গান্ধীজীকে-ও আমরা দেখি, খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীকে তিনি এমন মূল্যবান ব'লে ভাবতেন যে, নিজের জীবনেও অনেকক্ষেত্রে তিনি খ্রীষ্টকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করতেন।

খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর পাঠ গান্ধীজী প্রধানত পেয়েছিলেন রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিক লেও টলস্টয়ের কাছে। কিন্তু টলস্টয় খ্রীষ্টকে যেভাবে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যাকেও গান্ধীজী সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। সেখানেও তাঁর চয়নপদ্ধতি পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। কারণ, টলস্টয় এবং গান্ধীজী উভয়েই বুর্জোয়া অর্থনীতির ফসল হ'লেও তাঁদের, উভয়ের মধ্যে স্তর-ভেদ ছিল প্রচুর পরিমাণে। কারণ, টলস্টয়ের কালের রাশিয়া এবং গান্ধীর কালের ভারতের বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিণতি একরূপ ছিল না। টলস্টয় ও গান্ধীর মতের মূল পার্থক্য দেখা গিয়েছিল প্রধানত তাঁদের উভয়ের রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতামতের মধ্যে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে শোষক-গোষ্ঠী এবং তাদের শাসন-ব্যবস্থা যখনই অসহনীয় হয়ে উঠেছে এবং দেশময় বিদ্রোহ বা অনানুগত্যের সূচনা বা সম্ভাবনা দেখা গেছে, তখনই রাষ্ট্রীয় উৎপীড়করা জনসাধারণের কাছ থেকে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ আদায়ের জন্যে খ্রীষ্টের সাহায্য গ্রহণ করেছেন :

"Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's

জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল, তা আমরা আগেই বলেছি। গান্ধীজী ছিলেন সেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ ফসল। তাই বিবেকানন্দের ধর্মে যে জাতীয়তাবাদ, যে-সেবা আমরা লক্ষ্য করি, তা আরো ব্যাপকতর-ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে গান্ধীজীর মধ্যে। বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তির উপাসক। ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়াদের একাংশ যখন শক্তি-সংগ্রহের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়েছে, তখনকার মানুষ তিনি। তাই বিবেকানন্দের অহিংসা সংকীর্ণ, প্রয়োজন হ'লে হিংসাতেও তাঁর আপত্তি নেই।

১ "And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon ; as it is written, Fear not daughter of Sion , behold thy King cometh sitting on an ass's colt" (John, xii, 14, 15)

and unto God the things which are God's." (Matt. xii, 21) (Mark, xii, 17) (Luke, xx, 25).

"যা সীজারের, তা সীজারকে এবং যা ভগবানের তা ভগবানকে দাও।"

খ্রীষ্টের এই বাণী প্রচলিত হয়েছিল বিশেষভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, যখন রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র তাদের বিবিধ উৎপীড়ন ব্যবস্থা দিয়ে জনসাধারণকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছিল। অবশ্য, সীজারের অর্থাৎ সামন্তরাজদের প্রাপ্য কি, বা কতোখানি এবং ভগবানের অর্থাৎ ধর্মরাষ্ট্রের প্রাপ্য কি বা কতোখানি, এ নিয়ে রাজতন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্রের মধ্যে বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকতো। এইভাবে খ্রীষ্টের উপরোক্ত বাণীটির জোরেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকটি মানুষের স্কন্ধে দ্বিবিধ দাসত্বের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং প্রত্যেকটি মানুষকে রাজতন্ত্রের ও ধর্মতন্ত্রের দুটি খুঁটিতে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল বংশানুক্রমে।

মানুষ ছিল রাজতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্রের গোলাম। তারপর যখন বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করলো, তখন বুর্জোয়ারা রাজতন্ত্র তথা ধর্মতন্ত্রের জোয়াল থেকে জনসাধারণকে 'মুক্তি' দিয়ে তাদের জুড়ে দিতে চাইলো নিজেদের কারখানার ঘানিতে। রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু হ'ল সংগ্রাম। প্রচার হ'তে লাগল ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী—স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য। রাজনীতিতে দেখা দিলো বুর্জোয়া ডেমোক্রাসি এবং ধর্মে প্রোটেস্টান্টিজম্। বুর্জোয়া অর্থনীতি নিজের উন্নতির পূর্ণ প্রকাশের জন্যে একদা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রচার করেছিল, সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা চূড়ান্তপন্থিতার মধ্যে রূপ নিলো, এলো এনার্কিজ্‌ম্। ব্যক্তির চেয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানকে তারা বড়ো ব'লে মানতে চাইলো না এবং ব্যক্তির নামে তারা সমাজকে অস্বীকার ক'রে বসলো। সমস্ত শাসন-ব্যবস্থাকে তারা করলো অস্বীকার. ধর্মকে করলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার—মানুষের বিবেকই হ'ল একমাত্র পূজাবেদী ; নরনারীর যৌন-মিলনের জন্যেও সমাজের বা গির্জার অনুমোদন নেওয়ার রীতিকে তারা অযৌক্তিক ব'লে বাতিল ক'রে দিলো।

লেও টলস্টয়েরও এনার্কিস্ট ব'লে খ্যাতি ঘটেছিল। তাঁর মধ্যে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্ববাদ গ্রহণ করেছিল একটি চূড়ান্ত রূপ। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের বিরোধী। ব্যক্তিই তাঁর কাছে ছিল প্রথম ও পরম। তিনি ধর্মতন্ত্রেরও বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ, রাষ্ট্র বা ধর্মতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ব্যাহত ও বিপন্ন করে। ইংল্যাণ্ডে শেলী, কীট্‌স্ প্রভৃতির সাহিত্যে এবং ললার্ড বা কোয়েকারদের ধর্মে এই একই উগ্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা আত্মপ্রকাশ করেছিল। রুশ দেশেও লেও টলস্টয়ের কিছু পূর্বে তা

আত্মপ্রকাশ করেছিল নিহিলিস্ট এবং দুখবরদের[১] মধ্যে। এই দুখবরদের সঙ্গে একদা টলস্টয়ের কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

টলস্টয় তাঁর 'রেসারেক্সন' বা 'পুনরুজ্জীবন' উপন্যাস থেকে উপার্জিত সমস্ত অর্থ এই সম্প্রদায়কে দান করেন। আগেই বলেছি, বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এলো তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং তারই প্রতিফলন রূপে ধর্মে এলো প্রোটেস্টান্টিজম্। প্রোটেস্টান্টিজম্ ঘোষণা করলো, ভগবৎ-উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিসাপেক্ষ (পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মতোই)। রাজনীতিতে এলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র, ক্রমওয়েল আর নেপোলিয়ন। এমনিভাবেই বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা ধর্মে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে যে উগ্র সমাজ-বিরোধী 'ব্যক্তি স্বাধীনতার' জন্মদান করলো, তারই অন্যতম চূড়ান্ত প্রকাশরূপে আবির্ভূত হলেন লেও টলস্টয়। যথেচ্ছ পুঁজিবাদের প্রতিফলনরূপে তিনি রাজনীতিতে এবং ধর্মে হয়ে উঠলেন এনার্কিস্ট—মানুষের নিজের বিবেক ও বুদ্ধি ছাড়া আর সকল কিছুর প্রতিই আনুগত্যকে করলেন অস্বীকার। একমাত্র যে রাষ্ট্রের ও ধর্মের প্রতি মানুষের অবারিত আনুগত্য থাকবে, তা মানুষের হৃদয়, তার বিবেক—"behold, the Kingdom of God is within You." তাই তাঁর Kingdom of God গ্রন্থে টলস্টয় বলেন :

"He only lives a true life who has transferred his life into the sphere in which freedom lies—in the domain of first causes—that is to say by the recognition and practice of the truth revealed to him." [দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।]

---

১ দুখভর্‌সি সম্প্রদায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৪০-এর কাছাকাছি সময়ে) খারকভ অঞ্চলে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তকের নাম ঠিক জানা যায় না। এঁদের মতে, মানুষের অন্তরে ভগবান আছেন। সুতরাং মানুষ যা করে, তা কখনো অন্যায় বা অশুভ হ'তে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের বা শাসকশ্রেণীর কোনো প্রয়োজন নেই। এই গেলো রাজনীতির দিক। ধর্মেও তাঁরা পোপ বা পাদ্রিতে অবিশ্বাসী। কারণ, ভগবানের চোখে পোপ, পাদ্রি এবং সাধারণ মানুষ সকলেই সমান, এবং ভগবানের পূজায় সকলেরই সমান অধিকার। সুতরাং বিবাহ-অনুষ্ঠানেও তাঁদের অবিশ্বাস। নর-নারীর পরস্পরের যৌন-মিলনের ইচ্ছাই তাদের মিলনকে শুভ এবং সুন্দর ক'রে তুলতে পারে। বিবাহের বন্ধন অযৌক্তিক ; তা উৎপীড়ন এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। তাঁরা হনন কার্যের বিরোধী ; সুতরাং সামরিক বৃত্তির-ও। এই হনন-বিরোধিতা তাঁরা পরে মানবেতর জীবের প্রতিও প্রসারিত করেন। ফলে, তাঁরা পশু-হত্যা, পশু-নির্যাতন এবং পশুজ খাদ্যের বিরোধী হয়ে ওঠেন। (গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনা করুন।) এঁরা রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

সুতরাং যদি কেবল ব্যক্তির কাছেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকে, তবে রাষ্ট্রের শাসন ও ধর্মরাষ্ট্রের অনুশাসন মেনে চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ বিষয়ে-ও তিনি ধর্মের দোহাই দেন: "The profession of Christianity not only forbids the recognition of State, but strikes at the very foundations." (The Kingdom of God, দশম পরিচ্ছেদ) অন্যত্র: "Christianity is subversive of every Government." (The Kingdom of God, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

গুরু টলস্টয়ের কাছ থেকে গান্ধীজী খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে এই উক্তিগুলিকে সহজেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি জরাগ্রস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় মানুষ হয়েছিলেন, এবং এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম। সুতরাং টলস্টয়ের এই রাষ্ট্র-বিরোধী কথাগুলি আয়ত্ত করতে গান্ধীজীর মোটেই দ্বিধা বা বিলম্ব হয় নি। তাই গান্ধীজীও টলস্টয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর 'নীতি-ধর্ম' বা 'Ethical Religion' গ্রন্থে ঘোষণা করেন:

"রাষ্ট্রীয় বিধির সঙ্গে নৈতিক বিধির বড়ো পার্থক্য এই যে, নৈতিক বিধি প্রত্যেক মানুষের আত্মার মধ্যেই জন্মলাভ করে।"

"The great difference between the law of the state and the moral law is that the latter has its seat in the soul of every man. Truth is within ourselves."

সুতরাং রাষ্ট্রীয় অনুশাসন যখন মানবের অন্তর্নিহিত সেই সত্যের সম্মুখীন হয় ও বাধার সৃষ্টি করে, তখন রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকে অবহেলা ও অস্বীকার করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য হয়ে ওঠে।

"Indeed, disobedience to the law of the State becomes a peremptory duty, when it comes in conflict with the law of God."

কিন্তু এ-বিষয়ে লেও টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর একটি বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। টলস্টয় ও দুখবররা খ্রীষ্টের অহিংসার বাণীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সত্য ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মতে সত্যের উদ্‌ঘাটন যেমন ব্যক্তিগত হৃদয়েই মাত্র সম্ভব, তার অনুশীলনের পূর্ণতম অধিকারও তেমনি ব্যক্তিরই থাকা উচিত। রাষ্ট্র যখন সামরিক বিভাগে নিয়োগের দ্বারা মানুষকে তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিবেক থেকে বঞ্চিত করে, তখন সত্যের যে অবমাননা ঘটে, তার তুলনা হয় না। সুতরাং টলস্টয় ও দুখবররা যেমন রাষ্ট্রের বিরোধী, তেমনি বিরোধী জনসাধারণকে সামরিক বিভাগে নিয়োগের ও হনন-যজ্ঞে ব্যক্তির বাধ্যতামূলক অংশ গ্রহণের। এইরূপ হত্যাকাণ্ডে

অংশ গ্রহণের জন্তে রাষ্ট্রীয় আদেশকে বিনা দ্বিধায় লঙ্ঘন করবার উপদেশ দিয়েছেন তাঁরা। ইংল্যাণ্ডের কোয়েকার বা ফ্রেণ্ড্‌স্‌ সম্প্রদায় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার 'Concientious Objector'-দের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হনন-কার্য থেকে বিরত থাকার ব্যক্তিগত অধিকারের জন্তে তাঁরা সকলেই প্রাণপণ প্রচার করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় আদেশের অপেক্ষা ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দেশই তাঁদের কাছে ছিল শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু গান্ধীজী 'অহিংসার পূজারী' হয়েও রাষ্ট্রের অপেক্ষা ব্যক্তিগত বিবেককে কার্যত শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন না। তিনি রাষ্ট্রকে যে পরিপূর্ণভাবে মানেন, তার প্রমাণ, তিনি লেজিটিমিস্ট (legitimist) বা আইনীপন্থী। আর আইনীপন্থী ব'লেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ বা বিপ্লব হ'ল আইন ভঙ্গ করা—সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স।[১] কেবল তাই নয়, আমরা লক্ষ্য করি, গান্ধীজী যখন অহিংসার বাণী প্রচার করেন, সামরিক প্রতিষ্ঠানেব নিন্দা করেন, তখনও তিনি হনন-কার্যের বিপুল উপকরণ—সরকারী পুলিশ ও সামরিক কর্মচারীদের প্রতি রাষ্ট্রের অনুশাসন মেনে চলবার উপদেশ দেন—এমন কি ঘৃণ্যতম, নিষ্ঠুরতম হনন-কার্যের বেলাতেও। এর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা চলে :

১৯৩০ সালের স্বদেশী আন্দোলন। গান্ধীজীব অহিংস সংগ্রামের আহ্বান কেবল মাত্র তাঁর আশ্রমবাসী শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। তা ভারত সরকারের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীতেও প্রসার লাভ করলো। ঐ সময়ে স্থানীয় নেতাদের গ্রেফ্‌তারের ফলে পেশোয়ারে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠলো। এই ক্ষুদ্র জনতার অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সুতরাং ভারত সরকার তাদের অভিজ্ঞ কূটনীতি অনুসারেই সেই জনতাকে দমন করবার জন্তে সেখানে দুই প্লাটুন হিন্দু সৈন্য পাঠালো। তারা ছিল অষ্টাদশ রয়েল গাড়েয়ালী রাইফেলের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের লোক। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে হিন্দু সৈন্যরা পেশোয়ারের মুসলিম জনসাধারণের বিক্ষোভকে নিজেদের দাবির অংশ ব'লেই ঘোষণা করলো। হিন্দু সৈন্যদল ও মুসলমান জনতা গান্ধীজীর অহিংসা এবং মৈত্রীকে স্মরণ ক'রেই হয়তো সেদিন হাত মিলিয়ে দাঁড়ালো। সৈন্যরা জনতার ওপর গুলী চালনার সরকারী আদেশ অমান্য করলো। সাম্রাজ্যবাদী ভারত সরকার ভয় পেয়ে গেলো। অবিলম্বে পেশোয়ার থেকে ভারতীয় পুলিশ ও

১ অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধেও এই একই কথাই বলা চলে। উপনিবেশে বুর্জোয়া অভ্যুত্থান মূলত সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই গ'ড়ে ওঠে। সুতরাং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়াদের বিদ্রোহ অসহযোগ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই আমরা উনবিংশ শতাব্দীর হাঙ্গেরিতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বা বিংশ শতাব্দীর আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অসহযোগকেই বিদ্রোহের প্রধানতম অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হ'তে দেখি।

সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হোলো। ২৫শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত পেশোয়ার স্থানীয় জনগণের আয়ত্তে ছিল। পরে বৃটিশ সৈন্য এসে ঐ শহর পুনরধিকার করে। আদেশ-অমান্যকারী সৈন্যদের সামরিক বিধি অনুসারে হোলো কঠোরতম শাস্তি—পনের বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অতঃপর এলো গান্ধী-আরউইন চুক্তি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, তাতে মুক্তির দাবি ক'রে যে সকল রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির উল্লেখ করা হোলো, তা থেকে অতি সতর্কতার সঙ্গেই গান্ধীজীর অহিংস নীতির শ্রেষ্ঠ অনুশীলক, সামরিক বিধি অনুসারে দণ্ডিত, গাড়োয়ালী সৈন্যদের বাদ দেওয়া হোলো। গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকের জন্যে লণ্ডনে গেলে ফরাসী সাংবাদিক শার্ল পেত্রাশ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই অহিংস সৈন্যদের প্রতি তিনি কোন সহানুভূতি দেখালেন না কেন? গান্ধীজী এই প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা শুনলে লেও টলস্টয় এবং দুখবর সম্প্রদায়ের লোকেরা যে লজ্জা পেতেন, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।* হয়তো গান্ধীজীকে তাঁদের অত্যন্ত দুর্বোধ্য লাগতো। গান্ধীজী বলেছিলেন :

"কোন সৈন্য যখন গুলী চালনার আদেশ অমান্য করে, তখন সে তার গৃহীত শপথ ভঙ্গ করে এবং এইরূপে সে নিন্দনীয়ভাবে আদেশ অমান্যের অপরাধে অপরাধী হয়। আমি সামরিক কর্মচারী বা সৈন্যকে আদেশ অমান্য করতে বলতে পারি না। কারণ, আমি যখন ক্ষমতার অধিকারী হবো, তখন অনুরূপভাবে আমি-ও ঐ সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যদের ব্যবহার করবো। আজ আমি যদি তাদের আদেশ অমান্য করতে শিক্ষা দিই, তবে আমার মনে হয়, তারা আমার শাসনকালেও আমার আদেশ মানবে না।"

"A soldier who disobeys an order to fire breaks the oath which he has taken and renders himself guilty of criminal disobey ; for when I am in power, I shall in all likelihood make use of those same officials and those same soldiers. If I taught them to bisobey, I should be afraid that they might do the same when I am in power"

গান্ধীজীর উপরের কথাগুলি কিন্তু একান্ত সত্য। টলস্টয় ও দুখবরদের সঙ্গে

---

* টলস্টয়ের কথাগুলির সঙ্গে গান্ধীজীর কৈফিয়তের তুলনা করুন। টলস্টয় বলেন : "One can never justify an act of violence against one's fellow-men by claiming to have done it in defence of another who was enduring some wrong, because in committing an act of violence, it is impossible to compare the one wrong, with the other, and to say which is the greater, that which one is about to commit or the wrong done against one's neighbour,"—Kingdom of God, Chap. II.

গান্ধীজীর যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল, কেবল তাই তাঁর এই স্বতবিরুদ্ধ নীতি ও রীতির ব্যাখ্যা দিতে পারে। টলস্টয় ও তাঁর সহধর্মী দুখবররা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ হয়েছিলেন, তা একটি সামন্ততান্ত্রিক, আধাবুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী সমাজ—জরাগ্রস্ত, রুগ্‌ণ, ক্ষীয়মাণ, ধ্বংসমান। তাই টলস্টয়ের রাষ্ট্রবিরোধী রচনাগুলিতে বা দুখবরদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে আমরা একটি গলিত মুমূর্ষু রাষ্ট্রের রূপকেই প্রত্যক্ষ করি—পরবর্তী কালে সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে যে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটবে এবং যার ভস্ম থেকে জন্মলাভ করবে সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলি। ঐ সময়কার সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বুর্জোয়া সমাজেও কতক পরিমাণে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিতে পুষ্ট গান্ধীজী সহজে টলস্টয়ের বাণীগুলিকে গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যপক্ষে আবার তিনি ছিলেন নবজাত ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের মুখপাত্র—নব ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠক। সুতরাং তিনি যখন গলিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতির আওতায় মানুষ হওয়ার ফলে টলস্টয়ের অহিংসা ও রাষ্ট্রবিরোধিতাকে গ্রহণ করলেন, তখন তিনি ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংগঠক হওয়ায় তাঁর পক্ষে টলস্টয় বা দুখবরদের মতো রাষ্ট্রবিরোধী হওয়াও সম্ভব হোলো না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থান, এই দ্বিবিধ বিরোধী অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি একদিকে যেমন হলেন শান্তিবাদী, অন্যদিকে তেমনি সংগ্রামশীল ; একদিকে যেমন রাষ্ট্রবিদ্বেষী, অন্যদিকে তেমনি নবরাষ্ট্র সংগঠনে ব্যাপৃত কর্মী ; একদিকে যেমন অহিংসার প্রচারক, অন্যদিকে তেমনি হিংসার সমর্থক। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা-ও মনে রাখা দরকার যে, এই স্বতবিরুদ্ধতা কেবল গান্ধীজীর চরিত্রের ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের সমগ্র ইতিহাসই এই :. শান্তির পথে সংগ্রাম, অহিংসার পথে হিংসা, আইনের পথে আইন-অমান্য, সহযোগের পথে অসহযোগ,—রাষ্ট্রবিরোধিতার পথে নব রাষ্ট্রের সংগঠন। এ ক্ষেত্রেও আমরা আবার লক্ষ্য করি, বুর্জোয়া এথিক্‌স্ বা নীতিপ্রবচনগুলিকে গান্ধীজী সেগুলির প্রতি বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ না ক'রেই গ্রহণ করেছিলেন। অঙ্গীকার পালন তাদের অন্যতম। আধা-গোলামরা মাত্র মুষ্টিমেয় সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়েই ছিল। শ্রমশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন শ্রমশিল্প ও কলকারখানার প্রসার হোলো, তখন শ্রমিকের চাহিদা ক্রমেই চললো বেড়ে। কিন্তু শ্রমিকরা প্রধানত ক্রীতদাস বা অর্ধক্রীতদাস রূপে সমাজে তাদের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই গণ্ডীবদ্ধ রইলো। সামন্ততান্ত্রিক শ্রমব্যবস্থা নবজাত বুর্জোয়া শ্রম-ব্যবস্থার উন্নতির অন্তরায় হয়ে উঠলো। ফলে দেশে

দেশে বুর্জোয়ারা চাইলো শ্রমিকদের মুক্তি—ক্রীতদাস বা অর্ধ-ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ। ধুয়া উঠলো ব্যক্তি-স্বাধীনতার—অর্থাৎ নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার বাজারে বুর্জোয়াদের কাছে শ্রমিকদের আপনার শ্রম বিক্রয়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার। দেশে দেশে এলো বুর্জোয়া 'গণ-বিপ্লব', যার প্রকৃষ্ট প্রকাশ হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যাদের ঠিক মানুষ ব'লে না ভাবলেও প্রাণী বিশেষ ব'লে ভাবা হ'তো, এবার তারা হয়ে উঠলো বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য মাত্র। শ্রমিক হোলো শ্রমশক্তি—বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির সগোত্র। শ্রমিকরা কেবল পণ্যের সৃষ্টি করতে লাগলো না, তারাও হয়ে রইলো পণ্য, ক্রীতদাসদের মতো। তাদের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ বা গোত্রভেদ রইলো, তা রইলো আসলে একঘোড়ার ইঞ্জিনের সঙ্গে পাঁচ ঘোড়ার ইঞ্জিনের যে প্রভেদ। হাজার টাকার ইঞ্জিনিয়ার এবং হাজার পয়সার মিস্ত্রী, বাজারে এদের ট্রেডমার্ক হোলো এক। ফলে বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন জন্ম দিলো অ্যাডাম স্মিথের, রিকার্ডোর, তেমনি পথ প্রশস্ত ক'রে দিলো কার্ল্ মার্ক্সের আগমনের—ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে যে বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তা পরিণত হোলো সত্যিকার শ্রমিক বিপ্লবে। ফরাসী বিপ্লবের জলন্ত প্রতিশ্রুতিকে আদায় করলো সোভিয়েত বিপ্লবের শ্রমিকরা। যাই হোক, ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নিজেদের স্বার্থের জন্যে বুর্জোয়ারা বানালো নূতন আইন, প্রচার করলো নূতন নীতি, বিস্তার করলো নূতন ধর্ম। আর এজন্যে তারা প্রধানত ফিরে চাইলো পেছনের দিকে,—যে পেছন তাদের আর বাঁধতে পারবে না, অথচ শ্রমিকদের বাঁধতে খুবই কার্যকরী হবে। বুর্জোয়ারা যে-দুটি নীতিকে সবচেয়ে বেশী প্রচার করলো, সেগুলি হোলো আইন-আদালতের ও প্রতিশ্রুতি পালনের পবিত্রতা। পূর্বেই বলেছি, গান্ধীজী আইন-আদালতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ব'লেই আইন-অমান্যকে তিনি বিপ্লবী পন্থারূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি পালনের পবিত্রতা সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে। এই নীতিগুলি অত্যন্ত ভালো জিনিস সন্দেহ নেই। সমাজে হিংসা হোক, মিথ্যাচার চলুক, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ঘটুক, এ কেউ চায় না—এবং কোনও আদর্শ সমাজে সেগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কিন্তু শ্রেণী-সমাজে এই নীতিগুলির উপর মূলত জোর দেওয়া হয় মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই শোষক ও শাসকরা যখন নিজেরা প্রতিমুহূর্তে প্রতিপদে হিংসাত্মক কাজ করে, কোটি কোটি মানুষকে অনাহারে অধ্যবসায়* রেখে পলে পলে তিলে তিলে হত্যা করে, তখনই তারা বা তাদেরই অর্থভোগী প্রচারকরা (অনেক সময় তাদের একান্ত অজ্ঞাতেই!) শোষিত

শাসিত জনসাধারণকে অহিংস্নক হ'তে শিক্ষা দেয়। ধনিকরা বা তাদের নিয়োজিত শাসকরা যখন প্রতিপদে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, প্রতিপদে—সংবাদপত্রে, সাহিত্যে, বেতারে, বক্তৃতায়, ইস্তাহারে—মিথ্যার করে অনুশীলন, ঠিক তখনই তারাই জনসাধারণকে বলে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রো না,—না খেতে পেয়ে পেটের দায়ে একদিন যে মাইনের চাকরি নিয়েছিলে, চিরদিন সেই মাইনেতে চাকরি ক'রে যাও, কড়া সুদে যে-টাকা ধার নিয়েছিলে, তা নিয়মিতভাবে শোধ ক'রে যাও, সমস্ত অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় নীরবে সহ্য করো, কারণ, তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, সত্যবদ্ধ, আর অঙ্গীকার মেনে না চলা মহাপাপ, সত্যের অবমাননা—ক্ষমার অতীত। গান্ধীজী শৈশবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিশ্রুতি-পালনের কাহিনীটি পাঠ করেছিলেন, অভিনয় দেখেছিলেন। কুশীদজীবী ভারতীয় হিন্দু সমাজে এই উপাখ্যানের বহুল প্রচার হওয়া ছিল খুবই সম্ভব। এবং নূতন বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সত্য-পালনের অনুরূপ কাহিনীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল স্বাভাবিক। দেশে অভাব, অনটন, শোষণ যতোই তীব্রতর হচ্ছিল, ততো নিঃস্ব হবার মহত্ত্বকে প্রচার করবার চেষ্টা চলছিল দেশে। যার ফলে হরিশ্চন্দ্রের হাসিমুখে দারিদ্র্য-বরণের কাহিনী বা গীতার বিষয়-বৈরাগ্যের বাণীকে সমাজে সচল করা হয়েছিল। গান্ধীজী শৈশবে হরিশ্চন্দ্রের সত্য-পালনের কাহিনী প'ড়ে বিগলিত হয়ে নিজের অজ্ঞাতে শ্রেণী-সমাজের এক বিরাট প্রচার-যন্ত্রের কবলিত হয়েছিলেন মাত্র। তাই সেই বুর্জোয়া প্রচারে দীক্ষিত নীতি অনুসারেই গান্ধীজী একদিন হননবিমুখ গাড়োয়ালী সৈন্যদেরও তিরস্কৃত করলেন এবং তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী, একথা ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র-ও কুণ্ঠিত হলেন না।[১]

তাই আমরা দেখি, শান্তি, অহিংসা, ক্ষমা, সৌভ্রাত্র্য, স্বাধীনতা, সত্য-পালন প্রভৃতি মানবতার বাণীগুলিকে বুর্জোয়ারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে। এবং গান্ধীজী সেই বাণীগুলির সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ বাহকরূপে আবির্ভূত হয়ে বুর্জোয়া স্বার্থের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। কারণ, শ্রেণীময়, শোষণময় সমাজে এই পবিত্র বাণীগুলি যখন প্রচারিত হয়, তখন তা কার্যকরী না হয়ে

১ শ্রেণী-সমাজের বহু নীতিকেই গান্ধীজী অবলীলায় বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বে অনশনব্রতের কথাটির উল্লেখ করেছি। দাতব্যও আর একটি। দান করা আমাদের সমাজে ধর্মে পরিণত হয়েছে। দান করাকে যে সমাজে ধর্ম ব'লে স্বীকার করা হয়, সে সমাজে দান-গ্রহণের উপযুক্ত দরিদ্রের অস্তিত্বকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। দান দারিদ্র্যকে সহনীয় করে, শোষককে করে মহিমান্বিত। এইভাবে শোষণকে শোভন এবং দীর্ঘস্থায়ী করবার সুযোগ দেয়।

কেবল শোষক শ্রেণীকেই সাহায্য করে। তাই গান্ধীজীর মতো মহাজনের মুখেও এই বাণীগুলি তাঁর অজ্ঞাতে অনিচ্ছাতে শোষক গোষ্ঠীর প্রচারের সহযোগিতা করলো, তাতে গণমানবের কোন কল্যাণ হ'লো না। এই শ্রেণী-সমাজে তাঁর অহিংসা হিংসার, ত্যাগ লালসার, এবং সত্যপালন শোষণের সহায়ক রূপেই আত্মপ্রকাশ করলো।

কেবল রাষ্ট্রবিরোধিতা বা অহিংসার ব্যাপারেই নয়, অন্যান্য বহু ব্যাপারেও আপাত-দৃষ্টিতে টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর সাদৃশ্য দেখা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য ছিল গভীরতর। এই পার্থক্যের মূল কারণ, আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি, তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সামাজিক অবস্থার প্রভেদ।

টলস্টয়ের রাষ্ট্রবিরোধিতা ও অহিংসার মতোই তাঁর অপর একটি উল্লেখযোগ্য জীবন-দর্শন হোলো নারী এবং নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত। টলস্টয়ের এই মতামতগুলি তাঁর সকল নাটক, উপন্যাস ও কথা-কাহিনীতে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। নারী এবং নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে টলস্টয়ের নির্ভীক নিঃসংকোচ মতামত সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর ক্রুয়েৎসার সোনাটা এবং আন্না কারেনিনা উপন্যাসের মধ্যে। টলস্টয় নারীকে কখনো কোনো কল্পিত মহিমায় ভূষিত করেন নি। পুরুষের মতোই তাদেরও ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রলোভিত করে, ক্ষুদ্রতর হিংসা-দ্বেষ করে প্ররোচিত—পুরুষের মতোই তারা যে হিংসাপরায়ণ, একথা জানতে বা জানাতে টলস্টয়ের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নি। তাঁর কিটি থেকে নাটাশা রস্টভ পর্যন্ত সমস্ত চরিত্রই দোষগুণে ভরা—তারা জীবন্ত এক-একটি প্রাণী। আর তারা জীবন্ত প্রাণী ব'লেই বুঝি সমাজে পবিত্র বন্ধনের নামে তাদের উপর রাত্রিদিন যে-অবিচার ও অত্যাচার চলে, তা দেখে টলস্টয় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।[১] বিবাহ নামক পুরুষের সৃষ্ট নারী-নিষ্পেষণ-যন্ত্রের কবল থেকে নারীদের নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে তিনি দাবি করেন নারীদের মুক্তি, তাদের আত্মগঠনের পরিপূর্ণ অধিকার। এ বিষয়ে তিনি ইবসেন, বিয়র্নসন বা বার্নার্ড শ-র সগোত্র। বুর্জোয়া অর্থনীতি একদা যে

১ গান্ধীজী নারীকে কখনো রক্তমাংসের জীবন্ত প্রাণী হিসাবে দেখেন নি। নারী তাঁর কাছে একটা idea মাত্র। তাই বিভিন্ন কাল্পনিক মহত্ত্বে তিনি নারীদের ভূষিত করেন এতো সহজে। তাই বিবাহিত জীবন গান্ধীজীর কাছে আদর্শ অবস্থা। স্বামীর সংসারে স্ত্রীর নিঃস্ব নিরুপায় নিপীড়িত অবস্থাই, গান্ধীজীর মতে, ত্যাগ, স্বার্থহীনতা, সহিষ্ণুতা। দরিদ্র ব্যক্তি এবং তার দারিদ্র্যকেও গান্ধীজী এমনি একটি মন-গড়া মহত্ত্বে ভূষিত করেন।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবি করেছিল, তা আসলে ভুয়া হ'লেও তারই সুদূরপ্রসারী উপসংহার রূপে সমাজের সকল স্তরের নরনারীই দাবি করলো স্বাধীনতা। বিবাহের কারাগার থেকে মেয়েরা চাইলো মুক্তি। পবিত্র বন্ধন ব'লে যে-বিবাহিত জীবনকে একদা প্রচারিত করা হোতো, তা যে বহু ক্ষেত্রে কেবল ঘৃণ্য দুঃসহ যৌন-জীবন মাত্র, তা ঘোষণা করলেন ইবসেন, টলস্টয়, শ। স্বামীরা-ও যে অনেক ক্ষেত্রে দিনের পর দিন স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, একথা, প্রকারান্তরে হ'লেও, তাঁরাই ঘোষণা করেন চূড়ান্তভাবে। বিবাহিত জীবন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই সংকুচিত করে, সংকীর্ণ করে—করে কুৎসিত, স্বার্থপর। আবার এ বিষয়ে টলস্টয় এবং শ[১] দুজনেই খ্রীষ্টের দোহাই দেন। দুখবর সম্প্রদায়ও বিবাহিত জীবনকে স্ত্রী এবং পুরুষের পক্ষে ব্যক্তিগত বিবেকের অনুসরণ করবার অনুকূল নয় ব'লেই ঘোষণা করেন, এবং তাঁদের মতে, বিবাহের চেয়ে যৌন-প্রেরণাই শ্রেষ্ঠতর। আর দুখবরেরা বিবাহ বিরোধিতাকে তাঁদের অন্যতম নীতি ও রীতি ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু টলস্টয়ের এই প্রভাব গান্ধীজীর উপর বিন্দুমাত্র ক্রিয়া করে নি। গান্ধীজী যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে টলস্টয়ের মতো রাষ্ট্রবিরোধী হ'তে পারেন নি, তেমনি হ'তে পারেন নি বিবাহ-বিরোধী। টলস্টয় ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী, সুতরাং বিবাহের নামে নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করবারও বিরোধী তিনি। টলস্টয় প্রভৃতির মতবাদের সংস্পর্শে আসায় বাক্যত গান্ধীজী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী হ'লেও কার্যত কখনো তার বিরোধিতা করেন নি—

---

১ যিশু-খ্রীষ্টের বিবাহ সংক্রান্ত মতামত সম্পর্কে শ বলেন :

"When we come to marriage and the family, we find Jesus making the same objection to that individual appropriation of human beings which is the essence of matrimony as to the individual appropriation of wealth."

টলস্টয়, শ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুসারেই (এঁদের কালে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে ভাঙন পুরোদমে শুরু হয়েছিল, তাই এঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী হয়েছিলেন) খ্রীষ্টের বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন।

বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গান্ধীজী (ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরম বিশ্বাসী তরুণ এক আধা-বুর্জোয়া আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে) যে মত প্রকাশ করেন, তার সমর্থনও খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে পাওয়া যায় :

"And they twain (husband and wife) shall be one flesh, so then they are no more twain but one flesh. What therefore God has joined together let not man put asunder." (Mark, x, 8. 9)

কারণ, তিনি একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিমাত্র ছিলেন। আর বুর্জোয়া শ্রেণী আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরম বিশ্বাসী। গান্ধীজীর কাছে রাষ্ট্র যেমন একটি 'আইডিয়াল' 'অ্যাবস্ট্রাক্ট্' পদার্থ, নারী ও বিবাহও ঠিক তেমনি। মেয়েদের সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণাটি নিতান্ত কাল্পনিক, ভাবগত—তা বিন্দুমাত্রও বাস্তবিক ও তথ্যগত নয়। তিনি বলেন, "Woman, I hold, is the personification of self-sacrifice,··" দারিদ্র্যের সম্পর্কে গান্ধীজীর যে রোমান্টিক আইডিয়ালিজম্ দেখা যায়, মেয়েদের সামাজিক অসহায় দুরবস্থা সম্পর্কেও তাঁর তেমনি একটি রোমান্টিক অবাস্তব মনোভাব আমরা লক্ষ্য করি। দারিদ্র্যের নিঃস্ব নিপীড়নকে গান্ধীজী যেমন ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কাল্পনিক সৌন্দর্যে ভূষিত করেছিলেন, তেমনি মেয়েদের সামাজিক রিক্ততা এবং নিরুপায় দুঃখ-সহনকেও তিনি একটি কাল্পনিক মহত্বে ভূষিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, সমাজের অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা নারীদের সম্পর্কে তিনি আত্মত্যাগ, স্বার্থহীনতা, অহিংসা প্রভৃতি মুখরোচক শব্দসম্ভাবের প্রয়োগ করেন, "···Woman is the incarnation of Ahimsa. Ahimsa means infinite love, which again means infinite capacity for suffering."

আর এই কারণেই বুঝি গান্ধীজী বলেন, অহিংস যুদ্ধই হোলো নারী-চরিত্রের পক্ষে একান্ত উপযোগী যুদ্ধ। "The beauty of non-violent war is that women can play the part in it as men. In a violent war, the women have no such privilege."[১] কিন্তু গান্ধীজী যদি ফরাসী বিপ্লবে বা রুশ বিপ্লবে মেয়েদের ভূমিকাটিকে নিরাসক্তভাবে লক্ষ্য করতেন, তবে এই ধরনের অযৌক্তিক অবান্তর উক্তি কখনো করতেন না, ব'লেই আমার বিশ্বাস।

মেয়েরা যে সংসার ও শিশু-পালন ছেড়ে বাইরে আসে, গান্ধীজী তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু যখন 'অহিংস যুদ্ধ' বেধে উঠলো, তখন গান্ধীজী তাদের ঠেকিয়ে

১ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইজিপ্ট যখন বিদ্রোহী হোলো, তখন সেখানে মেয়েরা কী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার একটি আতঙ্কগ্রস্ত বিবরণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র স্যার ভ্যালেন্টিন চিরলের নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়:

"The girls are indeed more violent than the boys.... It would be wrong to make light of the wide-spread bitterness that underlies this feminine upheaval."

সহিংস সংগ্রামে মেয়েদের মহত্ব মোটেই কমে নয়। 'পুণ্যবান্' হিন্দু পাঠক পুরাণে বর্ণিত ভয়ঙ্করী রণচণ্ডিকার মূর্তি কল্পনা করুন। সেই দাড়িম্বপুষ্পবর্ণা নৃমুণ্ডমালা এলোকেশীকে কি-সহজে ভোলা যায়?

রাখতে চাইলেন না। মেয়েরা সংসার ও শিশু-পালন ছেড়ে সংগ্রামে এসে যোগ দিলো দলে দলে। গান্ধীজীও তখন অধীর আনন্দে ঘোষণা করলেন :

"They (womem) saw that the country demanded something more than their looking after their homes. They manufactured contraband salt, they picketed foreign cloth shops, and liquor shops and tried to wean both the seller and the customer from both."

কিন্তু মেয়েদের যখন আবার, সহিংস যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, তখন গান্ধীজী সংসার-সেবা, স্বামীসেবা ও শিশু-পালনের অমোঘ মহত্ত্বের প্রচারক হয়ে ওঠেন। বলেন :

"In my opinion, it is degrading both for man and woman that woman should be called upon and induced to forsake hearth and shoulder the rifle for the protection of that hearth. It is reversion to brutality and the beginning of the end."

সুতরাং উপরোক্ত দুইটি উদ্ধৃত বাক্য পাশাপাশি রেখে যে-কোনো পাঠকই লক্ষ্য করবেন, গান্ধীজীর প্রতিবাদটি আসলে গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ ক'রে বাইরে আসার বিরুদ্ধে নয়—হিংসার বিরুদ্ধে। কিন্তু গান্ধীজী এখানে অন্যান্য বহু স্থলের মতোই শাব্দিক ধূম্রজালের সৃষ্টি করেছেন, ঋজু শাণিত যুক্তির পথে অগ্রসর হন নি। কিন্তু, অন্যপক্ষে, বার্নার্ড শ-কে দেখুন। তিনি-ও মারাত্মক যুদ্ধ-সীমান্তে নারীদের অংশ গ্রহণের বিরোধী। কিন্তু তাঁর যুক্তি দিনের আলোর মতোই প্রখর ও স্পষ্ট। শ বলেন, দেশের জনসংখ্যার সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই মেয়েদের মারাত্মক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা দরকার। যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে প্রাণহানি ঘটে। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত জনবিরল দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট রাখবার জন্যে সমাজে পুরুষের অপেক্ষা মেয়ের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। কারণ, বৎসরে একজন পুরুষ যখন অবহেলায় দশটি শিশুর জনক হ'তে পারেন, তখন মেয়েরা হ'তে পারেন মাত্র একটি সন্তানের জননী। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে জনসংখ্যার ক্ষতিপূরণ সহজে সম্পন্ন করবার দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক হওয়া দরকার। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েরা যদি পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করে, এবং সমানভাবে নিহত হয়, তবে যুদ্ধের ফলে জনবিরল জাতির জনসংখ্যা সহজে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শ হোলেন অবাধ যৌন

মিলনের প্রচারক। বিবাহিত বা অবিবাহিত যে-কোনো যৌন সম্পর্ক সন্তান-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে হ'লেই তাঁর কাছে তা সমর্থনযোগ্য বা শুদ্ধ, পবিত্র। একই পিতার ঔরসে কোনো মাতার গর্ভে পাঁচটি সন্তানের চেয়ে, পাঁচটি পিতার ঔরসে একই মাতার গর্ভে পাঁচটি সন্তানের জন্মকে তিনি সমাজের পক্ষে অধিক কল্যাণকর ব'লে মনে করেন। কিন্তু বিবাহের বাইরে কোনো যৌন সম্পর্কের সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সতীত্বের মহিমায় বিশ্বাসী। অবশ্য, যদি-ও সন্তান-সৃষ্টি তাঁর কাছে "nearest the divine". গান্ধীজী যখন সন্তানসৃষ্টির খাতিরেও বিবাহের বাইরে কোনোরূপ যৌন সম্পর্ককে প্রশ্রয় দেন না, তখন শ সন্তান-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'লে বিবাহকেও অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাই বিবাহকে শ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন, তিরস্কার করেন, বলেন, "licentious institution." অন্যপক্ষে বিবাহ সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত যেন খ্রীষ্টান টলস্টয় এবং শ-কে প্রতিবাদ জানায়:

"For me the married state is as much a state of discipline as any other. Married life is intended to promote mutual good both here and hereafter."[১]

কিংবা, "Marriage is a fence that protects religions. If the fence were to be destroyed, religion would go to pieces, the foundation of religion is restraint, and marriage is nothing but restraint".[২]

তাই এখানে আমরা সহজেই লক্ষ্য করি, টলস্টয় এবং শ 'ফিমিনিস্ট' বা নারী-

১ কিন্তু এর সঙ্গে খ্রীষ্টান বার্নার্ড শ-র কথা তুলনা করুন:

"A married man, he (Jesus) said, will try to please his wife and a married woman to please her husband instead of doing the work of God."

এ কেবল বার্নার্ড শ-র কথাই নয়—সেণ্ট পল থেকে শুরু ক'রে কার্লাইল, রাস্কিন ও টলস্টয় পর্যন্ত অন্যান্য খ্রীষ্টানদেরও কথা। এঁরা কমবেশী সকলেই বিবাহবিরোধী।

২ কিন্তু শ বলেন, বিবাহিত জীবন মানুষকে সংযম শেখায় না, মিতাচারী করে না, বরং তাকে অসংযমের সুযোগ দেয়, ক'রে তোলে ব্যভিচারী। কারণ, বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যৌনাচারের সুযোগ অত্যন্ত বেশী।

গান্ধীজী তাঁর নিজের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে অবহিত হ'লেই শ-র এই উক্তিকে স্বীকার ক'রে নিতেন। তাঁর মতো প্রতিভাকেও কখনো কখনো অমিতাচারী হ'তে হয়েছিল। তবে আর সাধারণ মানুষের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কী কথা?

স্বাধীনতার ঘোরতর প্রচারক হয়েও [1] কখনো নারীকে ভাবগত (idealised) রূপে দেখেন নি। তাঁদের কাছে নারী ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু গান্ধীজীর 'নারী' কল্পলোকবাসিনী, সে অহিংসা, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি মাত্র। শ ও টলস্টয় উভয়েই দেখেছেন নারী বিবাহের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজে পুরুষের পণ্যে পরিণত হয়েছে—পতিব্রত সতীত্বের পরিণতি ঘটেছে একবনিতার পণ্যবৃত্তিতে। (তাই বিবাহ শ-র কাছে পণ্যবৃত্তি বা prostitution মাত্র।) আর, প্রধানত এই কারণেই টলস্টয় ও শ প্রয়োজন হ'লে নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিজের বিবেকের ও হৃদয়ের বন্ধনের দিকেই সতর্ক লক্ষ্য দিতে উপদেশ দিয়েছেন মানুষকে। বিবাহ টলস্টয়ের কাছে পবিত্র কিছুই নয়, তা যৌন সম্পর্ক মাত্র।[2] কিন্তু, অপর পক্ষে, গান্ধীজী বিবাহ-বন্ধনকে কঠিন থেকে কঠিনতর ক'রে তোলারই পক্ষপাতী।

মেয়েদের কিভাবে বর্ণনা করতে হবে, সে সম্পর্কে গান্ধীজী উপদেশ দেন: "Before you put your pen to paper think of woman as your own mother". গান্ধীজীর উপদেশ শিরোধার্য। কিন্তু কারও তাঁর মাকে পিতার স্ত্রী রূপে দেখতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, মার সমস্ত মাতৃত্বের গৌরব বা সন্তানের অস্তিত্বের গোড়ার কথাই হোলো, পিতার সঙ্গে তাঁর যৌন-সম্পর্ক। সুতরাং মার অস্তিত্বের প্রথম কথা তাঁর পত্নীত্ব—রমণীত্ব থেকেই জন্মলাভ করেছে তাঁর জননীত্ব। একথা ভাবতে কুণ্ঠিত হবার কী কারণ থাকতে পারে? তাই আমরা দেখি, মেয়েদের সম্পর্কে গান্ধীজীর উপরোক্ত উপদেশ একদর্শী ও আংশিক। মেয়েকে ভাবগতভাবে দেখার ফলেই তাঁর এই অনিবার্য ত্রুটি ঘটেছে।

---

১ অবশ্য গান্ধীজীও নিজেকে নারী-স্বাধীনতার সমর্থক ব'লেই প্রচার করেন:

"I passionately desire the utmost freedom for our women."

কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনি নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বোঝেন, তা পরাধীনতার নামান্তর মাত্র। কারণ, তাঁর মতে, স্ত্রীর আত্মোন্নতি করতে হবে স্বামীর সহযোগিনী হয়ে, স্বামীর সঙ্গে অত্যন্ত অসহনীয় ঘৃণ্য অবস্থার মধ্যেও—একত্রে থেকে। স্ত্রীর পৃথক্ সম্পত্তির দাবিকেও তিনি বড়ো একটা প্রশ্রয় দেন না।

২ লেও টলস্টয়ের কাছে বিবাহ যৌন-মিলনের অতিরিক্ত কিছুই ছিল না, তা যতোই সমারোহের সঙ্গে ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হোক না কেন। তাই তিনি গান্ধীজীর অতি প্রিয় "The Kingdom of God" গ্রন্থে-ও ধর্মানুচরিত বিবাহ সম্পর্কে বিদ্রূপের সঙ্গেই বলেন;

"Moreover men are told that if a man and a woman desire to have their sexual relation sanctified they must come to church, put crowns of metal upon their heads, swallow some wine, walk three times round a table accompanied by the sound of singing and this will make their sexual relation holy and entirely different from any other." —P. 26

ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে-ও টলস্টয় ছিলেন এনার্কিস্ট, চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী। তাই তিনি গীর্জাকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর মতে, ধর্মানুশীলনের পক্ষে ব্যক্তির বিবেকই মুখ্য। তাঁর কাছে রাষ্ট্রের আদেশের মতোই গীর্জার আদেশও অতি তুচ্ছ। গান্ধীজী কিন্তু হিন্দু ধর্মের সামাজিক অনুশাসনগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেনে চলতেন। তিনি নিজের পরিচয় দিতেন একজন সনাতনী হিন্দু ব'লে। (ইয়াং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবরে লিখিত প্রবন্ধটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।)

আরো একটি প্রধান বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে টলস্টয়ের পার্থক্য দেখা যায়। কি হিন্দু ধর্মে, কি খ্রীষ্টান ধর্মে[১] এমন একদল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন visionary বা দিব্য-দ্রষ্টা। তাঁরা অনেক সময়ে এমন সমস্ত বস্তু দেখতেন, যা যুক্তিবাদী মানুষের কাছে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস্য নয়। আর এই কারণে-ই, বিশেষত খ্রীষ্টান দেশে দিব্যদর্শীদের কম নির্যাতনও হয় নি। 'হেরেটিক' আখ্যা দিয়ে জোয়ান অব আর্ককে তারা জীবন্ত দগ্ধ করেছিল। কারণ, জোয়ান অন্যান্য বহু খ্রীষ্টান সহধর্মীর মতোই inner voice বা ভগবৎ-প্রদত্ত অন্তরতর বাণীতে বিশ্বাস করতেন। তথাকথিত যুক্তিবাদী টলস্টয় visionary-দের বলেছেন fanatic.[২] টলস্টয় যদি রামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হতেন, তবে রামকৃষ্ণের চরিত্রও তাঁর কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য লাগতো। কিন্তু বস্তুত, এই ধরনের vision ও inner voice-এ অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ নেই। রোমাঁ৷ রোলাঁ তাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থে রামকৃষ্ণের এই ভাবাবিষ্ট দিব্যদর্শনকে মূলত ব্যাখ্যা করেছেন শিল্পীয় কল্পনা হিসাবে। তিনি রামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন সম্পর্কে বলেছেন, তা একপ্রকার শ্রেষ্ঠ plastic art বা মূর্তন শিল্প। যাঁরা গল্প, উপন্যাস বা নাটক রচনা করেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, একবার কল্পনায় বা শিল্প-সত্তায় তাঁরা তন্ময় হ'লে তাঁদের কাহিনীতে কল্পিত পাত্রপাত্রীরা দৃষ্টির সম্মুখে স্বতই জীবন্ত হয়ে ভাসতে থাকে। তাই আমরা দেখি, এই অনুভূতি ও কল্পনাশক্তিকে যদি তীব্রতম একটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া যায়,

১ মুসলমান ধর্মের প্রচারক হজরত মহম্মদ-ও প্রায়ই অনুরূপ দিব্য দর্শন লাভ করতেন। দিব্য দর্শন প্রথমে তাঁর কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। কিন্তু পরে এই দিব্য দর্শনই তাঁর অন্যতম প্রধান আশ্রয় হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে তাঁকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মহম্মদের দিব্যদর্শন সম্পর্কে তৎকালীন অনেকে অবিশ্বাসী হলে-ও তাঁর পরিচিতদের অধিকাংশই তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারতেন না। কারণ, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে মহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও সত্যবাদী। তাই তাঁকে তরুণ বয়স থেকেই পরিচিতরা বলতেন, "এল্ আমিন" বা The Faithful.

২ "Or when some fanatic beheld a vision" ইত্যাদি।

—The Kingdom of God, P. 75.

তবে মানুষের পক্ষে দিব্যদর্শন কেবল সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকও হয়ে ওঠে। রোমাঁ্যা রোলাঁ রামকৃষ্ণের জীবনের 'অতিপ্রাকৃতিক' ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেছেন একপ্রকার plastic art রূপে। তাই তিনি রামকৃষ্ণের শিল্পী চরিত্রের উপরই জোর দিয়েছেন সর্বাপেক্ষা বেশী। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী। তাই এই ব্যাখ্যাকে আমরা নিঃসংকোচে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু টলস্টয় নিজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়েও অনুভূতি ও কল্পনার এই রূপগ্রাহী শক্তিতে যে কেন বিশ্বাস করেন নি, তা সহজে বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে, গান্ধীজী inner voice-এ পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, যাকে অনেক আধুনিক যুক্তিবাদীর কাছে ভণ্ডামি ও বুজরুকি ব'লে মনে হয়। তাই এদিক থেকে তাঁকে টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনা না ক'রে করা চলে গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস ও কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ফক্স-এর সঙ্গে। সক্রেতিস ও জর্জ ফক্স, তাঁরা উভয়েই 'অন্তরতর বাণী-'তে বিশ্বাস করতেন। তাই কোনো সমস্যার সমাধানে অক্ষম হ'লেই তাঁরা তাঁদের 'অন্তরগুহাবাসী ভগবানের' শরণাপন্ন হতেন। জর্জ ফক্সের পক্ষে এ কাজটি মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা, ব্যক্তিগত বিবেকই যাঁদের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, তাঁদের পক্ষে অতীন্দ্রিয়বাদের এই চূড়ান্ত রূপটিকেই স্বাভাবিক লাগে। অবশ্য, সক্রেতিসের পক্ষে এই প্রকার mysticism অনেক পরিমাণে দুর্বোধ্য মনে হয়। কারণ, বুদ্ধদেবের মতোই সক্রেতিস-ও ছিলেন বোধি বা intellect-এর পূজারী। তাই বুদ্ধদেবকে কখনো কোনো দৈবাদেশের প্রতীক্ষা করতে দেখা যায় নি। কিন্তু সক্রেতিসকে কখনো কখনো দেখা যায়। তাই সক্রেতিসের অপেক্ষা বুদ্ধকেই আমরা শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিবাদী রূপে প্রত্যক্ষ করি। বোধিই বুদ্ধের পরম জ্ঞান। বুদ্ধি থেকেই তাঁর হৃদয়ের অহিংসা এবং প্রেমের জন্ম হয়েছে। শরাহত হংস এবং দেবদত্তের কাহিনীই যথেষ্ট নয়। অন্যপক্ষে, সক্রেতিস মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের দ্বারস্থ হ'তে চেয়েছেন একই সঙ্গে। তাই বুদ্ধের অপেক্ষা আমরা সক্রেতিসের সঙ্গেই গান্ধীজীর প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখি অনেক বেশী। সুতরাং এখানে গান্ধীজীর উপর সক্রেতিসের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, মনে করি।

বস্তুত, গান্ধীজীর উপর সক্রেতিসের প্রভাব রাস্কিন বা টলস্টয় অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। "সক্রেতিসের বিচার ও মৃত্যু" গ্রন্থখানি গান্ধীজী একদা অনুবাদ করেন এবং এই গ্রন্থ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। সক্রেতিসের মতামতের মধ্যে রাষ্ট্র-বিরোধী কিছুই ছিল না, সুতরাং সরকার কর্তৃক এই গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছিল, সম্ভবত সক্রেতিসের বাণীর জন্য নয়, গান্ধীজীর অনুবাদ হিসাবে।

কারণ, ঐ সময় যে কোনো রচনায় গান্ধীজীর করস্পর্শ থাকলেই তা বৃটিশ সরকারের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠতো। সক্রেতিস রাষ্ট্রবিরোধী ছিলেন না। কতক পরিমাণে হেগেলের মতোই রাষ্ট্র তাঁর কাছে একটি ভাবগত বা ideal রূপ গ্রহণ করেছিল। তাই রাষ্ট্র যখন তার বিচার ব্যবস্থার মারফত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং ক্রিটো প্রভৃতি তাঁর শিষ্য-সামন্তরা তাঁকে গোপনে রাষ্ট্র পরিত্যাগ ক'রে বিদেশে যেতে অনুরোধ করেছেন, তখন তিনি তাব প্রতিবাদে বলেছেন, রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা অন্যায়। অন্যায় দণ্ডাদেশের প্রতিরোধ অন্যায় রাষ্ট্র-বিরোধিতার দ্বারা করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর মতে, অন্যায় কখনো অন্যায়ের প্রতিরোধ করে না, অন্যায়কে আরো প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র। রাষ্ট্র-বিরোধিতা কেন যে অন্যায়, সে সম্বন্ধে সক্রেতিস বলেন, রাষ্ট্র তাঁকে অন্ন দিয়েছে, বস্ত্র দিয়েছে, শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ দিয়েছে, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। সুতবাং এ-হেন রাষ্ট্রেব বিরোধিতা করা তাঁর মতে সম্পূর্ণ অন্যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, সক্রেটিসের এই বাণী যখন প্রচারিত হয়েছিল, আথেন্স তখন অন্যান্য নগর রাষ্ট্রগুলিকে শোষণ ক'রে সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধিতে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই সক্রেতিস বা প্লেটোর প্রচারিত রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল একটি ভাবগত বস্তু। এই ভাবগত রাষ্ট্রই কল্পিত ও বর্ণিত হয়েছে প্লেটোর 'রিপাব্লিক'-এর মধ্যে। সহস্র সহস্র ক্রীতদাসের রক্তে ও ঘর্মে যে গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি গ'ড়ে উঠেছিল, তাকেই আদর্শ ক'রে দেশব্যাপী শ্রমিক-শোষণের ভিত্তিতে নাৎসী জার্মানিতে ও ফাসিস্ট ইতালিতে যে স্পার্টান সংস্কৃতির ভয়াবহ পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলেছিল, তা-ও আমরা সহজে ভুলি না। সুতরাং আমরা দেখি, সক্রেতিস বা প্লেটোর কাছে, তাঁদের শত মানবিকতা সত্ত্বে-ও, অসংখ্য দাস-শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ছিল আদর্শ রাষ্ট্র। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংগঠক গান্ধীজীর কাছে সক্রেতিসের বাণী যে একান্ত প্রিয় হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? বাস্তবিক পক্ষে, টলস্টয়ের অপেক্ষা সক্রেতিসই ছিলেন গান্ধীজীর পক্ষে অধিক উপযোগী। তাই লক্ষ্য করা যায়, টলস্টয়ের অপেক্ষা সক্রেতিসের সঙ্গে গান্ধীজীর চরিত্র ও মতবাদের সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত বেশী।

কিন্তু এ-বিষয়ে এ-ও লক্ষণীয় যে, নিজের উপর খ্রীষ্ট, টলস্টয়, রাস্কিন ও রায়চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে গান্ধীজী যতো মুখর, সক্রেতিস, এমন কি বুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কেও, তেমন নয়। ভগবান সম্বন্ধে বুদ্ধের তূষ্ণীম্ভাবই বুঝি তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজীর আবেগকে অনুচ্ছ্বসিত ক'রে তুলেছিল। কেবল তাই নয়, বুদ্ধদেব মূলত ছিলেন বুদ্ধিজীবী দার্শনিক ; অন্যপক্ষে খ্রীষ্ট ও গান্ধী, উভয়ের প্রধানতম আশ্রয় হোলো হৃদয়। তাই

বুদ্ধের অপেক্ষা খ্রীষ্টকেই গান্ধীজী তাঁর অধিকতর সগোত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইটিই সক্রেতিস সম্পর্কে গান্ধীজীর অপেক্ষাকৃত অনুচ্ছ্বাসের একটি কারণ হ'লে-ও, অপর কারণটি সম্ভবত দার্শনিক হিসাবে সক্রেতিসের দ্বান্দ্বিক পন্থার অনুসরণ। সক্রেতিস ছিলেন প্রাচীন dialectician-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তাঁর মতে বিপরীত জন্ম দেয় বিপরীতের। প্লেটো-বর্ণিত সক্রেতিস তাই 'ফীডো'তে ব'লেন :

"Then it is sufficiently clear to us that all things are generated in this way opposites from opposites. Then if life and death are oppsites, they are two and between them are two generations."

কিন্তু এই দ্বান্দ্বিক দর্শন সম্ভবত গান্ধীজীর ভালো লাগে নি। এই কয়েকটি কথার মধ্যে যে একটি বিরাট বিপ্লবী মতবাদ নিহিত আছে, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায় এবং গান্ধীজী সে সম্পর্কে হয়তো সচেতন-ও ছিলেন।

যাই হোক, গান্ধীজী যাকে তাঁর নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিমত ব'লে প্রচার করেন,—অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধের অসম্ভবতার বাণী,—তা-ও তিনি সক্রেতিসের কাছেই লাভ করেছিলেন :

"Neither if we ought never to do wrong at all, ought repay wrong with wrong as the world thinks we may ?"

তুলনীয়, 'ক্রিটো'তে উল্লিখিত সক্রেতিসের সেই নঞর্থক প্রশ্ন :

যদি অন্যায় করাই অনুচিত হয়ে থাকে, তবে অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের শোধ করা উচিত কেমন ক'রে? তাই সক্রেতিস বলেন, "Then we ought not to repay wrong with wrong or do harm to anyone, no matter what we may have suffered from him." অনুরূপ একটি আদর্শকেই গান্ধীজী সমস্ত জীবন মেনে চলেছিলেন। যারা তাঁর ওপর অত্যাচার করেছে, অবিচার করেছে, এমন কি তাঁকে গুরুতররূপে প্রহার করেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে, তাদের-ও তিনি শাস্তি দিতে চান নি, আদালতে অভিযুক্ত করেন নি। কারণ, সক্রেতিস ও গান্ধী, উভয়ের মতেই দণ্ডদান একপ্রকার পীড়ন মাত্র। আর সকল পীড়নই অন্যায়। তাঁদের উভয়ের কাছেই সত্য এবং ন্যায়ই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কথা। সক্রেতিসের কাছে কোনো কাজ অন্যায় কিনা, তাই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন। ন্যায়সঙ্গত কোনো কাজের ফলে যদি কোনো বিপদ ঘটে, যদি চরম ক্ষতি

হয়, তা হ'লেও ন্যায়ের পথ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়।[১] গান্ধীজীরও ওই একই কথা। 'সত্যের প্রয়োগ' করতে গিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতা না আসে, না আসুক। যদি 'অহিংসার সাধনা' করতে গিয়ে ভারতের কোটি কোটি মানুষ দুঃখ-দারিদ্র্যে, অনাহারে, অত্যাচারে মরে, মরুক। কিন্তু কি সক্রেতিস, কি গান্ধী, তাঁরা কেউ ন্যায় ও অন্যায়ের কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি। গান্ধীজীর স্নেহময় হৃদয়েব বিগলিত বাষ্প যেমন মানুষের কাছে সত্যকে ঝাপসা ও অস্পষ্ট ক'রে দিয়েছে, সক্রেতিসের যুক্তির তীব্র আলোকও তেমনি ধাঁধিয়ে দিযেছে মানুষের চোখ। মানুষ বোঝে নি যে, পৃথিবীর সত্য বড়ো জটিল; ন্যায় ও অন্যায় সেখানে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি ক'রে রয়েছে; অহিংসার হস্তে সেখানে হিংসার খড়্গ ঝলসে ওঠে, হিংসার রক্ত-সমুদ্রে ফোটে হাজারো অহিংসার শ্বেত শতদল। তাই সক্রেতিসের সংলাপগুলি বহু যুক্তির আলোক-তোরণ পার হয়ে মানুষকে যেখানে পৌঁছে দেয়, সেখানে মানুষের যুক্তি বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে যায়। মনে হয়, সক্রেতিস সমাজে প্রচলিত সকল মেকী সত্যকে অচল ব'লে ঘোষণা করেছেন সত্য, কিন্তু মানুষে তাঁর দেওয়া খাঁটি মুদ্রাটার সন্ধান পায় নি। বস্তুত, কোনো খাঁটি মুদ্রাই তিনি দেন নি, কারণ, তার নাগাল তিনি নিজেও কোনোদিন পান নি। অচলটাকে তিনি চিনেছিলেন, কিন্তু সচলটাকে খুঁজে পান নি। সমাজে প্রচলিত সত্যাসত্যের ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডকে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন, কিন্তু সত্যাসত্য ও ন্যায়-অন্যায়কে পরিমাপ করবার জন্যে নূতন কোনো মানদণ্ড তিনি গ'ড়ে তোলেন নি। সক্রেতিস যখন নিজে বলেছেন, বিচার কোরো না, শাস্তি দিও না, তখনই তিনি নিজেকে বিচারকের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় উপস্থিত করেছেন, একান্ত হাসিমুখে শাস্তির বিষপাত্র তুলে নিয়েছেন মুখে। গান্ধীজীকেও আমরা এমনি একটি ভাবেই দেখতে পাই। তিনি যখন অভিযোগ করবার, বিচার করবার[২], বা শাস্তি দেওয়ার বিরোধী, তখনই তিনি বারে বারে

১ এই গ্রন্থে প্লেটো-বর্ণিত সক্রেতিসের কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য, জেনোফন-বর্ণিত সক্রেতিসকে প্লেটো-বর্ণিত সক্রেতিসের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন মনে হয়। কেননা, জেনোফন-বর্ণিত সক্রেতিসের মতে, তার সুফলের উপরই কোনো কাজের ন্যায্যতা নির্ভর করে।

২ এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টের বাণী স্মরণীয়:

"Judge not, that we be not judged." (Matt. VII, 1.)

"Judge not according to the appearance, but judge righteous judgement." (John VII, 24)

"Judge not and we shall not be judged: condemn not and we shall be forgiven." (Luke VI, 37)

অভিযুক্ত হয়ে বিচারকের সম্মুখে শাস্তি গ্রহণের জন্যে হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বিচারকের দেওয়া দণ্ডকে নিতান্ত প্রাপ্যরূপেই গ্রহণ করেছেন। সক্রেতিস বা গান্ধী যে কেবল হিংসাত্মক শাস্তির কারণেই বিচারের বিরোধী ছিলেন, তা নয়। তাঁদের মতে, মানুষের অপরাধ ভ্রান্তি মাত্র, তা ইচ্ছাকৃত নয়, অজ্ঞতা-প্রসূত। সুতরাং অপরাধের জন্যে তাকে দায়ী করা চলে না। 'অ্যাপলজি'তে সক্রেতিস তাঁর অভিযোক্তা মিলেটাসকে বলেন :

"Either I do not corrupt youngmen at all or I corrupt them unintentionally and by reason of ignorance. As soon as I know that I am committing a crime, of course, I shall cease from committing it."

এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টের কথা-ও স্মরণীয়। তিনি তাঁর উৎপীড়ক বিচারকদের সম্পর্কে নাকি বলেছিলেন : ওরা কী করছে জানে না, ভগবান ওদের ক্ষমা করুন। গান্ধীজীও সক্রেতিস ও খ্রীষ্টের মতোই অপরাধীর উপর ক্রুদ্ধ হন না, তার অজ্ঞতার জন্যে করুণা অনুভব করেন। তাই তাঁর আততায়ীকেও তিনি ক্ষমা করবেন, একথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। কেবল ঘোষণা করেন নি, তিনি জীবনে বহুবার তাঁর জীবননাশে চেষ্টিত বহু অপরাধীকেই সস্নেহে ক্ষমা ক'রে গেছেন।

মৃত্যু সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই সক্রেতিসের কথা উল্লেখ করেছি। এখানে তার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করবো। সক্রেতিস অম্লানবদনে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, কারণ, তাঁর কাছে মৃত্যু ছিল এমন একটি বস্তু যাকে হৃদয়ংগম করার জন্যে তিনি সমস্ত জীবন সযত্নে সাধনা করেছিলেন। তাঁর মতে, যাঁরা সত্যিকার দার্শনিক, তাঁরা সমস্ত জীবন ধ'রে কেবল মৃত্যুকেই পর্যবেক্ষণ করতে চান। 'ফীডো'-তে সক্রেতিস বলেন :

"The world perhaps does not see that those who rightly engage in philosophy study only dying and death". [২]

১ আধুনিক পাঠক অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের কথা স্মরণ করবেন—যাঁর কাছে সকল ভ্রান্তিই (error) ইচ্ছাকৃত (intentional)।

২ মৃত্যু কি এবং কেমন, তা জানবার জন্যে টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের কী না আকুলি-বিকুলি! রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু কখনো প্রণয়ী, কখনো দেবতা, কখনো ভীষণ-ভয়াল, কখনো বা আবার অভিরাম, শ্যাম-সমান। "ওগো মরণ, হে মোর মরণ" ব'লে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর সমগ্র জীবনকে অঞ্জলি ভ'রে মহামৃত্যুর সম্মুখে তুলে ধরেছেন, মৃত্যু এক গণ্ডূষে তা নিঃশেষে পান ক'রে তাঁকে কৃতার্থ ক'রে দেবে। আবার কখনো

সুতরাং দার্শনিকের সমস্ত প্রচেষ্টাই যদি কেবল মৃত্যুর স্বরূপকে জানবার জন্যে নিয়োজিত হয়, তবে মৃত্যু যখন আসে, তখন তাকে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বরণ করতে বাধা কি? এই হোলো সক্রেতিসের প্রশ্ন। সক্রেতিস আরো বলেন: আত্মা দেহাতীত; কিন্তু আত্মা যখন দেহের সঙ্গে জড়িত থাকে, তখন দেহের মালিন্য ও স্থূলত্ব-ও তার সঙ্গে জড়িত হয়। তাই সত্য উপলব্ধির জন্যে দার্শনিকের প্রাণপণ প্রয়াস হোলো দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার।

"Verily we have learned that if we are to have any pure knowledge at all, we must be freed from the body, the soul by herself must behold things as they are." (সক্রেতিস, 'ফীডো')

এই কারণেই একশ্রেণীর দার্শনিক দেহকে পীড়ন করেন, দমন করেন, অবহেলা করেন, অস্বীকার করেন। সক্রেতিসের মতে:

"In every case he (a philosopher) will pursue pure absolute being, with his pure intellect alone. He will be set free as far as possible from the eyes and the ears and in short from the body because inter-course with the body troubles the soul and hinders her from gaining the truth and wisdom."

তাই অতীন্দ্রিয় সাধকরা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করেন, গান্ধীজী উপবাসে, অল্পবাসে দেহকে করেন পীড়ন, বলেন: এ তাঁর "crucifixion of the flesh."

মৃত্যুর সঙ্গে পলে পলে পরিচয়ই যখন দার্শনিকদের কার্য, তখন মৃত্যুকে বাধা দিয়ে তাঁরা বীরত্ব প্রদর্শন করবেন কেন; মৃত্যুকে নির্ভয়ে বরণের মধ্যেই তো তাঁদের পরম বীরত্ব:

".. all men but the philosophers are not free from fear...yet it

---

দেখি, মৃত্যুকে তাঁর কতো ভয়: "মৃত্যু-ও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।" আবার কখনো বা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনো পার্থক্য দেখেন না: "স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে, মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।" জীবন-মৃত্যু যেন তাঁর কাছে এক বিপুলা জননীর দুই স্তন, স্নেহ-সুরভির দুটি বৃন্ত। আবার কখনো রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে হেলায় হেসে চলে যান মৃত্যুঞ্জয় ব'লে ঘোষণা করেন আপনাকে: "আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে যাবো আমি চ'লে।" এমনি আরো কতো কল্পনা, কতো অনুভূতি, হাজারো রকমে হাজারো রঙে মৃত্যুকে জানবার, মৃত্যুকে আঁচবার হাজারো প্রয়াস! আর এই কারণেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক,—অন্তত পক্ষে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেতিসের মত অনুসারে।

is rather a strange thing for a man to be brave out of fear and cowardice." (সক্রেতিস, 'ফীডো')

তাই সক্রেতিস অবলীলায় বিষপাত্র মুখে তুলে নেন: নিরস্ত্র গান্ধী সশস্ত্র আততায়ীর সম্মুখে অবহেলায় উন্নত বক্ষে এসে দাঁড়ান। এঁরা উভয়েই মৃত্যু কি তা জানেন না, তবে কল্পনা করেন, অনুমান করেন। সক্রেতিস বলেন:

"For the state of death is one of these two things : either with the death man wholly ceases to be or loses all sensation ; and according to the common belief it is change and migration of the soul into another place, and if death is the absence of sensation and like the sleep of one whose slumbers are unbroken by any dreams, it will be wonderful." (সক্রেতিস, 'অ্যাপলজি')

মৃত্যুতে মানুষের হয় অস্তিত্ব থাকে না, নয় সে ঘুমিয়ে পড়ে এমন ঘুমে, যে ঘুমে স্বপ্নের দৌরাত্ম্য নেই। শোকসন্তপ্ত ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে গান্ধীজী একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি যা লিখেছিলেন, তাকে সক্রেতিসের উপরোক্ত কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি ব'লে মনে হয়।

তাই আমরা দেখি, সক্রেতিস ও গান্ধী, উভয়েই সত্যিকার দার্শনিকের মতোই ছিলেন মৃত্যুভয়হীন, ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

"In truth···the true philosoper studies to die, and to him of all men is death least terrible." (সক্রেতিস, 'ফীডো')

তাই গান্ধীজীকে মৃত্যুর আতঙ্কে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে আমরা দেখিনি, মৃত্যুর আতঙ্ক তাঁকে ক'রে তোলেনি দুর্দম, দুঃসাহসী। সক্রেতিস-কথিত আদর্শ দার্শনিকের মতোই তিনি দীপ্ত তেজের সঙ্গে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিবারেই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন, জীবনে বহুবার, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাই, অন্ততপক্ষে সক্রেতিসের মত অনুসারে, স্বীকার করতেই হবে যে, গান্ধীজীর দর্শন যতোই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। গান্ধীজী যদি দার্শনিক না হন, তবে তিনি কিছুই নন্। অবশ্য, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তাঁর এই দর্শন অভ্রান্ত ছিল না।

সক্রেতিস ও গান্ধী, এঁদের উভয়ের দৈব-সংকেতে বিশ্বাসের কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। তবে গান্ধীজীর দৈব-সংকেতের সঙ্গে সক্রেতিসের দৈব-সংকেতের একটি গভীর পার্থক্য ছিল। সক্রেতিসের দৈব-সংকেত ছিল কেবল নিষেধাত্মক।

"I have had it from childhood : it is a kind of voice which

whenever I hear it always turns me back from something which I was going to do, but never urges me to act." (সক্রেতিস, 'অ্যাপলজি')

কিন্তু গান্ধীজী দৈব-সংকেতের বা inner voice-এর প্রতীক্ষা করতেন নিষেধ ও নির্দেশের জন্যে, উভয়ত।

সুতরাং গান্ধীজীর নৈতিক চিন্তায় ও দর্শনে, কিংবা সেগুলির দৈনন্দিন অনুশীলনে সক্রেতিসের প্রভাবকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করা যায় না। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রাস্কিন ও টলস্টয়ের মতোই সক্রেতিসও ছিলেন গান্ধীজীর মূল চিন্তা-গুরুদের একজন।

গান্ধীজী যেমন তাঁর ভগবদ্‌গীতা এবং বৌদ্ধধর্মের প্রথম পাঠ ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে পেয়েছিলেন, তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রথম পাঠও তিনি ইংরেজী সাহিত্যের মারফত-ই পান। মহম্মদের জীবন ও বাণীর প্রতি তাঁকে শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তোলে ওঅশিংটন আর্ভিং- ও বিশেষত টমাস কারলাইল-রচিত মহম্মদের জীবনী। কারলাইল তাঁর 'হিয়েরো অ্যাজ এ প্রফেট' শীর্ষক বক্তৃতায়[১] মহম্মদ সম্পর্কে সচরাচর প্রচলিত বিরুদ্ধবাদী ভ্রান্ত ধারণাগুলির নিরসন করেছিলেন। তিনি প্রামাণ্য যুক্তির সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, মহম্মদ ছিলেন খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক মাত্র।[২]

---

১ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা। এই বক্তৃতা পরে তাঁর 'Hero and Hero-Worship' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

২ বস্তুত, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহম্মদের অভ্যুত্থানের সময়ে সিরিয়ায় ও আরবে বাইজেণ্টাইন খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ছিল প্রচুর। ঐ সময়ে মক্কায় খ্রীষ্টানদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তাঁদের জন্যে পৃথক গীর্জা এবং কবরখানাও ছিল। তাছাড়া দেশে এবং আশেপাশে নেস্টরিয়ান খ্রীষ্টান সাধুদের মঠও ছিল যথেষ্ট। এমন কি আরব পরিবারে ক্রীতদাসের মধ্যেও খ্রীষ্টানদের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু আরবরা একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা সত্ত্বেও ছিল বহু দেবদেবীর উপাসক। এই দেবদেবীর মধ্যে হোবাল, মানাত, এল্ ওজ্জা এবং এল্লাৎ প্রভৃতিই প্রধান। একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মে তখন ভাঙন ধরেছে, শাস্ত্রের বিচার ও আচার নিয়ে তারা সাবেলিয়ান, ডসেট, আরিয়ান, ইউটিকিয়ান, জ্যাকোবাইট, মনোফিজাইট, নেস্টরিয়ান, মেরিআমাইট, কলিরিডিয়ান, এ্যান্টিডিকো-মেরিয়ামাইট, এবিঅনাইট, মার্সিঅ-নাইট, ভ্যালেন্টাইনিআন, বাসেলিডিআন, কার্পোক্রাটিআন, রাকুসিআন প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম হারিয়েছিল তার সজীবতা ও শক্তি। তাই পৌত্তলিক আরব জাতিকে একেশ্বরবাদী ক'রে তোলার জন্যে প্রয়োজন ছিল এক নবজাত একেশ্বরবাদী ধর্মের। মহম্মদের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম পুনর্জন্ম লাভ করলো। মহম্মদ তাঁর কোরানের মধ্যে জোনা, মোজেজ প্রভৃতি বাইবেলে বর্ণিত সকল মহর্ষিকেই স্থান দিলেন এবং খ্রীষ্টকে, কেবল অন্যতম মহর্ষি হিসাবে নয়, ভগবানের বাণীমূর্তি (Word, Verb) হিসাবে গ্রহণ করলেন। মহম্মদ ঘোষণা করলেন, তিনি নিজে রসুল আল্লা বা ভগবানের বাণীবাহক মাত্র। তাঁর মধ্যে ভ্রান্তি ও ত্রুটি সম্ভব। কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও সম্ভব

এই বিষয়ে কার্লাইলের পরবর্তী কালের দুইজন শক্তিশালী লেখকের মতামত স্মরণীয়। জর্জ বার্নার্ড শ ও এচ. জি. ওএল্স্। ওএল্স্ মহম্মদকে ধর্মপ্রচারক নামের অযোগ্য ব'লে বর্ণনা করেছেন। কারণ সম্পর্কে বলেছেন, মহম্মদ ছিলেন একাধিক নারীতে আসক্ত এবং তিনি তরবারিহস্তে ধর্মপ্রচার করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তরবারিহস্তে ধর্মপ্রচারেব পক্ষে কারলাইল বলেন, খ্রীষ্টধর্মও তরবারির দ্বারাই স্তাক্‌সনদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তি সম্ভবত এচ. জি -র মনঃপূত হয় নি। না হবারই কথা। এচ. জি. ইতিহাসকে, নীতিকে, কখনো তাদের কালগত পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন নি। তাঁর কাছে ইতিহাস কেবল পুঞ্জীভূত স্তূপীকৃত ঘটনামাত্র—যে ঘটনাস্তূপকে তিনি তথাকথিত সনাতন নীতি ও আদর্শের মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে চেয়েছেন। তিনি বারেকের জন্যেও লক্ষ্য করেন নি যে, ধর্ম বা নীতি তবল পদার্থের মতো, তা বিভিন্ন সামাজিক অবয়বে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জুডিয়াতে খ্রীষ্টধর্ম প্রথমে আইনানুগভাবে এবং অহিংসার পথে আত্মপ্রকাশ করলেও পরে তাকে একদা অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। মহম্মদের সময়কার আরবেও যদি বিভিন্ন উপজাতীয় শাসন-ব্যবস্থা না থেকে রোম সাম্রাজ্যের মতো কোনো বিশাল শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা থাকতো, তবে মহম্মদ কখনো অস্ত্রধারণের কথা কল্পনা-ও করতেন না। তা ছাড়া, মহম্মদ তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রথম তেরো বৎসর সম্পূর্ণ অহিংসভাবে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু কোরেশী ধনীদের ষড়যন্ত্রের ফলে যখন মুসলমানদের বেঁচে থাকা-ও অসম্ভব হয়ে উঠলো, তখন

নয়। কারণ ঈশা (যিশু খ্রীষ্ট) ভগবানের বাণীবাহক নন, তিনি বাণীমূর্তি—Word, Spirit of God. খ্রীষ্টানদের দ্বারা স্বীকৃত খ্রীষ্টের মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের স্বীকৃত খ্রীষ্টের মৃত্যুকাহিনীর একটি বিরোধ দেখা যায়। খ্রীষ্টানরা বলেন, যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং মুসলমানরা বলেন, ঈশা ক্রুশবিদ্ধ হন নি, ঈশার অনুরূপ চেহারার একটি মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এই মতান্তরটি মূলত কোরানের একটি শ্লোকের (ছয়, ১৫৬) উপর প্রতিষ্ঠিত :

"Yet they slew him not, neither crucified him, but he was represented by one in his likeness...they did not really kill him, but God took him up unto Himself, and God is mighty and wise."

যাই হোক, কোরানে প্রায়ই বাইবেল ও গস্‌পেলগুলির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে যে, যদি কোরানের কোনো অংশ সম্পর্কে কারো সংশয় থাকে, তবে যাঁরা খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেছেন, তাঁদের প্রশ্ন ক'রে দেখা হোক। (কোরান, দশ, ৯৪) অর্থাৎ মহম্মদ-প্রচারিত ইসলামের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম এক নবজীবন লাভ করেছিল। সেদিক থেকে ইসলামকে খ্রীষ্টধর্মের একটি শক্তিশালী শাখা বলা চলে। বলা চলে নয়—বস্তুত, তা-ই।

অস্ত্রধারণ ছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। ইসলামকে অনেকে উদ্ধত, হিংসাত্মক ধর্ম ব'লেই বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বস্তুত, মহম্মদের ধর্ম হোলো ইসলাম অর্থাৎ 'বিনতির ধর্ম'। হিন্দুরা অভিবাদন করেন, 'নমস্কার', অর্থাৎ নত হই। মুসলমানরা অভিবাদন জানান, 'সালাম'—'শান্তি হোক্'।

একাধিক বিবাহের অভিযোগে মহম্মদকে অপরাধী ক'রে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর একপত্নীব্রত ইংরেজ এচ. জি. বুদ্ধি বা ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দেন নি। হিন্দুদের মধ্যে আমরা বহু আদর্শ ব্যক্তিকেই একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে দেখেছি; এমন কি "ভগবান" শ্রীকৃষ্ণকেও বহুবল্লভ ব'লেই পৌরাণিক কাহিনী-কিংবদন্তীতে প্রচারিত করা হয়েছে। মহাসতী দ্রৌপদীর স্বামীভাগ্য ছিল অতুলনীয়, সংখ্যার দিক থেকেও। কিন্তু সেজন্যে বিংশ শতাব্দীর নব্য হিন্দুরা-ও কখনো কৃষ্ণকে বা দ্রৌপদীকে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা করেন নি। সমাজে নারীর ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে অসাম্য থাকলেই বহুবিবাহ অনিবার্য। মহম্মদ যে-সমাজের মানুষ, সে-সমাজে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা সাধারণত বেশি থাকাই ছিল স্বাভাবিক। দাস-বিক্রয়ের প্রথা এবং উপজাতীয় সংঘর্ষের ফলে সমাজে পুরুষের সংখ্যা যে নারীর অপেক্ষা কম ছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং সামাজিক প্রথা অনুসারে মহম্মদ যে একাধিক বিবাহ করবেন, তাতে বিস্ময়ের বা বিরক্তির কি আছে? কেবল তাই নয়, মহম্মদের এই বহুবিবাহ ছিল অনেক পরিমাণে কূটনীতিরও অঙ্গ—পরবর্তীকালের সম্রাট আকবরের হিন্দু রাজকন্যা বিবাহের মতো। কোরেশীদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আবু বকরের কন্যা আয়েসা এবং ওমরের কন্যা হাফসাকে বিবাহ ক'রে মহম্মদ যে ইসলাম প্রচারের পথকে সুগম ক'রে তুলেছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এচ. জি. ওএল্‌স্‌ যখন মহম্মদকে বিংশ শতাব্দীর নীতির মানদণ্ডে পরিমাপ ক'রে নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন, তখন গ কিন্তু মহম্মদের জীবন ও বাণীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে মহম্মদের আপত্তি ছিল না। তিনি প্রত্যেক কর্মের বিচার করতেন তার উদ্দেশ্য দিয়ে।

"An action must be judged by its intention."—Mahomet, (Bokhari, 1)

আধুনিক কালের লেনিন বা স্তালিনকেও আমরা অনুরূপ মত পোষণ করতে দেখি। উদ্দেশ্যই উপায়কে ন্যায়সংগত ও নীতিসংগত ক'রে তোলে। যদি শান্তি

স্থাপনের জন্যে হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, যদি শ্রেণীহীন সমাজ গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন হয় শ্রেণীচেতনাকে তীব্র ক'রে তোলার, তবে তাতে তাঁদের বিন্দুমাত্র বাধা বা দ্বিধা নেই। তাই লেনিন ও স্তালিন যেমন শ-র একান্ত প্রিয় ছিলেন, তেমনি শ-র একান্ত প্রিয় ছিলেন মহর্ষি মহম্মদও। মহম্মদের এই হিংসা ছিল বিপ্লবীর হিংসা। কারণ, বিপ্লব যখন পূর্ণ হোলো, যখন মহম্মদ বিজয়ীরূপে মক্কায় ফিরে এলেন, তখন তিনি যে ক্ষমা, করুণা ও মানবিকতা দেখিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। একাধিক বিবাহ সম্পর্কে শ-র মতামত অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিবাহ কেমনভাবে ভিন্নতর রূপ লাভ করেছে, বহুপত্নীত্ব থেকে একপত্নীত্বে,—বহুপতিত্ব থেকে একপতিত্বে, সে সম্পর্কে সংস্কারের জড়িমাবর্জিত আলোচনা তিনি তাঁর 'Getting Married' নাটকের মুখপত্রে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং বহুবিবাহের জন্যে মহম্মদকে নিন্দা না করবার মতো ঐতিহাসিক বুদ্ধি শ-র ছিল।

কারলাইলও মহম্মদকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব রূপে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। হজরত মহম্মদের বিরুদ্ধে যতো প্রকার অপপ্রচার ঘটেছে, তিনি সেগুলির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন :

"For current hypothesis about Mahomet, that he was a scheming impostor, a Falsehood Incarnate, that his religion is a mere mass of quackery and fatuity, begins really to be now untenable to anyone."

সত্যই, কারলাইলের এই কথাগুলি পড়লে কারলাইলের পৌত্রপ্রতিম এচ. জি. ওএল্‌স্‌কে নিতান্তই প্রাচীনপন্থী মনে হয়।

পূর্বেই বলেছি, ধর্মপ্রচারে অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে কারলাইল মহম্মদের উপর দোষারোপ করেন নি। খ্রীষ্টধর্মের তরবারি গ্রহণ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন :

"We do not find of the Christian religion either that it always disdained the sword when once it had got one. Charlemagne's coversion of the Saxons was not by preaching."

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টানদের words যে sword-এ পরিণত হয়েছিল, তা আমরা লক্ষ্য করি।

কেবল ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মই যে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে তরবারি গ্রহণ করেছিল,

তা নয়। ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের আদর্শও ছিল তাই।[১] গীতায় হিংসাত্মক যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দেহ নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর। দেহের হত্যায় আত্মার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সুতরাং দেহের হত্যায় অন্যায় কোথায়?[২]

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব গান্ধীজীর উপর আগেই পড়েছিল। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মের আরব সংস্করণ ইসলামকে মেনে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হোলো না। বিশেষত, মহম্মদের ইয়াথ্রিব (মদিনা) পলায়নের পূর্ব পর্যন্ত মহম্মদের জীবনেতিহাস ত্যাগ, সারল্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার দিক থেকে গান্ধীজীর জীবনের কথাই সহজে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরে মহম্মদ বিজয়ীর বেশে যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি যে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন, তা-ও তাঁকে মহিমান্বিত ক'রে তোলে। সত্যের সাধকরূপে মহম্মদের অতি অল্প বয়স থেকেই খ্যাতি ছিল। তাঁর ধর্মপ্রচারের পূর্বেও সবাই তাঁকে "এল্ আমিন" বা সত্যবাদী ও সুবিশ্বস্ত নামেই অভিহিত করতো। মহম্মদকে বহুবার স্বীয় মতবাদের জন্যে প্রথম জীবনে লাঞ্ছিত, প্রহৃত, অত্যাচারিত হ'তে হয়েছিল। তখনো আমরা দেখি, মহম্মদ নত-নম্রভাবে সমস্ত লাঞ্ছনা-অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'রে যাচ্ছেন, এমন কি তাঁর ওপর যখন কঠিন প্রহার চলেছে, তখনো তিনি তার প্রতিবাদ করছেন না, কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। তাছাড়া, মহম্মদ ও গান্ধী, এঁরা উভয়েই মদ্যপান ও জুয়া খেলার বিরোধী ছিলেন।[৩] উপাসনা, উপবাস ও ত্যাগ ছিল মহম্মদের ধর্ম। এই দুই চরিত্রের মধ্যে আরো একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। উভয়কেই সত্যপ্রচার

---

১ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম মূলত ছিল শোষক শ্রেণীর ধর্ম। সে-ধর্মের বিরুদ্ধে ভারতে জনসাধারণের ধর্ম—কি শৈব ধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম—যখনই দেখা দিয়েছে, তখনই সে তার প্রতিরোধ করেছে, নৃশংস হস্তে। তাই গীতায় যেমন আছে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রচার, মহাভারতে বা পৌরাণিক কাহিনীতে-ও তেমনি আছে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে হীন প্রচার। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মবিদ্বেষী মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব, প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা নরক এবং শৈবধর্মী মহারাজ বাণকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

২ বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ (গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭)

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
(গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০)

৩ মদিনাতে থাকা-কালেই মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই পান ও দ্যূতক্রীড়া-বিরোধী নীতির প্রবর্তন করেন। কারণ, মদ্যপান এবং দ্যূতক্রীড়া থেকে মুসলমান-শিবিরে প্রায়ই আত্মঘাতী কলহের উদ্ভব হোতো। ধর্ম-যুদ্ধের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়েছিল। মহম্মদ হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন, গান্ধীজী অহিংসার। মহম্মদের সময়কার আরব দেশ যদি রোম বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হোতো, তবে মহম্মদের পক্ষে ধর্মের জন্যে অস্ত্রধারণের নীতি গ্রহণীয় হ'তো কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। তেমনি সংশয় আছে, ভারতবর্ষ যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হয়ে কয়েকটি উপজাতির দেশ হোতো, তবে গান্ধীজী নীতিধর্ম প্রচারের জন্যে অস্ত্র গ্রহণ করতেন কিনা।

যাই হোক, গান্ধীজী গীতাকে যেমন অংশত গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি অংশত গ্রহণ করেছিলেন ইসলামকে। তাঁব স্থান ও কালের অনুপযুক্ত ব'লেই তিনি হিংসার দিকটিকে আমল দেন নি।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি, গান্ধীজী প্রায় সকল ধর্ম থেকেই কিছু কিছু সূত্রকে তাঁর সমকালীন সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছিলেন এক সনাতন ধর্মের নামে। গান্ধীজী তাঁর এই "সনাতন ধর্মের" নাম দিয়েছিলেন "নীতি-ধর্ম"।

তাঁর এই নীতিধর্ম কি, তা এখন বিচার্য। তিনি *Ethical Religion* গ্রন্থে বলেন: 'The highest moral law is···that we should unremittingly work for the good of mankind." সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলকে লক্ষ্য ক'রেই কাজ করবার নাম নীতি-ধর্ম। মানব-সমাজের কিসে কল্যাণ হবে, সেই উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করাই নীতিসংগত কাজ। তাই কেবল উদ্দেশ্যই আমাদের কাজকে নীতিসংগত বা দুর্নীতিমূলক ক'রে তোলে। "We see· ·that the morality of an action depends ultimately on the nature of the motives that prompt it." কোনো ভালো কাজ ভালো হ'তে পারে না, যদি তার পেছনে শুভ উদ্দেশ্য না থাকে। গন্ধীজী এ সম্পর্কে একটি উদাহরণও দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দানশীল হয়ে ওঠে, তবে সেই দান নীতিসংগত হ'তে পারে না। "The very action may be moral or immoral according to the motive that prompts it." কিন্তু কৌতূহলের বিষয়, তিনি যখন বলেন যে, উদ্দেশ্যই একমাত্র মানদণ্ড যা ভালো কাজকে নীতিসংগত করে বা না করে, তখনো তিনি শুভ উদ্দেশ্যে উদ্‌বুদ্ধ কোনো "মন্দ কাজ"কে—যেমন, শ্রেণী-শোষণের উচ্ছেদের জন্যে হিংসাত্মক সংগ্রামকে—নীতিসংগত ব'লে স্বীকার করেন কিনা, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর নীতিধর্ম গ্রন্থে বিন্দুমাত্র আলোচনা করেন নি। কেবল তাই নয়, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো যুক্তিপূর্ণ সুস্পষ্ট মতামত ছিল ব'লেও মনে হয় না। অবশ্য, তিনি বলেন: "In judging the actions of men one should always

apply this test—whether it conduces to the welfare of the world or not." এই নীতি অনুসারে অবশ্য গান্ধীবাদের অপেক্ষা মার্ক্‌সবাদকেই অধিক নীতিসংগত বলা চলে। কারণ, গান্ধীজীর ত্যাগ ও অহিংসার বাণী মানুষকে ত্যাগী ও অহিংস করে নি, কেবল ত্যাগ ও অহিংসার অজুহাতে দারিদ্র্য ও অন্যায়কে দীর্ঘস্থায়ী ক'রে তুলেছে। ফলে, সমাজের কোনো কল্যাণ হয় নি, সমাজে হিংসা ও লালসা আরো ভয়াবহভাবে বেড়েছে। অন্যপক্ষে, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও হিংসাত্মক বিপ্লবের পথেই মার্ক্‌সবাদ পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশে অন্যায় শোষণ ও শ্রেণী-বিদ্বেষকে দূরীভূত করেছে।

তাই, আমরা দেখি, গান্ধী এই উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির অবতারণা ক'রেই যেন চমকে উঠেছেন। তিনি দেখেছেন, তাঁর এই কথাগুলি তাঁকে এক ভয়াবহ উপসংহারের গহ্বর-প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। তাই তিনি এক লম্ফে পেছনে হঠে এসে অকস্মাৎ যেন আর্তনাদ ক'রে উঠেছেন: "The end cannot justify the means".[১]

কেবল গান্ধী নয়, সকল আদর্শবাদীর মধ্যেই যুক্তির এইরূপ স্ববিরোধিতা প্রায়ই দেখা যায়। সুবিখ্যাত আমেরিকান লেখক হেন্‌রি ডেভিড থরোর[২] রচনা

১ যদি সন্দেহ হয়, পাঠক গান্ধীজী-রচিত Ethical Religion গ্রন্থের ৯-১০ পৃষ্ঠা দেখুন। সেখানে নিম্নলিখিত দুটি বাক্য নিতান্ত পাশাপাশি রয়েছে: "Hence no action can be called moral unless it is prompted by a moral intention. The end cannot justify the means." দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের উপসংহার নয়, আকস্মিক অস্বীকৃতি মাত্র। গান্ধীবাদের স্ববিরোধিতার এটি একটি চরম দৃষ্টান্ত।

২ থরো-র (১৮১৭-৬২) প্রভাব গান্ধীজীর উপর আংশিক মাত্র ছিল। ১৮৪৫ সালে থরো সমাজবিরোধী ব্যক্তিস্ববাদের একনিষ্ঠ সাধক রূপে জীবনযাপনের জন্যে জন-সমাজ পরিত্যাগ ক'রে ওঅল্‌ডেন অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি রবিনসন ক্রুসোর মতোই নির্জনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন, এমন কি নিজের বাসোপযোগী কুটিরখানি পর্যন্ত স্বহস্তে রচনা ক'রে নেন। এই অরণ্যবাস কালে থরো-র মধ্যে একদিকে যেমন সমাজবিরোধী ব্যষ্টিবাদী চিন্তা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি তিনি প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অনাবৃত সংস্পর্শে আসায় তাঁর মধ্যে প্রাকৃতিক নীতি ও রীতিগুলিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুচিন্তিত আকার ধারণ করে। গান্ধীজী থরো-র উগ্র ব্যষ্টিবাদী চিন্তাগুলিকে যখন গ্রহণ করলেন (কারণ, ভারতীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পক্ষে এই ব্যষ্টিবাদী দর্শনই ছিল অনুকূল), তখনই থরো-র হিংসাত্মক সংগ্রামী উপদেশগুলিকে তিনি সতর্কতার সঙ্গেই এড়িয়ে গেলেন। (অবশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিও সেজন্য দায়ী।) প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় অহিংসার ধর্মকে থরো স্বাভাবিক ব'লে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেন:

"I love to see that Nature is so rife with life that myriads can be afforded to be sacrificed and suffered to prey on one another." আবার অন্যত্র, "Poison is not poisonous after all, nor are any wounds fatal. Compassion is very untenable ground. It must be expeditious."

থেকে অনুরূপ একটি অযৌক্তিক যুক্তির উল্লেখ করা চলে। এ বিষয়ে স্মরণীয় যে, হেন্‌রি ডেভিড থরোর প্রভাব গান্ধীজীর উপর প্রচুর পরিমাণে ছিল ব'লে অনেকের বিশ্বাস। থরো বলেছেন: If he (a man) is in love, he loves ; if he is in heaven, he enjoys ; if he is in hell, he suffers. It is his condition that determines his locality," এখানে মানসিক অবস্থা অর্থেই থরো condition কথাটি প্রয়োগ করেছেন, যদিও সে প্রয়োগ অত্যন্ত শিথিল হয়েছে। প্রথম বাক্যে থরো বলেছেন, "যে প্রেমে পড়ে, সে ভালোবাসে ; যে স্বর্গে থাকে, সে আনন্দ উপভোগ করে ; যে নরকে থাকে, সে যন্ত্রণা পায়।" অর্থাৎ প্রেমে, স্বর্গে বা নরকে অবস্থানই (locality) মানুষের মানসিক অবস্থা—ভালোবাসা, আনন্দ উপভোগ, যন্ত্রণা পাওয়া প্রভৃতি conditionকে নির্ধারিত করে। কিন্তু থরো দার্শনিক হিসাবে ছিলেন আইডিয়ালিস্ট বা ভাববাদী। তাই তাঁর কাছে মানুষের মনই —অবস্থা বা circumstance নয়—মানুষের মানসিক অবস্থার চূড়ান্ত নির্ধারক অর্থাৎ বিধাতাপুরুষ। তাই তিনি তাঁর নিজের প্রদত্ত যুক্তির দিকে লক্ষ্য না রেখেই নিতান্ত অভ্যাসবশে অকস্মাৎ বলে ওঠেন: মানসিক অবস্থাই মানুষের পারিপার্শিক অবস্থাকে নির্ধারিত করে—"It is his condition that determines his locality."

গান্ধীজীও ঠিক থরোর মতোই নিজের প্রদত্ত যুক্তির দিকে লক্ষ্য না রেখে নিতান্ত অভ্যাসবশেই অকস্মাৎ ব'লে ওঠেন: "The end cannot justify the means."

আসলে, ভাববাদী দর্শনের স্বরূপই হোলো এই!

তথাকথিত আধুনিক লেখক আল্‌ডাস্‌ হাক্‌স্‌লি একদা উগ্র গান্ধীবাদী হয়ে উঠলেও যখন তিনি পর্যটকের জীবন যাপন করতেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন তিনি প্রকৃতির কেবল উদার সস্নেহ ভাবটিকেই স্বীকার করেন নি। প্রকৃতি তাঁর কাছে কখনো কখনো ভয়ংকর নৃশংস দানবের মূর্তিতে-ও দেখা দিয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে ওআর্ডস্বার্থ বা ওআর্ডস্বার্থের ভক্তদের এককালে তীব্র তিরস্কার ও বিদ্রূপ করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন, প্রকৃতির অবারিত কবলে পড়লে রুশোর এমিল আর ওআর্ডস্বার্থের লুসির কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেঁচে থাকাও হয়তো সম্ভব হোতো না। কিন্তু হাক্‌স্‌লির দৈহিক দৃষ্টির মতোই মানসিক দৃষ্টিও কখনো স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ ছিল না। তাই তিনি পরবর্তীকালে কোনো সত্যিকার নীতিবাদে গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি। অন্যান্য আইডিয়ালিস্টদের মতোই স্ববিরোধিতার গোলকধাঁধায় তিনিও জড়িয়ে পড়েছিলেন।

যাই হোক, সমগ্র গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমরা থরো-র একটি বাণী স্মরণ না ক'রে পারি না:

"The broadest and most prevalent error requires the disinterested virtue to sustain it."

বস্তুত, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত নিঃস্বার্থপরতা, উদার হৃদয় এবং স্নেহশীল মহত্ত্বই যে গান্ধীবাদের অন্যতম প্রধান শক্তি এবং আশ্রয় ছিল, এ কথা-ও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গান্ধীজী তাঁর *Ethical Religion* গ্রন্থে উদ্দেশ্যের উপরই নীতির সমগ্র জোরটুকু দিয়ে ফেললেও আল্‌ডাস্‌ হাক্‌স্‌লি প্রভৃতি গান্ধীবাদীরা কিন্তু গান্ধীজীর অপেক্ষা অধিক সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা পরম জ্ঞানের আধার ব'লে গ্রহণ ও ঘোষণা করেছেন "The hell is paved with good intentions" কথাগুলিকে।[১] তাঁরা বলেন, শুভ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়, উপায়ও যথেষ্ট শুভ হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্য ও উপায়কে এক হ'তে হবে। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে পথ ও গন্তব্যস্থান এক ও অভিন্ন না হ'লে পদক্ষেপই অসম্ভব। যে পথিকের গন্তব্য স্থলের দিকে একপাও অগ্রসর হবার ইচ্ছা নেই, কেবল সেই পথিকই পথকে গন্তব্য স্থান ব'লে মেনে নেয় বা পথকে গন্তব্য স্থানের চেয়ে পবিত্রতর মনে করে। তাই উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়ের দিকেই মনোযোগ দেয় তারা বেশী, তারা তীর্থপথকেই পবিত্রতর ব'লে ঘোষণা করে তীর্থের চেয়ে। তাই তাদের উদ্দেশ্য কখনো কাজে পরিণত হয় না, অভীষ্ট তীর্থে গিয়ে তারা কখনো উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। তারা উপায়কেই উদ্দেশ্য বানিয়ে—তীর্থপথকে তীর্থ ব'লে ঘোষণা ক'রে—তাদের সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু অন্যপক্ষে মহম্মদ,[২] লেনিন ও স্তালিন উপায়ের চেয়ে উদ্দেশ্যকেই বড়ো ক'রে দেখেছেন, তাই কণ্টকিত পথে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তপদে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং নিজ নিজ মানস-তীর্থে তাঁরা উপনীত হয়েছেন।

এইভাবে আমরা দেখি, উদ্দেশ্য ও উপায়ের দ্বন্দ্ব-কলহে গান্ধীজীর নীতিবিজ্ঞান বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। নীতি সম্পর্কে গান্ধীজী আর এক স্থানে বলেছেন: "Another feature of moral law is that it is enternal and immutable...The sun is visible to us when our eyes are open and becomes invisible when they are closed. This does not mean any change in the sun, but only in our vision."

অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিকের মতোই এখানেও আবার গান্ধীজীর একদর্শিতা দেখা যায়। তাঁরা বাইরের জগৎ বা object থেকে ব্যক্তি বা subject-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে গান্ধীজী বলেছেন: কেউ যখন চোখ মেলে তাকায়, তখন সে সূর্যকে দেখে এবং যখন সে চোখ বন্ধ করে, তখন সে আর সূর্যকে

১ আল্‌ডাস্‌ হাক্‌স্‌লির 'Ends and Means' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২ মহম্মদ অন্যান্য ধর্ম-প্রচারকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন। তাই তাঁর কল্পিত স্বর্গে খাদ্য, পানীয় ও বিলাসের প্রাচুর্যই অধিক দেখা যায়। কারলাইলও এ সম্পর্কে বলেন: "He had an eye for the world, this Mahomet."

দেখতে পায় না। সুতরাং গান্ধীজীর মতে, এখানে আমরা সূর্যের মধ্যে (object-এর মধ্যে) কোনো পরিবর্তন দেখি না, পরিবর্তন দেখি আমাদের দৃষ্টির মধ্যে (অর্থাৎ subject-এর মধ্যে)। কথাটি সত্য। কিন্তু এর বিপরীতটিও যে অনুরূপ সত্য, গান্ধীজী তা অন্যান্য idealist দার্শনিকের মতো লক্ষ্য করেন নি। এখানেই গান্ধীজী তথা গান্ধীবাদের একদর্শিতা। কেবল দৃষ্টিশক্তির মধ্যে পরিবর্তন এলেই যে আমরা সূর্যকে দেখবো বা না-দেখবো, তা নয়। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ও অক্ষুণ্ণ থাকলেও, যদি সূর্যের অবস্থানের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে, তা হ'লেও সূর্যকে দেখতে পাবো না। যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কিংবা রাত্রিতে। আইডিয়ালিস্টরা কিন্তু এই পারস্পরিকতায় বিশ্বাস করেন না। সেই তাঁদের চরম ত্রুটি। ব্যক্তি ও বস্তুর (subject ও object-এর) পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাসী হ'লে গান্ধীজী কখনো তাঁর নীতি-সূত্রকে সনাতন ও শাশ্বত ব'লে ঘোষণা করতেন না, ভিন্ন স্থানে ও কালে যে নীতি-সূত্রের নিরন্তর পার্থক্য ঘটেছে, তা লক্ষ্য কবতেন। আইডিয়ালিস্ট দার্শনিকরা যখন কেবল ব্যক্তির উপর জোর দেন, তখন আবার ফরাসী 'যান্ত্রিক' বস্তুবাদীরা কেবল অবস্থার (circumstances) উপরই জোর দিতেন। এই দুটি বিরোধী মতবাদ যে কেবল বিরোধী নয়, পরিপূরকও, তা প্রমাণ ও প্রচার করেন মার্ক্‌স্‌ ও মার্ক্‌স্‌-বাদীরা। বস্তু ও ব্যক্তি তাঁদের কাছে পারস্পরিক সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত।

এই গেল গান্ধীবাদী নীতির স্বরূপ। আবার দেখি, নীতির সঙ্গে ধর্মের কি সম্পর্ক, সে নিয়েও গান্ধীজী কম বিপদে পড়েন নি। এই সম্পর্ক সম্বন্ধেও তাঁর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি কখনো বলেন: "Religion is to morality what water is to the seed that is sown in the soil." অর্থাৎ ধর্ম জল এবং নীতি বীজ। কিন্তু আবার তিনি বলেন: "Just as a building falls to the ground when the foundation is shaken, all religions must sink in the dust if their moral basing were to be disturbed." ধর্ম প্রসাদ, নীতি তার ভিত্তি। ধর্ম নীতির উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, গান্ধীজী-প্রদত্ত পূর্বের উপমাটি যদি পাঠকের মনে থাকে, তবে তিনি বুঝবেন, গান্ধীজী এখন বলেছেন, বীজের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে জল !! কেবল তাই নয়, পর মুহূর্তেই গান্ধীজী আবার বলেন: "It follows from what has been said that the true religion is, in fact, identical with morality." সত্যিকার ধর্মের সঙ্গে নীতির কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ জল ও সত্যিকার বীজ একই পদার্থ! "Religion, then, is synonymous with allegience to moral law."

এইরূপে আমরা গান্ধীজীর নীতিধর্মকে কতকগুলি বিভিন্ন অভিমতের সামঞ্জস্যহীন সংকলন রূপেই লক্ষ্য করি।

সুতরাং গান্ধীজী যখন তাঁর রাজনীতির সঙ্গে ধর্মালোচনা ও ধর্মানুশীলন করতে লাগলেন, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি তাঁর সুবিধা-মতো সময়োপযোগী কয়েকটি নীতি-সূত্রকে গ্রহণ ও অভ্যাস করলেন মাত্র। এই নীতি-সূত্রগুলি যখন আবো পঁচিশ বছর বাদে আর সময়োপযোগী রইলো না, তখন সেগুলিই ভারতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিলো। সকল দেশে, সকল কালে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পের এই একই ইতিহাস। ভারতবর্ষের বা গান্ধীজীব ক্ষেত্রেও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি।

॥ নয় ॥

ভারতশফর শেষে গান্ধীজী ব্রহ্মদেশ ভ্রমণেও যান। এই ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, "বোম্বাই যেমন ভারতবর্ষ নয়, রেংগুনও তেমনি ব্রহ্মদেশ নয়।" তাঁর কাছে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের মতোই তার মুষ্টিমেয় শহরের মধ্য দিয়ে নয়, অসংখ্য গ্রামের মধ্য দিয়েই ধরা দিয়েছিল। এই সময়ে আবার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা ক'রে তাঁর ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে আসেন। ঐদিন গোখলে তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি ফার্স্ট ক্লাসে গেলে আমি আসতাম না। কিন্তু এখন আর না এসে পারি না।" সাধারণ মানুষের জন্যে এঁদের করুণা ও সহানুভূতি যে আন্তরিক ছিল, তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবু ইতিহাসের কঠিন নিয়ম অনুসারে এঁরা ধনিক ও জমিদারের লড়াই-ই ক'রে গেছেন। এঁদের কালের গণ্ডি তার ঊর্ধ্বে বা বাইরে এঁদের কখনো যেতে দেয় নি।

গোখলের ইচ্ছা ছিল, গান্ধীজী বোম্বাইয়ে ব'সে প্র্যাক্‌টিশ করেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। গান্ধীজীরও সেই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু নিজের ব্যারিস্টারি করবার ক্ষমতার উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। তাই প্রথমে তিনি রাজকোটে ফিরে গেলেন। সেখানে কয়েকটা কঠিন মামলা চালিয়ে তাঁর নিজের ওপর খানিকটা আস্থা যেন হোলো। এবার তিনি বোম্বাই থেকেও মামলা চালাবার জন্যে ডাক পেলেন, ফলে বোম্বাইয়ে গিয়ে প্র্যাক্‌টিশ শুরু করলেন। কিন্তু শীঘ্রই আবার দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক এসে গেল। চেম্বারলেন সাহেব আসছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাঁর কাছে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একটা ডেপুটেশন্‌ পাঠাতে হবে। তাই অবিলম্বে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন। চার-পাঁচজন ভারতীয় যুবক তাঁর সঙ্গে গেলেন। তাঁদের মধ্যে মগনলাল গান্ধী একজন।

চেম্বারলেন এসেছিলেন বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশ সরকারের খরচ বাবদ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকা আদায় করতে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানেই সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে ব্যয়িত অর্থটা তারা সেখান থেকেই উদ্ধার করেছে। ভারতবর্ষেও তারা তা-ই করেছিল। সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের জন্যে, কিম্বা অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যে, ভারতে ব্যয়িত সমস্ত অর্থের ভার বহন করতে হয়েছে ভারতবাসীকেই। সুতরাং বুয়ার যুদ্ধের

ব্যয়ভারও বহন করতে হোলো বুয়ারদেরই। এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে চেম্বারলেন সাহেব এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে, ভারতীয়দের আবেদন-অভিযোগে কর্ণপাত করবার মতন সময় তাঁর ছিল না। আর কর্ণপাত ক'রেই বা কি করবেন? বুয়াররা যে অত্যাচার-অবিচার ভারতীয়দের ওপর করেছে, বৃটিশ পুঁজিও তো এবার তা-ই করবে। কারণ, বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় তথা এশীয় পুঁজির প্রতিযোগিতা তারাও তো চায় না।

যাই হোক, মাত্র কয়েক সপ্তাহ থাকবার কথা ছিল মিঃ চেম্বারলেনের। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই সারা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে শেষ করবেন, স্থির করেছিলেন। তাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাঁকে ঝড়ের বেগে ছুটতে হোলো। শীঘ্রই তিনি নাতাল ছেড়ে ট্রান্সভাল রওনা হয়ে গেলেন। ভারতীয়দের আবেদন-নিবেদনও প্রিটোরিয়া গিয়ে করাই স্থির হোলো। কিন্তু বুয়ার যুদ্ধের পর ট্রান্সভালে প্রবেশ সম্পর্কে কড়া আইন-কানুন চালু হয়েছিল। ছাড়পত্র ছাড়া সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের সময় যারা দোকানপাট ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছিল, তাদের পুনর্বসতির হুকুম দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ছাড়েরও ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে ভারতীয়রা ছাড় চাইলেই পেতো না। ট্রান্সভালের ঔপনিবেশিক সরকার এইভাবে ট্রান্সভাল থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদায় করতে চেয়েছিল। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র গান্ধীজীর পক্ষে ছাড়পত্র পাওয়া সহজে হয়ে উঠলো না। গান্ধীজী তাঁর পুরাতন বন্ধু ডারবানের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজাণ্ডারের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর সাহায্যে একটি প্রবেশপত্র কোনরকমে সংগ্রহ করলেন। কিন্তু তাতেও বিপদের শেষ হোলো না, ভারতীয় প্রতিনিধিদল থেকে গান্ধীজীকে বাদ দেওয়ার জন্যে বৃটিশ আমলারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। প্রথমে তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করবার কথা ভাবলো, কিন্তু অবশেষে স্থির করলো অন্য অজুহাতেও তাঁকে প্রতিনিধিদল থেকে বাদ দেওয়া যাবে। কারণ হিসাবে দেখানো হোলো, যেহেতু নাতালে গান্ধীজীর সঙ্গে চেম্বারলেনের সাক্ষাৎ হয়েছে, সেইহেতু বর্তমান প্রতিনিধিদলে তাঁকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমলাদের কাছে গান্ধীজীকে অনেক অপমান-লাঞ্ছনাও সইতে হোলো। তাঁর এই অপমানে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রতিনিধিদল পাঠাবেন না স্থির করলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের বোঝালেন যে, এখন ভারতীয়দের শক্তিসঞ্চয়ের সময়, তাই তাঁদের এখন অতো বেশি অনুভূতিপ্রবণ হ'লে চলবে না। ফল হোক্ না হোক, প্রতিনিধিদল

একটা পাঠাতেই হবে, প্রয়োজন হ'লে তাঁকে নিজেকে বাদ দিয়েও। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়েই প্রতিনিধিদল পাঠানো হোলো।

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করলেন ভারতীয় ইংরেজ ব্যারিস্টার জর্জ গড্‌ফ্রে।

প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে কোনো লাভ হোলো না, হবে ব'লে বড়ো একটা আশা-ও ছিল না। তবু সংগ্রাম শুরু করবার আগে গান্ধীজী আপোস-আলোচনার বিধিসংগত পথগুলো শেষ ক'রে রাখতে চাইলেন। সেদিক থেকে এই প্রতিনিধিদল প্রেরণকে সংগ্রামের ভূমিকা হিসাবে ধরতে হবে।

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী আমলারা প্রথম থেকেই গান্ধীজীকে মনে-প্রাণে ভয় করতো। তাই তারা তাঁকে মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে কেবল দেখা করতে না দিয়েই বিরত থাকলো না, অবিলম্বে তাঁকে ট্রান্সভাল ত্যাগ করবার আদেশ দিলো। কিন্তু এই আদেশ সহজে মেনে নেওয়া-ও গান্ধীজীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তিনি ন্যায়সংগত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে চাইলেন না। তাই তিনি ট্রান্সভাল ত্যাগ তো করলেনই না, বরং ট্রান্সভালে থেকেই ওকালতি করবেন স্থির করলেন। ফলে, অবিলম্বে তিনি জোহানেসবার্গে তাঁর ওকালতির অফিস খুলে বসলেন। ওকালতিতে গান্ধীজীর পসার দ্রুত বেড়ে চললো। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেলো উত্তরোত্তর। তাঁর স্নেহসজল উদার হৃদয় ও বিপুল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ থেকে দূরে থাকা মানুষের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও অনেকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠলো। রীচ সাহেব তো এক ব্যবসায়ী কোম্পানির ম্যানেজারের পদ ছেড়ে দিয়ে এসে গান্ধীজীর কাছে ক্লার্ক হয়ে রইলেন। পসার হওয়ার সঙ্গে অফিসের কেরানী-সংখ্যাও বাড়লো। টাইপিস্ট হয়ে এলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তবে কেবল অর্থোপার্জন নিয়েই গান্ধীজী মত্ত রইলেন না। তখন তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মুক্তিসাধন। তাই জনসংগঠন ও জনসেবার দিকেও তিনি মনোযোগী হলেন। ধর্মানুশীলনও চলতে লাগলো সমান তালে। অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভয় হোলো, 'বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ' পুরুষের অবস্থা-প্রাপ্তি তাঁর না ঘটে। তাই গীতার 'সমভাব', 'অপরিগ্রহ', 'নিষ্কাম কর্ম' প্রভৃতি কথাগুলি কেবলই তাঁর চেতনায় ও চিন্তায় ফিরে ফিরে আসতে লাগলো। এইভাবে কর্মের সঙ্গে ধর্মের মিলন ঘটাবার যে চেষ্টা বহু পূর্বে তাঁর জীবনে শুরু হয়েছিল, তা ক্রমেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো—সে পরিণতি বারে বারে এলো রাজনীতিতে বিপর্যয়রূপে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিঅন' পত্রিকাটি প্রথম বার হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মনসুখ লাল নাজর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনার ভার এসে পড়েছিল গান্ধীজীর নিজের ওপর। পত্রিকার ব্যয়ভারের অধিকাংশ তাঁকেই বইতে হোতো, প্রতি মাসে সেজন্যে তাঁর লাগতো প্রায় এগারো শ টাকা। পাছে বিষয়-সম্পত্তিতে ও ভোগবিলাসে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, এই ভয়ে গান্ধীজী ইতিপূর্বেই সাংসারিক ব্যয় অত্যন্ত কমিয়ে ফেলেছিলেন, এবারে তিনি জীবনবীমার প্রিমিয়াম দেওয়া-ও বন্ধ ক'রে দিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি হয়ে উঠলেন বীমাবিরোধী। তিনি বললেন, যারা ভীরু, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারাই বীমা করে। এ বিষয়ে জর্জ বার্নার্ড শ-র কথা মনে পড়ে। তিনিও ছিলেন জীবনবীমার বিরোধী। তাঁর মতে, বীমা এক প্রকার জুয়াখেলা, বস্তুত বীমা কোম্পানির সঙ্গে মানুষ বাজি রাখে। বীমা কোম্পানি বলে: 'আপনি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মরবেন না'। আর মানুষ বলে, 'মরবো নিশ্চয়ই।' সুতরাং বাজি। নির্দিষ্ট সময়ের আগে লোকটি মারা গেলে কোম্পানি বাজিতে হারে এবং নির্দিষ্ট টাকা দিতে বাধ্য হয়। অন্য পক্ষে, লোকটি না মরলে কোম্পানি জেতে, পুরস্কারস্বরূপ সে স্বল্প সুদে দীর্ঘকালের মেয়াদে টাকা ধার পায়। বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জনের বিরোধী ছিলেন বার্নার্ড শ। আর জুয়াখেলা হোলো বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জন। তাই তিনি জুয়া ও জীবনবীমার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

শ অংশত মার্ক্‌সের ছাত্র। তাই তাঁর কাছে ধর্মনীতি প্রশ্রয় পায় নি, পেয়েছে অর্থনীতি। শ-র নৈতিক নিয়মগুলিকে প্রধানত অর্থনীতিই নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। অন্যপক্ষে, গান্ধীজী তাঁর জীবনে ও সমাজে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ায় সামাজিক নীতির নির্দেশগুলিও তাঁর কাছে এসেছে ধর্মের—অর্থাৎ ঈশ্বরের—দোহাই দিয়ে। গান্ধীজীর চরিত্রের সঙ্গে শ-র চরিত্রের মূল পার্থক্য এখানে। শ বুদ্ধিবাদী, যুক্তিতে তাঁর গভীর বিশ্বাস। গান্ধীজী অতীন্দ্রিয়বাদী, হৃদয়ের উপর তাঁর পরম নির্ভর। তাই শ উদ্‌বর্তনবাদী, গান্ধীজী সনাতনী। শ তাকান সম্মুখে, গান্ধীজী পশ্চাতে। তাই আমরা দেখি, শ ও গান্ধী, উভয়েই মানবহিতৈষী হওয়া সত্ত্বেও, উভয়ের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী, উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে।

গান্ধীজীর জীবনে ধর্ম ও রাজনীতি ছিল যেমন দুটি প্রধানতম দিক, তেমনি আর একটি প্রধান দিক ছিল—সেবা। তাঁর কাছে এই সেবা কেবল তাঁর ধর্মানুশীলনের অঙ্গমাত্র ছিল না, ছিল তাঁর রাজনীতিরও অঙ্গ। সেবার ফলেই তাঁর নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কারণ, তিনি সেবার দ্বারাই একদা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষাণ-মজুরের

হৃদয় হরণ করেছিলেন, যে কৃষাণ-মজুরের সাহায্য ও সাহচর্য ভিন্ন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেবল সেবার মধ্য দিয়েই যে তিনি একদা নেতার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবেন, এ পরামর্শ সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যেই :

"· ·but whosoever will be great among you, shall be your minister : And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all" (Mark x 43, 44)

যেভাবেই হোক সেবার পথেই শ্রেষ্ঠত্বকে আয়ত্ত করতে হবে, গান্ধীজী একথা বুঝেছিলেন। তাই রাজনীতি ও ধর্মানুশীলন সংক্রান্ত কাযকলাপ তাঁর যতোই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, সেবার কাজেও তিনি ততোই নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করলেন। ট্রান্সভালে তাঁর সেবাকার্য চললো পূর্ণোদ্যমে, কুলী বস্তি নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের 'কুলী' বলা হোতো, আর এই কুলীরা দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে ছিল অস্পৃশ্য। একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তাদের বাস করতে হোতো, আর বাসস্থানেও তাদের জমিজমা কেনার কোনো অধিকার ছিল না। ফলে ভারতীয়দের বাসের জন্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলটা মনুষ্যবাসের উপযোগী না হয়ে, হয়ে উঠেছিল নোংরা জঘন্য একটা আস্তাবল। জমিতে মালিকানা স্বত্ব না থাকায় এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি বা পরিচ্ছন্নতার দিকে ভারতীয় ধনিকরা যেমন লক্ষ্য দিতো না, তেমনি শ্বেতাঙ্গ ধনিক-পরিচালিত সরকার বা পৌরবিভাগের লক্ষ্যও সেখানে কখনো পৌঁছতো না। এমনিভাবেই এই অঞ্চলটি দিনে দিনে ভয়াবহভাবে অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় পল্লীর এই অস্বাস্থ্য ও অপরিচ্ছন্নতাটাই আবার শ্বেতাঙ্গ ধনিক-পরিচালিত সরকার তথা পৌর-বিভাগের কাছে এই অঞ্চল থেকে ভারতীয়দের উচ্ছেদের সুযোগ হিসাবে দেখা দিলো। পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিতাড়িত অধিবাসীদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও হোলো একটা। তবে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে রীতিমতো আইন-আদালত করতে হোতো। গরীব ভারতীয়দের পক্ষে তা করা প্রায় ছিল অসম্ভব। তাই ব্যাপারটি গান্ধীজী নিজের হাতে নিলেন। মামলায় মিউনিসিপ্যালিটি হারলে মামলার ব্যয় মিউনিসিপ্যালিটিকেই বহন করতে হোতো। সুতরাং স্থির হোলো, হারজিত যাই হোক, প্রত্যেকটি মামলার জন্যে ভারতীয়রা তাঁকে দশ পাউণ্ড ক'রে দেবে। তাছাড়া, যেসব মামলায় মিউনিসিপ্যালিটির হার হবে, সে ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্রাপ্য মামলা বাবদ খরচও গান্ধীজীই নেবেন। সেই সঙ্গে এ-ও স্থির হোলো যে, ঐ টাকার অর্ধেক

গরীব জনসাধারণের সেবায় ব্যয়িত হবে। এইভাবে প্রাপ্ত অর্থ থেকে প্রায় চব্বিশ হাজার টাকা তিনি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিঅন' পত্রিকার জন্যে ব্যয় করেন।

উচ্ছেদ-ব্যবস্থা যাদের বিরুদ্ধে চলেছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল বিহার ও মাদ্রাজ অঞ্চলের গিরমিটিয়া। তারা তাদের চুক্তিশেষে এখানে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় ও বসবাস করছিল। পূর্বে গিরমিটিয়াদের সাহায্য এবং সেবা-শুশ্রূষা ক'রে নাতালেও গান্ধীজী শ্রমিকদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এবার বস্তি-উচ্ছেদের ব্যাপারে ট্রান্সভালে তিনি শ্রমিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন। এখানকার শ্রমিকরা নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্যে ইতিপূর্বেই একটি স্বতন্ত্র সংঘ গ'ড়ে তুলেছিল। এই শ্রমিক সংঘের নেতা ছিলেন জেরাম সিং বদ্রী। গান্ধীজী এঁদের এই শ্রমিক সংঘের সাহচর্যে এসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ধনিক আন্দোলনকে একদা শক্তিশালী ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অস্বাস্থ্য ও অপরিচ্ছন্নতার অজুহাতে ভারতীয়-অধ্যুষিত বস্তি-অঞ্চলটি মিউনিসিপ্যালিটির কবলে গেল সত্য, কিন্তু সেখানকার অস্বাস্থ্য ও অপরিচ্ছন্নতা দিনে দিনে বাড়লো বই কমলো না। কারণ, বস্তির বাসিন্দারা এখন মিউনিসিপ্যালিটির অস্থায়ী ভাড়াটে হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলো। পূর্বে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে যেটুকু পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতা তাদের ছিল, সেটুকুও এবার তিরোহিত হোলো। আবর্জনা স্তূপীকৃত হোলো, দুর্গন্ধ পচা পূতিগন্ধময় নর্দমা নরকের বর্ণনাকেও হার মানালো। অবিলম্বে এলো মহামারী। অকস্মাৎ সমগ্র ভারতীয় পল্লী মুমূর্ষুর আর্তনাদে, শোকার্তের ক্রন্দনে, ভয়ার্তের চীৎকারে ভ'রে গেল। প্লেগ। নিউমোনিক প্লেগ। এই প্লেগের আক্রমণ হয় ফুসফুসে, তাই এ প্লেগ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। জোয়ান জোয়ান মানুষের চওড়া বুকগুলো এতটুকু হয়ে গেল, মুখে রা সরলো না। কে কার সেবা করে, স্ত্রীপুত্র আত্মীয়-স্বজন কে কার খোঁজ নেয়। পালাও, পালাও। ছায়া-মূর্তির মতো মানুষের দল হয় মরতে, নয় পালাতে লাগলো। গান্ধীজীও নিঃসংকোচে নিরাপদে পালাতে পারতেন। কিন্তু পালালেন না। মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার, তাকে চেনবার, তার সঙ্গে খেলা করবার অপূর্ব একটি সুযোগ যেন তাঁর জুটে গেলো। এ যে কেবল সেবার সুযোগ তাই নয়, এ সুযোগ যেন বৈজ্ঞানিকের সুযোগ কোনো পরীক্ষাগারের, দার্শনিকের সুযোগ মৃত্যুর সান্নিধ্যে। মৃত্যুকে চিনতে হবে—মৃত্যুকে জানতে হবে, তার সঙ্গে লড়াই ক'রে দেখতে হবে, অবশেষে আমি মৃত্যুঞ্জয়, আমি তার চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে চলে যেতে হবে,—এই কল্পনায়, এই আশায়

বুঝি গান্ধীজীর বুক ভ'রে উঠলো। সকলের আগে এই 'শীর্ণ ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষটি'[১] মরণের সমস্ত ভ্রূভঙ্গকে হেলায় উপেক্ষা ক'রে সেবার কাজে নেমে এলেন। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকজন সুবিশ্বস্ত অনুচর হলেন তাঁর অনুগামী।

সৌভাগ্যক্রমে প্লেগের সূত্রপাতটা ভারতীয় পল্লীতে হয় নি, নইলে সেই অজুহাতে আর এক দফা ভারতীয়-দলন সুন্দরভাবে চলতে পারতো। প্লেগ প্রথমে দেখা দিয়েছিল খনি অঞ্চলে, নিগ্রোদের মধ্যে। এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার ভার ছিল খোদ শ্বেতাঙ্গদের হাতে। প্লেগ সম্পর্কে গান্ধীজী সংবাদপত্রে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি পল্লীর অস্বাস্থ্য, অপরিচ্ছন্নতা ও মহামারীর জন্যে মূলত দায়ী করেন মিউনিসিপ্যালিটিকে। এতে অন্য কোনো লাভ হোক, বা না হোক, গান্ধীজীর কয়েকজন সহৃদয় শ্বেতাঙ্গ বন্ধুলাভ ঘটেছিল। মিঃ হেন্‌রি পোলক, মিঃ জোসেফ ডোক এবং মিঃ অ্যালবার্ট ওয়েস্ট তাঁদের অন্যতম। একটি নিরামিষ হোটেলে মিঃ ওয়েস্টের সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন একটি ছাপাখানার অংশীদার। প্লেগ-রোগীদের সেবার কাজে তিনি গান্ধীজীকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু প্লেগ তখন অনেক পরিমাণে ক'মে এসেছিল। তাই গান্ধীজী তাঁকে জনসেবার কাজে অন্যভাবে আত্মনিয়োগের জন্যে পরামর্শ দিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিঅন' পরিচালনার ভার নিলেন মিঃ ওয়েস্ট এবং এইভাবে তিনি গান্ধীজীর দীর্ঘকালীন সংগ্রামের অন্যতম সঙ্গী হয়ে উঠলেন।

ভারতীয়দের কল্যাণের প্রতি মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি না থাকলেও শ্বেতাঙ্গদের

---

১ অনেকেই গান্ধীজীকে শীর্ণ ক্ষুদ্র, দুর্বল মানুষটি ব'লে বর্ণনা করেছেন। দৈহিক বিশালতা গান্ধীজীর ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁকে শীর্ণ বা দুর্বল বলতে সংকোচ হয়। চলৎশক্তিতে গান্ধীজী ছিলেন অতি-মানুষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের সময়ে তাঁকে প্রতিদিন পায়ে হেঁটে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হোতো। একদিন তিনি ৫৪ মাইল পথও অতিক্রম করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে-ও তিনি এতো দ্রুত হাঁটতেন যে বেশ শক্তিশালী ক্যামেরাতে-ও তাঁর ফটো নেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল।

গান্ধীজী হাঁটবার উপযোগী হিসাবে স্যাণ্ডেল ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই ধরনের চটিই স্বাভাবিক। গোটা পা ঢাকলে পায়ে সহজে ঘাম হয়। ফলে, গান্ধীজীর মতে, পা নরম হয়ে যায়। তাই গান্ধীজী তাঁর শিষ্য সামন্তদের মধ্যে স্যাণ্ডেলের প্রচলন করেন এবং কংগ্রেসীদের অন্যতম অঙ্গত্রাণ বা আভরণ হিসাবে স্যাণ্ডেলযুগলকে প্রায়ই শোভমান দেখা যায়। অবশ্য, এই স্যাণ্ডেল ব্যবহার সম্পর্কেও গান্ধীজীর উপর যে খ্রীষ্টের বাণীর প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। খ্রীষ্টের বাণী স্মরণ করুন:

"But be shod with sandals, and not put on two coats." অর্থাৎ গান্ধীজীর দারিদ্র্য-বিলাসের অঙ্গও ছিল এই চটিজোড়া।

সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিল। তাই অবিলম্বে ভারতীয় বস্তিটিকে জ্বালিয়ে দিয়ে বস্তি থেকে প্রায় তেরো মাইল দূরে একটি গ্রামে ভারতীয়দের পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। এ ব্যাপারে গান্ধীজী একদিকে মিউনিসিপ্যালিটিকে যেমন সাহায্য করলেন, তেমনি সাহায্য করলেন ভারতীয় অধিবাসীদের-ও। ফলে, দরিদ্র ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর প্রভাব যেমন আরো বৃদ্ধি পেলো, তেমনি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বন্ধুত্বও হ'লো নিবিড়তর। এইভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আপোসের পথে ভারতীয় ধনিকদের সংগ্রামের পথটিকে গান্ধীজী ধীরে ধীরে প্রশস্ত ক'রে তুলতে লাগলেন।

মিঃ ওয়েস্টের মতোই মিঃ পোলকের সঙ্গেও এক নিরামিষ হোটেলেই গান্ধীজীর পরিচয় হয়। মিঃ পোলক ছিলেন সংবাদসেবী। কেবল আহারের দিক থেকেই নয়, চিন্তার দিক থেকে বা প্রকৃতির দিক থেকেও গান্ধীজীর সঙ্গে পোলকের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। তাই তাঁদের বন্ধুত্ব অতি সহজেই গ'ড়ে উঠলো।

গান্ধীজী তাঁর চিন্তার উৎস-ধারা সম্পর্কে বারে বারে যে চারজন মনীষীর[১] নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজ লেখক জন রাস্কিন একজন। বিশেষত, গান্ধীজী খ্রীষ্টান কমিউনিজমের নামে যে ভ্রান্ত অর্থনৈতিক সূত্রকে গ্রহণ করেছিলেন বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, সেজন্যে রাস্কিনই ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী—অর্থাৎ তাঁর 'Unto This Last' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থখানি মিঃ পোলকই গান্ধীজীকে পড়তে দিয়েছিলেন। সুতরাং গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক মতবাদের জন্যে মিঃ পোলক যে বহুল পরিমাণে দায়ী, একথা বলা চলে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাস্কিন তাঁর 'আনটু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই পুস্তকের তিনি বর্ণনা করেছেন : Four Essays on the First Principle of Political Economy ব'লে। কিন্তু ঐ সময়ে,—ঐ সময়ে কেন, ঐ সময়ের বহু পূর্বেই—পাশ্চাত্য দেশের আর একজন মনীষী পলিটিক্যাল ইকনমির প্রথম সূত্রগুলি আবিষ্কারের জন্যে প্রাণপণ সাধনা করেন এবং তাঁর দুখানি মূল্যবান রচনাও একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় : কার্ল্ মার্ক্স্-রচিত 'Communist Manifesto' (১৮৪৮ খ্রীঃ) এবং Contribution to the Critique of Politibal Economy (১৮৫৯)। গান্ধীজী যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট্' গ্রন্থখানি পড়ছেন, তখন মার্ক্সের সকল শ্রেষ্ঠ রচনাই পৃথিবীর সকল সভ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে, মার্ক্স্ নিজে পরিণত হয়েছেন ইতিহাসে এবং গান্ধীজীর প্রায়

১ খ্রীষ্ট, টলস্টয়, রায়চাঁদজী ও রাস্কিন।

সমবয়সী আর একটি মানুষ মার্ক্সের বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের বিশাল এক অংশে ঝটিকাবর্তের মতো উদিত হয়েছেন,—যে ঝটিকাবর্ত আপন বেগে বয়ে নিয়ে এসেছিল বজ্রনাদী অগ্নিগর্ভ কৃষ্ণমেঘ, তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর উষর বক্ষে দিয়েছিল অবারিত বর্ষণ, পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশকে নিষিক্ত ক'রে তুলেছিল নূতন প্রাণে, নূতন যৌবনে, অভিনব শক্তিতে। কে জানে, সেদিন যদি মিঃ পোলক বা মিঃ পোলকের মতন আর কেউ গান্ধীজীর হাতে 'আনটু দিস্ লাস্ট'র মতো একখানি ভ্রান্ত গ্রন্থ তুলে না দিয়ে মার্ক্সের কোনো শ্রেষ্ঠ বচনা দিতেন, তবে ওই সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যে ও সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে পুষ্ট মানুষটির মধ্যে কোনো এক আপোসহীন বৈপ্লবিক চেতনার জন্মলাভ ঘটতো কিনা।[১]

খুব সম্ভবত মার্ক্সের রচনা গান্ধীজীর হাতে এলে-ও তা তাঁকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ করতো না। কারণ, তাঁর পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা ঠিক সেই সময় মার্ক্সবাদকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করবার মতো পরিণতি লাভ করেনি। অন্যপক্ষে, রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থখানি গান্ধীজীকে আকৃষ্ট করবার মতো সামাজিক ও ব্যক্তিগত বহু কারণই ছিল। রাস্কিন ও গান্ধী, উভয়েই বুর্জোয়া সমাজের মানুষ, উভয়েই ব্যবসায়ী সমাজ-ব্যবস্থাকে শাশ্বত ও সনাতন ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, সামাজিক উদ্‌বর্তনের ধারা অনুসারে যে তাদের উদ্ভব হয়েছে, অন্তর্ধানও ঘটবে, তাঁরা তা কল্পনা বা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু মানবের মঙ্গলসাধনে তাঁরা উভয়েই ছিলেন উদ্‌বুদ্ধ। মানুষের দৈন্যে-দুঃখে, অবিচারে-অত্যাচারে অন্যান্য বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের মতোই তাঁরাও হ'তেন কাতর এবং পৃথিবীকে দুঃখ-বেদনাহীন অন্যায়-অবিচারহীন এক সুন্দর সমাজে পরিণত করবার মহৎ কল্পনায় হ'তেন চঞ্চল। ব্যবসায়ী বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র অস্তিত্বই যে, শ্রমিক-শোষণ ও ব্যাপক বঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা গান্ধী, রাস্কিন বা অন্যান্য বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা কেউ লক্ষ্য

১ গান্ধীজী কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে-ও মার্ক্সের রচনা পাঠ করেন নি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যখন তিনি আগা খান প্রাসাদে বন্দী ছিলেন, তখন নাকি একবার সেগুলি পড়তে চেষ্টা করছিলেন। মার্ক্সের রচনা পড়েন নি কেন, সে বিষয়ে তিনি কোনো সাংবাদিককে নাকি বলেছিলেন, তিনি শুনছেন, মার্ক্স হিংসায় বিশ্বাস করেন, তাই। মহম্মদ হিংসায় বিশ্বাস করতেন, হিংসায় বিশ্বাস করতেন ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি। কিন্তু তাঁদের রচনা পাঠ করতে তো কই তিনি ইতস্তত করেন নি? গীতায় হিংসার প্রচার আছে, সেজন্য তো কই গীতা পাঠ থেকে তিনি বিরত হন নি? মার্ক্সের প্রতি গান্ধীজীর বৈরাগ্যের প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, গান্ধীজী ছিলেন তাঁর কালের পুতুল; তাঁর কাল ছিল উপনিবেশে স্থানীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের যুগ, আর তিনি ছিলেন সেই অভ্যুত্থানের নেতা। তাই বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পরের যুগের দর্শনকে তিনি বোধ হয় সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন।

করেন নি। তাই তাঁরা সরল মনে ধনিক ব্যবসায়ী সমাজকে চিরন্তন ব'লে মেনে নিয়েই শোষণ ও বঞ্চনাকে দূর করবার চেষ্টা করেছেন, প্রচার করেছেন ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে সততার প্রয়োজন, প্রয়োজন সত্যের। ইংলণ্ডের উন্নতিশীল বুর্জোয়া যুগের মানব-প্রেমিক, অহিংসার ঋষি জর্জ ফক্স-ও ব্যবসায়ে সত্য ও সততার প্রয়োজন সম্পর্কে বহুল প্রচার করেছিলেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে প্রথমে যে বক্তৃতা দেন—তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম বক্তৃতা—তা-ও ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সত্য ও সততার স্থান সম্পর্কে। রাস্কিনও তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থের মুখপত্রে বলেছেন, এই প্রবন্ধগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য হ'লো "to show that the acquisition of wealth was finally possible only under certain moral conditions of society of which quite the first was the belief in the existence and even, for practical purposes, in the attainability of honesty" কিংবা "Honesty is not a disturbing force, which deranges the orbits of economy, but a consistent and commanding force, by obedience to which and by no other obedience—those orbits can continue clear of chaos." সুতরাং এই গ্রন্থখানি পড়তে শুরু ক'রে গান্ধীজী যে আকুল হয়ে উঠবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। গান্ধীজী বলেন, তিনি এই বইখানি এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে ফেলেছিলেন। কেবল তাই নয়, এই বইখানি শেষ ক'রে তাঁর সারারাত্রি ঘুম হয় নি এবং পরদিন প্রাতঃকালেই নাকি এই পুস্তকে প্রদর্শিত আদর্শকে জীবনে গ্রহণের জন্যে তিনি শপথ করেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন: "ইহার পূর্বে রাস্কিনের কোনো বই আমি পড়ি নাই। ছাত্রাবস্থায় পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে কোনো বই আমি পড়ি নাই বলা যায়। কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার পরও খুবই কম পড়িয়াছি। এমন কি আজো এ-কথা বলা যায় যে, আমার কেতাবী বিদ্যা অত্যন্ত কম।" কথাগুলি খুবই সত্য। আর সত্য ব'লেই রাস্কিনের এই ভ্রমাত্মক অর্থনৈতিক সূত্রকে অভ্রান্ত জ্ঞানে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। গান্ধীজী 'সর্বোদয়' নামে এই বইখানির অনুবাদও করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আন্‌টু দিস্ লাস্ট্' গ্রন্থ-পাঠে তিনি এই তিনটি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন: (১) সকলের মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল, (২) উকিল ও নাপিত উভয়ের পারিশ্রমিক এক হওয়া উচিত, (৩) কৃষক ও মজুরের জীবনই আদর্শ জীবন। গান্ধীজী বলেন: "প্রথম বিষয়টি আমি জানিতাম। দ্বিতীয়টি আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতাম। কিন্তু তৃতীয়টির বিষয় আমি ইতিপূর্বে ভাবি নাই। প্রথমটির ভিতরেই

যে অপর দুইটি সিদ্ধান্তও নিহিত আছে, আনটু দিস্ লাস্ট্ পড়িবার পরই আমার কাছে তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। তাই সেদিন সকাল হইতেই আমি এই সকল সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিতে কৃতসংকল্প হই।"

গান্ধীজীর জীবনে সত্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির প্রভাব প্রচুর। এই গ্রন্থখানিই যে তাঁকে অনেক পরিমাণে একটি শান্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ক'রে তুলেছিল, তা বলা যায়। সুতরাং, এই গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

আনটু দিস্ লাস্ট্। এই শব্দগুচ্ছ নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত একটি নীতিকাহিনী থেকে গৃহীত। কাহিনীতে খ্রীষ্ট একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, স্বর্গে সবার সমান অধিকার—প্রথম ও শেষের, উত্তম ও অধমের পার্থক্য নেই সেখানে: "But many that are first shall be last, and the last shall be first." (Matt. xix 30, & Mark x, 31)

স্বর্গের বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে খ্রীষ্ট যে পার্থিব উদাহরণটি ব্যবহার করেছিলেন, তা নিম্নলিখিত রূপ:

একদিন এক গৃহস্বামী তাঁর আঙুরের ক্ষেতের জন্যে শ্রমিকের সন্ধানে বার হলেন। একদল শ্রমিকের সাক্ষাৎ মিললো। তাদের সঙ্গে পারিশ্রমিকের চুক্তি হোলো, সারাদিনের জন্যে এক-এক পেনি। শ্রমিকরা মাঠে গেলো। ঘণ্টা তিনেক বাদে আর একদল শ্রমিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হোলো, তাদেরও তিনি কাজে নিযুক্ত করলেন। কথা হোলো, কেবল ন্যায্য পারিশ্রমিকই তারা পাবে। আরো তিন ঘণ্টা বাদে এলো আরেক দল শ্রমিক। গৃহস্বামী তাদেরও কাজে নিয়োগ করলেন। বললেন, তারাও ন্যায্য পারিশ্রমিকই পাবে। আরো তিন ঘণ্টা বাদে এলো আরো একদল। তাদেরও তিনি নিয়োগ করলেন। দিন শেষ হয়ে গেলো। পারিশ্রমিক নিতে এলো সবাই। গৃহস্বামী 'দের সবাইকেই এক পেনি ক'রে পারিশ্রমিক দিলেন। যারা সারাদিন কাজ করেছিল, তারা আপত্তি করলো: যারা প্রথমে এলো, আর যারা শেষে এলো, তাদের সবারই কি একই পারিশ্রমিক? উত্তরে উদার গৃহস্বামী বললেন, "কিন্তু, বন্ধু, আমি তো তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করি নি। এক পেনি পারিশ্রমিকে সারাদিন কাজ করবে, তুমি তো এই শর্তেই এসেছিলে। সুতরাং, তোমার যা প্রাপ্য, তা তুমি নেবে। সবার শেষে যে এসেছে, তাকেও আমি তোমার সমানই দেবো।" "Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee." (Matt. xx, 14)

এই কথাগুলির উপর ভিত্তি ক'রেই সমগ্র খ্রীষ্টান সাম্যবাদ গ'ড়ে উঠেছে।

তবে সতর্কতার সঙ্গে নিউ টেস্টামেণ্ট পাঠ করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এই ধরনের কোনো সমান পারিশ্রমিকের সাম্যবাদ প্রবর্তনের জন্যে খ্রীষ্ট কখনো সুপারিশ করেন নি। বস্তুত, পার্থিব সমাজ-সমৃদ্ধিতে যিশুর বড়ো একটা মনোযোগ ছিল না। যিশুর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে আসবে প্রলয়,[১] সুতরাং তিনি পারলৌকিক সাম্রাজ্য নিয়ে যতো ব্যস্ত ছিলেন, ইহলৌকিক 'স্বল্পায়ু' সাম্রাজ্য নিয়ে মোটেই ততো ব্যস্ত ছিলেন না।[২] খ্রীষ্টের পূর্বাচার্যরা ঘোষণা করেছিলেন, প্রলয়কালের পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীতে ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হবে। খ্রীষ্ট নিজেকে যখন ত্রাণকর্তা বা মেশাইয়া হিসাবে গ্রহণ করলেন, তখন একথাও তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হোলো যে, পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত সমাসন্ন, এবং অপার্থিবের জন্যে মানুষকে এবার প্রস্তুত হতে হবে।

মহম্মদ-ও নিজেকে পৃথিবীতে ভগবানের শেষ পয়গম্বর ব'লে বিশ্বাস করতেন। তাই কেয়ামতের আসন্নতা সম্পর্কে তাঁরও কোনো সংশয় ছিল না। আমরা দেখি, খ্রীষ্টের স্বর্গীয় সাম্যবাদকে যখন খ্রীষ্টান 'সাম্যবাদীরা' পার্থিব সমাজে প্রয়োগের চেষ্টা করেন, এবং সমান পারিশ্রমিকের প্রচার করেন, তখন তাঁরা খ্রীষ্টের উপরোক্ত বাণীর আশ্রয় লন। এমন কি শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী 'মার্ক্‌স্‌বাদী' বার্নার্ড শ-ও এই পারিশ্রমিক-সাম্যের কেবল পক্ষপাতী ছিলেন না, ছিলেন উগ্র প্রচারক। শ তাঁর যুক্তির অনুকূলে বলেন, মানুষের পরিশ্রমের পরিমাপ করা সম্ভব কেমন ক'রে? একটি ডাক্তারের এক ঘণ্টার এবং একটি মিস্ত্রির এক ঘণ্টার পরিশ্রমের পরিমাপের মান কি? সমাজের বিভিন্ন ধরনের কাজকে যদি প্রচলিত কোনো মানদণ্ডে পরিমাপ করা সম্ভব না হয়, তবে শ্রমের পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব কেমন ক'রে? সুতরাং সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। শ-র এই যুক্তির মধ্যে ব্যাবহারিক সত্য কিছু বা থাকতে পারে। তবে শ্রম-শক্তিকে তার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে না দেখবার ফলেই শ-র এই দৃষ্টিভ্রংশ ঘটেছে। এক বালতি দুধ এবং ক্ষীরের আয়তন এক হ'লেও তাদের পরিমাণ যে এক নয়, চূড়ান্ত সাম্যবাদী সমাজেও যে এক বালতি দুধের বিনিময়ে এক বালতি ক্ষীর মেলা স্বাভাবিক হবে না, সে-কথা শ ভেবে দেখেন নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, সকল বস্তুরই দুটি গুণ থাকে: ব্যাপকতা

১ **But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God. (Luke ix, 27)**

"Verily I say unto you This generation shall not pass away till all will be fulfilled." (Luke xx, 32)

২ **"Jesus answered, My Kingdon is not of this word." (John xviii, 36)**

(extensity), এবং ঘনতা (intensity)। শ্রমেরও দুটি গুণ : ব্যাপকতা ও ঘনতা। এক বালতি দুধ ও এক বালতি ক্ষীরের মধ্যে ব্যাপকতার পার্থক্য না থাকলেও ঘনতার যেমন প্রচুর পার্থক্য থাকে, তেমনি একটি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকের এক ঘণ্টার শ্রমের স.ঙ্গ একটি শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত শ্রমিকের এক ঘণ্টার শ্রমের ভেতরেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কারণ, কাজের ঘণ্টার মাপকাঠি দিয়ে শ্রমের কেবল ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি মাপা যায়, শ্রমের ঘনতা মাপা যায় না। একটি শিক্ষিত শ্রমিকের এক ঘণ্টার শ্রমের মধ্যে আরো বহু ঘণ্টার শ্রম (যথা শিক্ষাকালীন শ্রম) যে ঠাসাঠাসি সন্নিবদ্ধ থাকে, এই সত্যকে গ্রহণ ক'রেই মার্ক্স শ্রমিক সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।[১] আর্কিমিডিসের পূর্ব পর্যন্ত যখন কোনো বস্তুর ঘনতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার, তথা হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের উদ্ভব হয় নি, তখন পদার্থবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা ছিল যেমন অসম্ভব, তেমনি শ্রমের ঘন রূপটিকে লক্ষ্য না ক'রে শ্রম-সমস্যার সমাধানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও পণ্ডশ্রম। শ নিজেকে মার্ক্সবাদী ব'লে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি মার্ক্সের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অনেক কিছুকেই এড়িয়ে গেছেন। সম্ভবত, এর প্রধান কারণ, তাঁর নিজের বিজ্ঞানবিমুখতা।[২] যাই হোক, শ্রমের পরিমাণ নির্বিশেষে সকলকে সমান পারিশ্রমিক দানের প্রচার করবার জন্যে শকে আমরা সত্যিকার খ্রীষ্টান কম্যিউনিস্ট হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের "I will give unto this last, even as unto thee" কথাগুলি সত্যই খাপ খায়।

কিন্তু রাস্কিন সম্পর্কে সেকথা বলা চলে না। রাস্কিন তাঁর বইয়ের নাম Unto This Last দিলেও খ্রীষ্টান সাম্যবাদকে কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নি।[৩] সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল ব'লেও মনে হয় না। তিনি বলেন : "If a man works an hour for us and we only promise to work half an hour

[১] Skilled labour counts only as intensified, or rather multiplied simple labour so that a smaller quantity of skilled labour is equal to a larger quantity of simple labour" (Marx, *Capital*, Vol. I)

[২] বৈজ্ঞানিক পাভলভের Conditioned Reflex আবিষ্কারকে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেও করেছিলেন অস্বীকার।

[৩] খ্রীষ্টের বাণী থেকে নামটি গ্রহণ করলে-ও এই বাণীর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ তিনি তাঁর বইয়ে করেন নি। এমন কি শ্রমিক ও গৃহস্বামী সংক্রান্ত নীতিকাহিনীটিরও এতে কোনো উল্লেখ নেই।

for him in return we obtain an unjust advantage. The justice is in absolute exchange.…"

রাস্কিনের এই কথাগুলি নির্ভুল হোতো, যদি তিনি এক ঘণ্টার শ্রম বলতে, মার্ক্‌স্‌ যা বোঝেন, তা বুঝতেন। কিন্তু রাস্কিনের কাছে এক ঘণ্টাব্যাপী শিক্ষিত শ্রমিকের শ্রম এক ঘণ্টাব্যাপী অশিক্ষিত শ্রমিকের শ্রমের সমান। অর্থাৎ শ্রমের ঘনতা বা intensity-কে তিনি লক্ষ্য করেন নি। তাই তাঁর বই প'ড়ে গান্ধীজী উকিল ও নাপিতের পরিশ্রমেব মূল্য সমান, এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। এই ধরনের ভ্রমাত্মক labour theory-র যাঁরা প্রচারক, তাঁদেবই একদল সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশের সব মানুষেব সমান পারিশ্রমিক নয় কেন ব'লে চেঁচামেচি করেছেন, এবং স্তালিন সাম্যবাদকে বানচাল ক'রে দিলেন এমন ধুয়াও তুলেছিলেন। যাই হোক, এখানে আমবা লক্ষ্য করি, খ্রীষ্ট স্বযং বা খ্রীষ্টান কমিউনিস্ট শ যখন শ্রমিকের শ্রমের পবিমাণ নির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদানের পক্ষপাতী, তখন রাস্কিন খ্রীষ্টের 'আনটু দিস্‌ লাস্ট' কথাগুলিকে তাঁর বইয়েব মাথায ও মলাটে বিজ্ঞাপনরূপে ব্যবহার করলেও, আসলে সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওযার পক্ষপাতী ছিলেন না। খ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টান শ যখন সবাইকে সমান (equal) পাবিশ্রমিক দিতে বলেন, তখন বাস্কিন বলেন, সকলকে বাঁধা (fixed) পারিশ্রমিক দিতে। অর্থাৎ খ্রীষ্টান সাম্যবাদীর ছদ্মবেশে বহু নীতির আতসবাজি দেখাবার পর তিনি তাঁর আসল মুখোসটি নিতান্ত অতর্কিতেই খুলে রেখেছেন, তিনি বাঁধা (fixed) পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের খাটাতে বলেছেন। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই বাঁধা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবার নামই হোলো চাকরি।

কেবল তাই নয়। তিনি ভালো শ্রমিক এবং মন্দ শ্রমিকেব শ্রেণী-বিচারও করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, মন্দ শ্রমিকদের কার্যে নিয়োগ করা চলবে না। কারণ, তাতে নাকি মন্দ শ্রমিকরা স্বল্প পারিশ্রমিক নিযে ভালো শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে, এবং এইভাবে ভালো শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কমিয়ে দেবে বা চাকরি ছিনিয়ে নেবে। রাস্কিন সাহেবের ভাষায়: "The natural and right system respecting all labour is that it should be paid at a fixed rate, but the good workman employed and the bad workman unemployed. The false, unnatural, and destructive system is when the bad workman is allowed to offer his work at half price and either take the place of the good or force him by competition

to work for an inadequate sum." খ্রীষ্টান কমিউনিস্টের মুখে এই ধরনের যুক্তি বা উক্তি নিতান্তই অশোভন। "I will give unto this last, even as unto thee." এবং "but many that are first shall be last, and the last shall be first" প্রভৃতি খ্রীষ্টের কথাগুলির প্রতি অমার্জনীয় অমনোযোগ!

অবশ্য, রাস্কিন খ্রীষ্টের বাণীতে কর্ণপাত করেন নি ব'লে আমি তাঁর ওপর দোষারোপ করছি না। আমি নিজেও খ্রীষ্টর এই বাণীতে কর্ণপাত করতাম না। আমি দোষারোপ করছি অন্য কারণে। পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক অবয়ব সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর অজ্ঞতার জন্য। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কেবল বাহ্যিক রূপ যেমন রাস্কিনের চোখে পড়েছিল, তেমনি প্রতিযোগিতার বাহ্যিক রূপটিকেই তিনি দেখেছিলেন—তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু তার স্বরূপ কি তা বিন্দুমাত্র বোঝেন নি। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই বেকারসমস্যা ও প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়, তার জন্যে তথাকথিত মন্দ শ্রমিকের প্রতিযোগিতা দায়ী নয়। অবশ্য, ছাঁটাইয়ের সময় অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা শ্রমিকদের অযোগ্যতার অজুহাতই দেখান। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যের ফলে 'ভালো' শ্রমিকরা-ও যখন বেকার হ'য়ে পড়েন, তখন প্রতিযোগিতার মল্ল-মঞ্চে তাঁদেরও অবতীর্ণ হ'তে হয়। এই ভালো শ্রমিকরা-ও তখন প্রতিযোগিতার পথে পারিশ্রমিকের পরিমাণকে ক্রমেই নিচের দিকে টেনে আনতে বাধ্য হন। (শ্রমিকের চাকরি গেলেই তাঁরা মন্দ শ্রমিকের (bad workman) পর্যায়ে পড়েন, রাস্কিনপন্থীরা যদি এমন ভাষ্য দেন, তবে আমরা অবশ্য নাচার।) পুঁজিতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়ার ফলে রাস্কিন শ্রমিকদের দুঃখ-দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার মূল কারণটি লক্ষ্য না ক'রে সমস্ত দোষত্রুটি অযোগ্য শ্রমিক বা bad workman-এর ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন।

তর্কের খাতিরে রাস্কিনের এই ভ্রান্ত যুক্তিকে স্বীকার ক'রে নিলেও প্রশ্ন উঠে, যোগ্য ও অযোগ্য শ্রমিক বলতে তিনি কি বোঝেন এবং সেই পার্থক্যটি বিচার করা সম্ভব কিভাবে—তাদের বেকারত্ব দেখেই কি? রাস্কিনকে তাঁর জীবিতকালেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। প্রশ্নের জবাব তিনি যা দিয়েছিলেন, তা বস্তুত জবাব নয়,—জবাব না দেওয়ার কারণ। বলেছিলেন মাত্র বারো পৃষ্ঠার ছোটো একটি প্রবন্ধে সে-সব কথা আলোচনা করা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বারো শ পৃষ্ঠার একখানি প্রবন্ধ লিখেও তিনি কোনো দিন সে বিষয়ে আলোচনা

করেন নি! যদিও তাঁর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের পক্ষে বারো শ পৃষ্ঠার একখানি বই লেখারও কোনো অন্তরায় ছিল না।

গান্ধীজীর মতো রাস্কিনও পুঁজিবাদীদের শ্রেণীগত সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিলেন। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যখন বহুকে শোষণের ভিত্তিতে মুষ্টিমেয়কে পুষ্ট করে, তখন পুঁজিবাদীদের শ্রেণীগত সংস্কৃতিতে ব্যক্তির স্তুতি ও বড়াই বড়োই শোনা যায়। রাস্কিন-ও ব্যক্তির স্তুতি করেন। তাঁর মতে, সমাজ নয়,—ব্যক্তির প্রচেষ্টাই সমাজকে অগ্রবর্তী করবে, তার দুঃখ-দারিদ্র্য বিনাশ করবে, আনবে তার কল্যাণ। তিনি বলেন: "Note, finally, that all effectual advancement towards this true felicity of the human race must be by individual, not by public effort." তাই গান্ধীজীর মতো রাস্কিন-ও পুঁজিবাদীদের সৎ হতে বলেন।

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কয়েক বৎসর বাদে বাদে ভয়াবহ মন্দা আসতে দেখা যায়। এই সময় অত্যন্ত সহৃদয় পুঁজিবাদীর পক্ষেও শ্রমিক ছাঁটাই এবং অনেক ক্ষেত্রে লক্-আউট না ক'রে উপায় থাকে না। আর এই মন্দা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার চরিত্রগত ঘটনা—পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত ত্রুটির ফসল নয়। কিন্তু রাস্কিন সেকথা বোঝেন নি। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে মেনে নেওয়ায় শ্রমিকদের অল্প বেতন, ছাঁটাই, লক্-আউট প্রভৃতির জন্যে ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিবাদীদের দোষী ক'রে তিনি তাদের সংশোধন করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বস্তুত পুঁজিবাদের সমূলে উচ্ছেদই এই সংশোধনের একমাত্র উপায়। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে রাস্কিন বলেন: আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত "maintaining constant numbers of workmen in employment, whatever may be the accidental demand for the article they produce." কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় এবং লাভের উপরই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি। লাভের জন্যেই চাই শ্রমিককে তার প্রাপ্যের অপেক্ষা কম পারিশ্রমিক দেওয়া। আবার এইভাবে কম পারিশ্রমিক পাওয়ার ফলে শ্রমিকদের—অর্থাৎ দেশের শতকরা প্রায় ৯৫ জন মানুষের ক্রয়শক্তি হ্রাস পায়। ফলে, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন সমাজে একদিকে মুষ্টিমেয় মালিকের লাভজনক বিক্রয়ের ইচ্ছা এবং অন্যদিকে, অসংখ্য মানুষের ক্রয়শক্তিহীনতা মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আর, এই হোলো পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধতা, তার অনিবার্য ধ্বংসের বীজ। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের এই দেহতত্ত্ব সম্পর্কে রাস্কিন কিন্তু বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। তিনি

কল্পনা-ও করেন নি যে, মানুষের জন্মের মধ্যেই যেমন তার মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে এবং একদিন তা বার্ধক্য, জরা, অবশেষে মৃত্যু রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি যে-শোষণ ও লাভের ফলে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়েছে, সেই শোষণ ও লাভের মধ্যেই নিহিত আছে তার ধ্বংসের বীজ। এই জরাজীর্ণ, বার্ধক্যপীড়িত, গলিত বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে রাস্কিন যৌবনলাভের দাওয়াই দিতে চেয়েছেন। আর গান্ধীজী সেই দাওয়াইকে গ্রহণ করেছেন ধন্বন্তরির দান ব'লে।

মার্ক্সের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক ধারাকে রাস্কিন লক্ষ্য করেন নি। তিনি শোষক ও শোষিতের মধ্যে দেখেছেন, দ্বন্দ্ব নয়, সহযোগিতা: দারিদ্র্য হোলো ত্যাগ এবং শোষণ ন্যায়সংগত গ্রহণ মাত্র। তিনি বলেন, মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ তাদের দ্বন্দ্বশীল ক'রে তোলে না। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ককে তিনি সন্তান ও মাতার সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উপমা অনেক সময় মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে ও যুক্তিকে করে জড়িত। বর্তমান উপমাটি-ও সেই শ্রেণীর। গান্ধীজী-ও তাঁর লেখনে ও ভাষণে এই ধরনের বিভ্রান্তির বহু উপমা ব্যবহার করেছেন। রাস্কিন বলেন: "If there is only a crust of bread in the house and mother and children are starving, their interest are not the same· ·yet it does not necessarily follow that there will be 'antagonism' between them, they will fight for the crust, and the mother, being strongest, will get it and eat it." মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের সঙ্গে মাতা ও সন্তানের তুলনা অত্যন্ত অসংলগ্ন। প্রথমত, মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহমমতার যে সম্পর্ক থাকে, তা রক্তগত, সংসর্গগত। কিন্তু মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্নেহ ও মমতার সম্পর্ক তো দূরের কথা, তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় পর্যন্ত থাকে না। বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় থাকা সম্ভবও নয়। মালিকের কাছে শ্রমিকরা মানুষ নয়, শ্রমশক্তি মাত্র। বুর্জোয়া ইংরেজি ভাষায় তাই মানুষকে man বলে না, বলে hand. দ্বিতীয়ত, মাতা এবং সন্তানের মধ্যেও যখন জীবনধারণের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম বেধে ওঠে, তখন স্নেহ-মমতার সুকোমল সম্পর্কও টেকে না, দুর্ভিক্ষের সময়ে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, মালিককে মাতা এবং শ্রমিককে সন্তান ভাবা-ও ভুল। মাতা সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের জন্ম দেয় না, বরং বলা যেতে পারে শ্রমিকরাই জন্ম দেয় পুঁজিপতিদের—তাদের ঘর্ম ও রক্ত মোক্ষণের মধ্য দিয়ে। সুতরাং সেই কুলাজার সন্তান পুঁজিপতিরা যখন তাদের জন্মদাতাদের

রাস্কিন সাহেবের উপমার খাতিরেই বলছি) বঞ্চিত করে, অনাহারে রেখে হত্যা করে, তখন তাদের প্রাপ্য স্নেহ নয়, শাস্তি। যাই হোক, মাতা-সন্তানের এই উপমাকে কোনো বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রশ্রয় দেবেন না, একথা বলা চলে।

বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর আর একটি উপমা বুর্জোয়া সমাজনীতিকরা ব্যবহার করেন। সেটি হোলো মানব-সমাজের সঙ্গে মধুমক্ষিকা-সমাজের তুলনা। তাঁদের মতে মধুমক্ষিকার সমাজে প্রচলিত সমাজতন্ত্রই হোলো সত্যিকার সমাজতন্ত্র। আর সেই সমাজতন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থাই আজ মনুষ্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে—যার নাম পুঁজিতন্ত্র। এই মক্ষিকা-সমাজতন্ত্রীরা বলেন, মক্ষিকার সমাজে দেখা যায়, একটি চক্রে অসংখ্য শ্রমিক মক্ষিকা এবং একটি মাত্র রানী মক্ষিকা থাকে। শ্রমিক মক্ষিকার দল অনবরত কাজ ক'রে যায়, তারা অনশনে অর্ধাশনে থাকে এবং এইভাবে নিষ্কর্মা রানী মক্ষিকাকে নিয়মিত পোষণ ও তোষণ করে। এই মক্ষিকা-সমাজতন্ত্রের অনুরূপ অবস্থাই মানব-পুঁজিতন্ত্রে-ও রয়েছে। মুষ্টিমেয় মালিকের পোষণ ও শোষণের জন্যে অসংখ্য শ্রমিক অনশনে অর্ধাশনে খেটে মরে। সুতরাং বুর্জোয়া প্রচারকরা বলেন, মক্ষিকা-সমাজতন্ত্র অর্থাৎ মানব-পুঁজিতন্ত্র প্রকৃতির আদিম ও অকৃত্রিম রূপ এবং এর পশ্চাতে প্রাকৃতিক নীতির সমর্থন রয়েছে। বহু বুর্জোয়া প্রচারক যেমন এই 'প্রাকৃতিক' উপমার আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি বহু ব্যক্তি এই উপমার আপাত-চাকচিক্যে বিমুগ্ধ ও প্রতারিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যদি এই উপমার সত্যকে যাচাই ক'রে দেখতেন, তবে বুঝতে পারতেন, মক্ষিকা-সমাজতন্ত্রের মানবিক সংস্করণ পুঁজিতন্ত্র মানব-সমাজে দীর্ঘকাল থাকা সম্ভব নয়, এই কারণেই যে, মক্ষিকা সমাজের সমস্ত সন্তানের জন্মদানের দায়িত্ব একটি মাত্র রানী মক্ষিকার উপরই ন্যস্ত থাকে, আর সেই কারণেই অন্যান্য মক্ষিকারা নিজেদের জাতি-রক্ষার জন্যে নিজেরা অনশনে অর্ধাশনে থেকে মক্ষীরানীকে সতেজ ও সজীব রাখতে চায়। কিন্তু মানব-সমাজে যারা মক্ষী-সমাজতন্ত্রের প্রচারক, তাঁদের প্রশ্ন করি, তাঁরা কি মানব-জাতির তথাকথিত মক্ষীরানী পুঁজিপতিদের জাতির জনসংখ্যা রক্ষার দায়িত্ব নেওয়াতে পারবেন? পুঁজিপতিরা নিজেদের বংশরক্ষা করতেও তো অনেক সময় অসমর্থ হন। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, যে কোনো কারণেই হোক, তাঁদের সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং, জাতিরক্ষার দিক থেকেই মক্ষিকাসমাজতন্ত্রের নীতি বা নিয়ম মনুষ্যসমাজে সম্পূর্ণ অচল। অসংখ্য শ্রমিকের বংশরক্ষার ভার শ্রমিকের নিজের। দীর্ঘকাল তাদের অনশনে অর্ধাশনে রাখলে, সারা মনুষ্য জাতিটাই যে পৃথিবীর বুক থেকে একদা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে,

তাতে আর আশ্চর্য কি? অবশ্য, ইতিমধ্যে ধনিকপত্নীরা যদি লক্ষপ্রসবিনী না হয়ে ওঠেন!

আমরা লক্ষ্য করি, এই জাতীয় উপমার উপর ভর ক'রেই অনেক ক্ষেত্রে রাস্কিন, গান্ধী, বা তাঁদের সগোত্ররা অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্পষ্ট ও জটিল ক'রে তুলেছেন। তাঁরা শব্দের যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছেন, তাতে জনসাধারণ যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তেমনি হয়েছেন তাঁরা নিজেরাও।

জীবনের মধ্যেই যে মৃত্যুর বীজ নিহিত রয়েছে, পলে পলে বাঁচবার সঙ্গে জীবরা যে পলে পলে মরছে-ও, এই মহা সত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই মার্ক্সবাদের জন্ম হয়েছে। কিন্তু রাস্কিন বুর্জোয়া সমাজের সৃষ্টির রূপটিকে'ও যেমন প্রত্যক্ষ করেন নি, তেমনি করেন নি তার ধ্বংসের রূপটিকেও। তাই তিনি শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বকে অস্বীকার ক'রে তাদের সহযোগিতার বাণী আওড়েছেন: "But the universal law of the matter is that, assuming any quantity of energy and sense in master and servant, the greatest material result obtainable by them will be, not through antagonism to each other, but through affection for each other."

সুতরাং রাস্কিন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে গান্ধীজী শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন, পুঁজিবাদীদের ন্যায়পরায়ণ ও স্নেহশীল হ'তে বলেছিলেন, শ্রমিকদের ত্যাগী ও সহিষ্ণু হ'তে উপদেশ দিয়েছিলেন। উপসংহার করেছিলেন: "every question concerning these things merges itself ultimately in the great question of justice...." কিন্তু পুঁজিপতিরা বিন্দুমাত্র ন্যায়পরায়ণ হন নি, তাঁরা তাদের শোষণের ধারাকে ক্রমেই দ্রুততর ক'রে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে চলেছেন। রাস্কিনের তথা গান্ধীর অর্থনীতির ভ্রান্ততা এ থেকেই নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয়।

গান্ধীজী বলেন, এই বইখানি তাঁকে এমনভাবে উদ্‌বুদ্ধ ও উত্তেজিত করেছিল যে, পরদিন প্রাতেই তিনি মিঃ ওয়েস্টের কাছে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন; স্থির হয়, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিঅন' পত্রিকাখানি সেই কৃষিক্ষেত্র থেকেই প্রকাশিত হবে। আন্‌টু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থ পাঠ ক'রে গান্ধীজী কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে অকস্মাৎ কিভাবে উদ্‌বুদ্ধ হলেন, তা ঠিক বোঝা যায় না। কারণ, 'আন্‌টু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থে নাগরিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা হয় নি। আমার বিশ্বাস, রাস্কিনের নিম্নলিখিত

কথাগুলিই গান্ধীজীকে পল্লীতে কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রেরণা দিয়েছিল: "The desire of the heart is also the light of the eyes. No sense is continually and untiringly looked but one rich by joyful labour; smooth in field, fair in garden, full in orchard; trim, sweet and frequent in homestead; ringing with voices of vivid existence; no air is sweet that is silent; it is only sweet when full of low currents of undersounds—triplets of birds, and murmur and chirp of insects, and deep-toned words of men, and wayward trebles of childhood."

এই 'আদর্শ' কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের জন্যে গান্ধীজী নাতালের রাজধানী ডারবান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ফিনিক্স স্টেশনের কাছে ষাট বিঘা জমি কিনলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিনিক্স কৃষিক্ষেত্রের হোলো প্রতিষ্ঠা। স্থির হোলো, সকলকেই এই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে হবে, সকলেই সমান পারিশ্রমিক পাবে। সমাজের বাইরে এই ধরনের কল্পনা-প্রণোদিত সাম্যবাদী পল্লী বা কলোনি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই নতুন নয়। গান্ধীজীর জন্মের বহু পূর্বেই ইউরোপের বহু মনীষী সে-চেষ্টা করেছিলেন এবং রবার্ট আওএনের মতো কর্ম-প্রতিভার হস্তেও তা এক চরম ব্যর্থতা লাভ করেছিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্মের অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে, রবার্ট আওএন 'নিউ হারমনি' নামে একটি সাম্যবাদী সমবায়-পল্লীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছ মাসের মধ্যে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রবার্ট আওএনের বিপুল শক্তি ও বিশাল পরিকল্পনার ব্যর্থতাই এই ধরনের 'ইউটোপীয়ান' সাম্যবাদকে অকার্যকরী ব'লে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ ক'রে দেয়। এই ধরনের অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজী সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। তাছাড়া, টলস্টয়ের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় তিনি পল্লীবাস, কৃষকের অনুরূপ জীবন-যাপন এবং কল্পনাবিলাসী সাম্যবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি যখন সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষি-কলোনি স্থাপন করলেন, তা অনেকখানি ভূগোল-না-জানা ভূ-আবিষ্কারকের পৃথিবী ভ্রমণের মতোই হয়ে দাঁড়ালো—এ ছিল যেন কোনো সুপরিজ্ঞাত দেশকে পুনরায় আবিষ্কারের চেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত আমেরিকান লেখক র‍্যাল্‌ফ্‌ ওঅল্ডো এমার্সনের কথা মনে পড়ে। একদা গান্ধীজী তাঁর রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই আকর্ষণের কারণ অনেকে মনে করেন, এমার্সনের চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার 'সুনিবিড়

সাদৃশ্য'।[১] এমার্সন তাঁর জন্মস্থান বোস্টন শহর ত্যাগ ক'রে নিভৃত কংকর্ডের পল্লীবাসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং কারণ স্বরূপ বলেছিলেন, "I am by nature a poet and therefore must live in the country." ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে এমার্সনের চিন্তার কি সাদৃশ্য আছে বা নেই, তা বিচারের স্থান এ নয়। তবে এমার্সনের সঙ্গে গান্ধীজীর যে প্রকৃতিগত অনেকখানি মিল ছিল, তা বলা চলে। পল্লীপ্রিয়তা গান্ধীজীর চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক্। কেবল ফিনিক্সের এই সমবায় কৃষিক্ষেত্র নয়, গান্ধীজী তাঁর পরবর্তী জীবনেও যে-সকল আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, সেগুলি ছিল শহরের কোলাহল থেকে দূরে, নিভৃত পল্লীতে। রবীন্দ্রনাথ-ও কলিকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বীরভূমের এক পল্লীতে, তাঁর শান্তিনিকেতনে। কি এমার্সন, কি গান্ধী, কি ওআর্ডস্বার্থ, কি রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের সবার এই পল্লীতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটিকে অন্তত তাঁরা সবাই কবি-মনের পরিচয় ব'লেই ভেবেছেন। কিন্তু বস্তুত, তা নয়। এ ছিল তাঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল

১ এমার্সনের চিন্তা সম্পর্কে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র বলেছিলেন: "I recognise a close affinity between the thought of Emerson and that of the Orient."

কবি, সমালোচক ও দার্শনিক এমার্সনের (১৮০৩-১৮৮২) রচনার কতকগুলি কলি আমাকে বিশেষভাবে গান্ধীজীর জীবন স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন:

"He that feeds men serveth few ;
He serves all who dares be true."

এই কারণেই বুঝি গান্ধীজী সারা জীবন 'সত্যের সাধনা' ক'রে গেলেন, কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্নের কোনো সংস্থান করলেন না! আবার এমার্সন বলেন:

"Go put your creed into your deed
Nor speak with double tongue."

এমার্সনের এই বাণীকেও গান্ধীজীর জীবনে আমরা ফলিত হ'তে দেখি। গান্ধীজী এমার্সনের উক্তি ভোলেন নি:

"The greatest homage we can pay to truth is to use it."

(অবশ্য, 'সত্য' বলতে এখানে বুঝতে হবে, গান্ধীজী যাকে সত্য ব'লে বুঝেছিলেন,—বস্তুত হোক্ না তা অসত্য।)

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, এমার্সনকে-ও গান্ধীজী সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। এমার্সন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, তার উদ্‌বর্তনে, তার মানবের কল্যাণসাধনী শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বোস্টন থেকে কংকর্ডে পালিয়েছিলেন সত্য, তথাপি যন্ত্র তাঁর কাছে যন্ত্রদানব হয় নি। তিনি তাঁর কবিমনের ও মিস্টিসিজ্‌মের ঝাপসা দৃষ্টিতেও যন্ত্রদানবের বিভীষিকার রোগটাকে অনেকখানি স্পষ্টভাবেই দেখেছিলেন। কবিসুলভ অপূর্ব ভাষায় বলেছিলেন:

মনের আর্ত পলায়নপরতা—excapism. মানুষের দৈন্য-দুঃখ যখন পল্লীতে বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে, তখন তার রঙটা ফিকে হয়ে আসে, তার ভয়াবহ রূপটা ততো সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু শহরে মানুষের ভীড় যেমন বাড়ে, তাদের দুঃখ-বেদনার রূপটিও ততো পুঞ্জীভূত ও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সে দুঃখ ও বেদনার জ্বালা হয়ে ওঠে যেমন তীব্র, রঙটা-ও হয় তেমনি গাঢ়, পিচ্ছল ও বীভৎস। ওয়ার্ডস্বার্থ, এমার্সন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, কেউই মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের পুঞ্জীভূত নাগরিক রূপটিকে সহ্য করতে পারেন নি। তাই তাঁরা সবাই পলায়ন করেছিলেন শহর থেকে দূরে—যতো দূরে সম্ভব। কেবল ওয়ার্ডস্বার্থ, এমার্সন, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর মধ্যেই নয়, বর্তমান এই শোষণ-সভ্যতার যুগে বহু প্রখর-অনুভূতিশীল মানুষকেই কি কাব্যে, কি চিন্তায় এই পলায়নপরতা আশ্রয় করতে হয়েছে। তাই দেখি, ডি. এচ. লরেন্স বর্বর আরণ্যক জীবনের স্মৃতিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, লরেন্স অব্ অ্যারেবিয়া পালিয়েছিলেন বুর্জোয়া বৃটিশ শাসনের তাণ্ডব থেকে দূরে—আরবের বালু-ধূসর মরুভূমিতে। কেবল সাহিত্যে বা কাব্যে নয়, এই পলায়নপরতা দেখা যায়, সমাজ-জীবনের অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে-ও। অর্থনীতিতে দেখা যায়, নাগরিক সভ্যতাকে ত্যাগ ক'রে পল্লীতে পলায়নের চেষ্টা, গান্ধীবাদে ঘটেছে তার প্রকৃষ্ট প্রকাশ। ধর্মের মধ্যেও এই পলায়নপরতা, আধুনিক কালে ভারতে তার প্রকৃষ্ট প্রকাশ হয়েছে শ্রীঅরবিন্দে। (অবশ্য, ধর্ম বস্তুটিই হোলো এক প্রকার পলায়নপরতা। এই পলায়ন ঘটে অরণ্যে, গিরিগুহায়, মঠে, আশ্রমে, হৃদয়ে, ভগবানে, মোক্ষে, স্বর্গে।) এমন কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও অনেকক্ষেত্রে এই পলায়নপরতাকেই লক্ষ্য করা যায়, যথা ফ্রয়েডিয়ানার।

পল্লীপ্রীতি ও কৃষি-প্রীতির ব্যাপারে গান্ধীজীর উপর টলস্টয়ের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পল্লীবাসী কৃষকের জীবনই ছিল টলস্টয়ের আদর্শ জীবন। তাই টলস্টয়

"Things are in the saddle and ride mankind."

কোটি কোটি মানুষ আজ পণ্য দ্রব্যের উপর তাদের অধিকার হারিয়েছে। যে-পণ্যদ্রব্যকে শ্রমিকরা তাদের স্বহস্তে রচনা করেছে, আজ সেই পণ্যদ্রব্যেরই বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে শ্রমিককে। শ্রমিকরা-ও পরিণত হয়েছে পণ্যে। কেবল তাই নয়, আজ তাদের পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করে তাদের পণ্যদ্রব্যগুলিই। এই হোলো বর্তমান পণ্য সভ্যতার স্বরূপ। এমার্সনের কথাগুলি সহজেই—গান্ধীকে নয়—মার্ক্সকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিবর্তনে ও বিশ্বাস করতেন এমার্সন। বার্নার্ড শ-র মতন evolution-ই তাঁর God :

"The energy that searches through
From chaos to the dawning morrow,
Without halting, without rest,
Lifting better up to best."

বা টলস্টয়পন্থীরা বেশভূষাতে পর্যন্ত রুশ চাষী সেজে থাকতে চাইতেন, এবং তাতেই গর্ববোধ করতেন। টলস্টয় ছিলেন খাঁটি একজন রুশ জমিদার এবং তাঁর শিষ্যদের অধিকাংশই ছিলেন বিত্তবান শ্রেণীর লোক। সুতরাং কৃষকের অভিনয় করাটা তাঁদের মধ্যে একপ্রকার দার্শনিক ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল। টলস্টয় যেমন একদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন সকলপ্রকার বিত্তের-ও বিরোধী। তাই তিনি একদিকে যেমন ধনীদের বিভব-বিলাস বা বিত্তের ব্যক্তিগত ভোগের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, তেমনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন বিত্তহীন কৃষকের জীবনকে। টলস্টয় গান্ধীর মতোই সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রধান ব'লে স্বীকার না ক'রে গ্রহণ করেছিলেন ধর্মকেই প্রধান ব'লে। তাই টলস্টয় চেয়েছিলেন, ধর্মের অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক মানুষ ত্যাগের অনুশীলন করবে এবং এইভাবেই সমাজের একদিকের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য এবং অন্যদিকের অসহনীয় দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা খ্রীষ্টান সাম্যবাদীর মতো হয়ে উঠবে, দেশের সমস্ত বিত্তের হবে সুষ্ঠু বিতরণ এবং সাম্যের হবে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু টলস্টয়ের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি, যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রচার মার্ক্সিস্ট সাম্যবাদীদের যাত্রা-পথকে অনেক পরিমাণে সুগম ক'রে তুলেছিল। কিন্তু টলস্টয়ের প্রভাব সত্ত্বে-ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রচার গান্ধীজীর মধ্যে তীব্র রূপ ধারণ করে নি। কারণ, পূর্বেই বলেছি, তাঁদের উভয়ের পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল। টলস্টয় ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের মানুষ। অন্যপক্ষে, গান্ধী ছিলেন নবজাত ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের মুখপাত্র, আর বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিই হোলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু টলস্টয় ও গান্ধী, উভয়েই ত্যাগ ও দারিদ্র্যের স্তুতি করেছেন। ফলে, তাঁদের শিষ্য-সামন্ত দেশের ধনীরা কেউ ত্যাগের দ্বারা দারিদ্র্যকে বরণ করেন নি, কেবল শোষণের দ্বারা দারিদ্র্যকে দেশময় বিস্তীর্ণ ও তীব্রতর করবার বিবেকসংগত সমর্থন লাভ করেছেন। তাই সেদিন রাশিয়ায়, কিম্বা আজ ভারতে বিভববিলাসহীনতা ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছে শোষণ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। গান্ধীবাদী ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ আজ ত্যাগের মহিমায় সুন্দর হয় নি, শোষণে হয়েছে শুষ্ক, অনাহারে মুমূর্ষু, নিষ্পেষণে নির্বীর্য।

টলস্টয় বা গান্ধীর কৃষক সাজবার পেছনে আর একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য-ও নিহিত ছিল—আত্ম-নির্যাতনের আনন্দ। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা নিশ্চয় একে বলবেন —masochism.

দুঃখ পেলে মানুষ কাঁদে এই কারণেই যে, মানুষ কেঁদে আনন্দ পায়। কান্নাটা দুঃখের ক্ষতিপূরণ মাত্র। কিন্তু কান্না একপ্রকার আত্মনির্যাতনও। এন্টিস্থিনিস, ডিওজিনিস থেকে টলস্টয় ও গান্ধী পর্যন্ত অনেকের মধ্যেই আত্মনির্যাতনের এই তীব্র আনন্দবোধকে আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দৈহিক আত্মপীড়নের মধ্য দিয়েই প্রাচীন ভারতের কৃচ্ছ্রসাধক মহাতপা ঋষিরা পরমার্থিক আনন্দের পথ প্রশস্ত করতেন। এ সব সকলেরই বেদনা ছিল বিলাস, দৈহিক দুঃখ-দহনের জ্বালা ছিল মানসিক দীপ্তি।

কেবল সন্ন্যাসী কেন, ব্যভিচারীদের মধ্যেও আত্মনির্যাতনের এই ভাবটিকে লক্ষ্য করা যায়। ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি-ও অল্পবিস্তর আত্মনির্যাতন। তাই ব্রহ্মচর্যকেও আধুনিকরা এক-প্রকার ব্যভিচার ব'লেই নির্দেশ করেন। বস্তুত পক্ষে, ব্রহ্মচর্য বা ব্যভিচার কোনোটিই স্বাভাবিক নয়। ও যেন দোলায়মান পেণ্ডুলামের দুই প্রান্ত-সীমা। ওরা পরস্পর থেকে যতোই দূরবর্তী হোক, ওদের মধ্যে চরিত্রগত একটি ঐক্য ও আকর্ষণ আছে। তাই এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের পানে পেণ্ডুলামকে কেবলই চালিত করে। মধ্য যুগে খ্রীষ্টান ধর্মে ব্রহ্মচর্য পালন কিভাবে ব্যাপক ব্যভিচারে পরিণত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় সুবিখ্যাত বোকাচোর সুবিখ্যাত 'ডেকামেরন'-এর মধ্যে। হত্যা আর আত্মহত্যা, দুটোই মূলত এক—হত্যা মাত্র। আজকের স্বাস্থ্যহীন সমাজে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা যেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে, ব্রহ্মচর্যকেই সেখানে লোভনীয় আদর্শ মনে হয়। দোলায়মান পেণ্ডুলামের মতোই ব্যভিচারের প্রান্তসীমা জীবনকে ঠেলে দেয় ব্রহ্মচর্যের প্রান্তসীমার দিকে। এ-ও একপ্রকার পলায়ন। দুঃস্থ সমাজ থেকে ব্যক্তির মধ্যে ফিরে আসা যেমন পলায়ন, ব্যভিচারী সমাজ থেকে ব্রহ্মচর্যের দিকে ধাবিত হওয়াও ঠিক তেমনি একপ্রকার পলায়ন। পলায়নের দ্বারা ব্যক্তিগত নিষ্কৃতিলাভ হয়তো আংশিকভাবে সম্ভব হ'তে পারে, বিপদের কারণটা কিন্তু রয়েই যায়। যে-সমাজে জীবন নেওয়াটাই দস্তুর, জীবন দেওয়াটা সেই সমাজের ধর্ম। যেখানে স্বার্থপরতাই মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব, সেখানে স্বার্থত্যাগ হোলো আদর্শ। কিন্তু জীবনদান বা স্বার্থত্যাগ কোনটি স্বাভাবিক আদর্শ নয়। কারণ, একের জীবনদান অন্যকে হত্যাকারী ক'রে তোলে, একের স্বার্থত্যাগ অন্যকে ক'রে তোলে স্বার্থপর। তাই, আমরা দেখি, টলস্টয় বা গান্ধী, যিনিই ত্যাগ ও আত্মদানের স্তব করেছেন, তিনিই নিজের অজ্ঞাতে প্রচার করেছেন আদর্শের নামে অন্য একটি অনাদর্শকে।

গান্ধীজীর ত্যাগ ও আত্মনির্যাতন প্রসঙ্গে টলস্টয় ছাড়া আর যাঁর উল্লেখ অনিবার্য, তিনি হ'লেন গ্রীক দার্শনিক ডিওজিনিস।

আমরা বর্তমান প্রচলিত ভাষায় সংশয়ী নৈরাশ্যবাদী মানুষদেরই সাধারণত "সিনিক" ব'লে থাকি। কিন্তু 'সিনিক' শব্দের অর্থ বস্তুত তা নয়। 'সিনিক' শব্দের অর্থ কুকুরের মতো। প্রাচীন কালে গ্রীক দেশে এক শ্রেণীর দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা 'কুকুরের মতো' অর্থাৎ অতীব সহজ সরল জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন 'সিনিক' বা কুকুরপন্থী বলে। 'সিনিক' দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ডিওজিনিস। ডিওজিনিসের জন্মস্থান ছিল এশিয়ার অন্তর্গত পণ্টাস। জন্মকাল সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৪১২। মৃত্যুস্থান করিন্থ, মৃত্যুকাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৩।

ডিওজিনিসের বাবা মেকী মুদ্রার কারবার ক'রে জেলে যান। ডিওজিনিস দেখলেন, কেবল তাঁর বাবাই যে দেশে মেকী জিনিস চালিয়েছিলেন,তা নয়। জীবনের সকল দিকেই চলছে এই মেকী জিনিসের কারবার। সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চরিত্র, সব কিছুই মেকী। তাই ডিওজিনিস বার হ'লেন খাঁটির সন্ধানে। গ্রীক দার্শনিক এণ্টিস্থিনিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হোলো। এণ্টিস্থিনিস ছিলেন সক্রেতিসের সমসাময়িক, প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক প্লেটোর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়ো। এণ্টিস্থিনিসের মধ্য দিয়ে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কয়েকটি সূত্র ডিজিওনিসের মধ্যে এক বিরাট, ব্যাপক ও চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করলো: ডিওজিনিস ঘোষণা করলেন, মানুষকে সুখী হ'তে হ'লে হ'তে হবে ত্যাগী। সম্পদ, শক্তি, সম্মান ও শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। দৈহিক নির্যাতন হোলো তাঁর চিন্তার ফলিত দিক। ডিওজিনিস অনেক সময় দিনের পর দিন ক্ষুধা সহ্য ক'রে থাকতেন এবং এই অনিবার্য দৈহিক দাবীকে তিনি দমন ও অস্বীকার করবার জন্যে চেষ্টা করতেন। পরিধান করতেন স্বল্প বস্ত্র। (গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনা করুন।) তাঁর শয্যা-ও ছিল সরলতম। অনেকে বলেন, তিনি একটি ঝুড়ির মধ্যে শুতেন। যাই হোক, ডিওজিনিস সম্পর্কে আমাদের এ-কথাও মনে রাখতে হবে, যে-সামাজিক বাতাবরণে থেকে টলস্টয় বা গান্ধীর মধ্যে ত্যাগের মহিমা ও দারিদ্রের স্তুতি দার্শনিক মূর্তি লাভ করেছিল, অনুরূপ একটি অবস্থাতেই ডিওজিনিস হয়ে উঠেছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বর্তমানে, টলস্টয় বা গান্ধীর যুগে, যেমন শত শত শ্রমিক শোষণের ওপর ভিত্তি ক'রেই বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি ডিজিনিসের কালেও গ্রীসে শত শত বঞ্চিত ক্রীত-দাসের শ্রমের উপর ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল গ্রীসের নাগরিক সমাজ ও নগর-

রাষ্ট্রগুলি। তাই সেদিনও ডিওজিনিসের দর্শন টলস্টয় ও গান্ধীর দর্শনের মতোই এসেছিল দরিদ্র সর্বহারাকে সান্ত্বনা দিতে, সহিষ্ণুতা শেখাতে। আপাতদৃষ্টিতে সেদিন সর্বত্যাগী ডিওজিনিসকে সর্বগ্রাসী আলেকজান্দারের বিপরীত শক্তি ব'লে মনে হ'লে-ও, বস্তুত তাঁরা ছিলেন একই সামাজিক অবস্থার দুটি উপসর্গ,—পরস্পরের পরিপূরক। তাই সেদিন ত্যাগ, দারিদ্র্য-প্রীতি ও দুঃখসহনের স্তুতির মধ্য দিয়ে টলস্টয় ও গান্ধীর মতোই ডিওজিনিসের কালের ক্রীতদাসরা নিজেদের নিঃস্বতার মধ্যে পেয়েছিল আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মস্তুতি। তাদের দৈন্য পেয়েছিল ত্যাগের মহিমা, ভীরু অক্ষমতা পেয়েছিল দৃপ্ত সহিষ্ণুতায় গৌরব। ফলে, সেদিন ডিওজিনিসের দর্শন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল দাস-বিপ্লবের প্রতিকূল, ঠিক টলস্টয় ও গান্ধীর দর্শন আজ যেমন হয়েছে শ্রমিক-বিপ্লবের প্রধান অন্তরায়। ব্যক্তিগতভাবে টলস্টয় বা গান্ধীর মতোই ডিওজিনিস-ও ছিলেন অপূর্ব। তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছেঃ

কারিন্থের রাজপথের পার্শ্বে ব'সে আছে অর্ধোলঙ্গ অপরিচ্ছন্ন একটি মানুষ। সম্মুখ দিয়ে চলেছে 'দিগ্‌বিজয়ী' গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের শোভাযাত্রা। অজস্র মানুষের কোলাহল, তাদের সমারোহ, জয়ধ্বনির আকাশবিদারী উচ্ছ্বাস। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই ওই মানুষটির। ব্যাপারটা চোখে পড়লো আলেকজান্দারের, শক্তি ও ঐশ্বর্যকে ঈর্ষা করে না, কৌতূহল পর্যন্ত দেখায় না, কে এই মানুষ?

আলেকজান্দার ডিওজিনিসের কাছে এগিয়ে এলেন, পরিচয় দিলেনঃ 'আমি দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্দার।'

কিন্তু পরিচয় পেয়ে লোকটি চমকে উঠলো না, ব্যস্ত-বিব্রত হোলো না, তেমনি নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে ব'সে রইলো। কেবল বললোঃ 'আমি কুক্কুরপন্থী ডিওজিনিস।'

দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক সম্রাট বুঝি এই প্রথম দেখলেন, তাঁর পরিচয় শুনে মানুষ চমকে ওঠে না, ভয় পায় না, শ্রদ্ধা দেখায় না, এমন কি কৌতূহল-ও প্রকাশ করে না। সম্রাট বিমুগ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনার কি প্রয়োজন আছে, আমায় বলুন, ধন-রত্ন,—ক্রীতদাস .....'

'কিছুই না। কেবল আপনি দয়া ক'রে ভগবানের দেওয়া সূর্যালোকটুকুর পথ ছেড়ে দাঁড়ান।'

আলেকজান্দার বিস্মিত হলেন। মনে হোলো, বিপুল জলোচ্ছ্বাস যেন অকস্মাৎ একটি উপলখণ্ডের দিকে তাকিয়ে পলকের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বুঝি ভাবলো, বিপুল বিধ্বংসী তার শক্তি, উত্তাল উচ্ছ্বসিত তার তরঙ্গ, দুরন্ত দুর্বার তার গতিবেগ,

কিন্তু তবু—তবু সে কতো তরল! আর এই স্থবির স্থাণু ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডটি কতো—কতো কঠিন! আলেকজান্দার ব'লে উঠলেন, 'আমি যদি দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্দার না হতাম, তবে কুকুরপন্থী ডিওজিনিস-ই হতাম।'

আরো একটি গল্প :

একদিন দিনের বেলা ডিওজিনিস একটি লণ্ঠন হাতে আথেন্সের রাজপথে যেন কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন সাধু ব্যক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গান্ধীজী-ও যেন এমনি একটি সাধু ব্যক্তির সন্ধানে সমস্ত জীবন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, অবশেষে হয়তো তার সন্ধান পেয়েছিলেন নিজের মধ্যে—হয়তো!

শোনা যায়, ডিওজিনিসকে সক্রেতিস নাকি বলেছিলেন, 'তোমার শতচ্ছিন্ন পরিধানের ছিদ্র-পথেই তোমার দম্ভ আমি দেখতে পাচ্ছি।' গান্ধীজীকে সক্রেতিস কি বলতেন কে জানে! টলস্টয়ের মধ্যে অবশ্য কৃষক সেজে থাকবার, গরীবিয়ানা করবার একটি দম্ভ আমরা সহজেই লক্ষ্য করি।[১]

ডিওজিনিসের মৃত্যুক্ষণটিকে-ও স্মরণ না ক'রে পারা যায় না। আলেকজান্দারের মৃত্যুর দিনই ডিওজিনিস মারা যান ব'লে প্রবাদ আছে। এমন শান্ত, সমাহিত মৃত্যু সত্যই খুব কমই দেখা যায়। মৃত্যুর দিন ডিওজিনিস বুঝলেন, তাঁর জীবনের দিক্‌বলয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তাই তিনি রাজপথের পাশটিতে এসে বসলেন। দেখতে লাগলেন, মানুষের আনাগোনা। ভাবলেন, এমনিভাবে মানুষ আসে, যায়। তিনিও যাচ্ছেন।

যদি আততায়ীর হাতে গান্ধীজীর অপঘাত মৃত্যু না ঘটতো, তবে হয়তো তাঁরও এমনি একটি শান্ত, সুস্মিত, মনোরম মৃত্যু-মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতো, কে বলতে পারে!

পৃথিবীর সিনিক দার্শনিকদের মধ্যে বস্তুতপক্ষে, ডিওজিনিস, টলস্টয় এবং গান্ধী যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ-কথা বলা চলে।

[১] ম্যাক্সিম গর্কি-ও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন : "গত কাল তিনি (টলস্টয়) আমাকে বলেছিলেন, তোমার চেয়ে আমার মধ্যে কৃষকের দিকটা আছে অনেক বেশি। তাই চাষাড়ে ভঙ্গিতে চিন্তা করতে আমার বেশ লাগে।'

ও হরি! এ নিয়ে বড়াই করা উচিত ছিল না। অবশ্যই না।"—গর্কি-রচিত "টলস্টয়ের স্মৃতি' থেকে।

রোমাঁ রোলাঁ-ও তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে বলেন : "টলস্টয়ের কাছে সমস্তই ছিল এক সদম্ভ বিদ্রোহ, দম্ভ—দম্ভের বিরুদ্ধে, ঘৃণা—ঘৃণার বিরুদ্ধে, উচ্ছ্বাস—উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে।"

এইভাবে ভ্রান্ত হোক, অভ্রান্ত হোক, একটি আদর্শে প্রণোদিত হয়েই রুশ জমিদার টলস্টয়ের মতোই বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার গান্ধীজী কৃষাণ সাজতে চাইলেন। তাঁর সহকর্মী শিষ্যরা অনেকে অবিলম্বে এই কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করলেও গান্ধীজীকে আরো কিছুদিন জোহানেস্‌বার্গে থেকে যেতো হোলো। কেবল ব্যারিস্টারির জন্যে নয়, রাজনৈতিক কারণে-ও জোহানেস্‌বার্গ ছেড়ে আসা গান্ধীজীর পক্ষে সহজ ছিল না। ট্রান্সভালে তখন ভারতীয়-নির্যাতনের এক বিপুল কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছিল। স্থির হয়েছিল, ট্রান্সভালে নূতন ভারতীয় আসা যদি সত্যিই বন্ধ করতে হয়, তবে পুরাতন যারা আছে, তাদের সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে একজনের বদলে আর একজন এসে ঢুকতে না পারে, যদি বা আসে যেন তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। ট্রান্সভাল ইংরেজ অধিকারে আসবার পর থেকেই 'পাস' দেওয়া হোতো। 'পাসে' সই এবং নিরক্ষর হ'লে টিপসই থাকতো। পরে ঠিক হোলো, ফটোগ্রাফ, সই আর টিপসই, এ তিনই লাগবে। এর জন্যে আইন করবার কোনো দরকার ছিল না। কারণ, ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু ব্যবস্থাটাকে সাময়িক রাখবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না সরকারের। তাই ভারতীয়দের ফটো, সই ও টিপসই দেওয়ার ব্যবস্থাটাকে আইনে পরিণত করবার জন্যে একটি বিল আইনসভায় উত্থাপিত হোলো।

ট্রান্সভালে বৃটিশরা যখন ভারতীয়দের উপর এই ধরনের জুলুম করছিল, তখন নাতালে বৃটিশরা আদিম অধিবাসী জুলুদের উপর করছিল অমানুষিক অত্যাচার এবং জুলু দমনের এই নৃশংস ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা সভ্য জগতের কাছে প্রচার করছিল বিদ্রোহদমন ব'লে। গান্ধীজী-ও তাঁর 'আত্মকথা' গ্রন্থে বলেন: "এ তো যুদ্ধ নয়, এ ছিল মানুষ-শিকার।"

নাতালে জুলু-বিদ্রোহের এই সংবাদ ট্রান্সভালে গান্ধীজীর কানে গেলে তিনি বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতে চাইলেন। "জুলুদের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা ছিল না। একজন ভারতবাসীর-ও তারা কোনো ক্ষতি করে নি। তাদের বিদ্রোহ করবার সামর্থ্য সম্পর্কে আমার নিজের-ও সংশয় ছিল। কিন্তু তখনো ইংরেজ রাজত্বকে আমি জগতের পক্ষে কল্যাণকরী রাজত্ব ব'লেই মানতাম।···বৃটিশের ক্ষতি হোক, আমি তা চাইতাম না। এ জন্যেই বলপ্রয়োগের নীতি বা দুর্নীতি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত আমাকে আমার সংকল্প থেকে বিরত করতে সমর্থ হোলো না।"

রাতারাতি গান্ধীজী নাতালে চ'লে গেলেন। কস্তুরবাই গেলেন ফিনিক্সের

কৃষিক্ষেত্রে। স্থানীয় ভারতীয়দের কয়েকজনকে নিয়ে গান্ধীজী একটি সেবাদল গঠন করলেন। সামরিক পদের দিক থেকে গান্ধীজী হলেন সার্জেণ্ট মেজর গান্ধী। ইংরেজদের সাহায্য করতে এসে কিন্তু তিনি প্রথমে স্বস্তি পান নি। তবে আহত জুলুদের সেবা ও শুশ্রূষা করবার ভার যখন তাঁর উপর এসে পড়লো, তখন তিনি সত্যই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। তিনি যে তথাকথিত কর্তব্যের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার যেন একটা আপোস-মীমাংসা ঘটলো। "দেখলাম, আমরা যে সমস্ত নিগ্রোর সেবা করছিলাম, আমরা না গেলে তারা বিনা শুশ্রূষায় মরতো।··· কতকগুলি নিগ্রোর ঘায়ে পাঁচ ছয় দিন হাত দেওয়া হয় নি, ঘা প'চে দুর্গন্ধ হয়েছিল।"

নাতালে গান্ধীজী যখন আহত জুলুদের শুশ্রূষা ক'রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন ট্রান্সভাল থেকে কেবলই তাঁর জরুরী ডাক আসতে লাগলো, সেখানে তাঁর একান্ত প্রয়োজন। গান্ধীজী অধীর হয়ে উঠলেন। মাস খানেকের মধ্যেই 'জুলু বিদ্রোহ' দমিত হোলো। গান্ধীজী আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করলেন না, এমন কি নাতালের ফিনিক্সে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাতেরও সময় পেলেন না, ট্রান্সভালে ফিরে গেলেন। জোহানেস্‌বার্গে পৌঁছেই তিনি 'এশিয়াটিক আইনের' খসড়াটি হাতে পেলেন।

খসড়ায় বলা হয়েছে: ট্রান্সভালবাসী সমস্ত ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ এবং আট বৎসর বা তদূর্ধ্ববয়স্ক বালক-বালিকা, সবাইকে নাম লিখিয়ে নূতন ক'রে পাস নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম লিখিয়ে পাস না নিলে ট্রান্সভালে থাকবার অধিকার আর থাকবে না। কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং ট্রান্সভালের বাইরে বহিষ্কার-ও হ'তে পারবে। যে পাস দেওয়া হবে, তাও আবার যেখানে যেমন অবস্থায় যখন ইচ্ছা পুলিশ দেখতে চাইলে দেখাতে হবে। গান্ধীজী বলেন: "পৃথিবীর অন্য কোথাও স্বাধীন মানুষের জন্যে এ রকম আইন আছে ব'লে আমি জানি না।···এই আইনভঙ্গের যা সাজা, নাতালের অন্যান্য আইনভঙ্গের সাজার সঙ্গে তার তুলনাই করা যায় না। যে-ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করছে, এই আইনের বলে তাকেও বহিষ্কৃত হ'তে হবে। কেবল তাই নয়, এই আইনে কারো কারো আর্থিক সর্বনাশ ঘটবে।" তিনি আরো বলেন: "আমার মনে হোলো, এই বিল যদি পাস হয়, এবং ভারতীয়রা যদি তা মেনে নেয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তারা সর্বতোভাবে উৎপাটিত হবে। আমি স্পষ্টই দেখলাম, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এ হোলো জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।"

সুতরাং ধনিক ভারতীয়দের নেতৃত্বেই এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হোলো। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর আহূত হোলো একটি সভা। তাতে

ট্রান্সভালের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন। সভায় শপথ গৃহীত হোলো যে, জীবন পণ ক'রে এই আইনের বিরোধিতা করা হবে। এর পর ট্রান্সভালের সর্বত্রই সভাসমিতি ও সংগঠন শুরু হোলো। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো জোহানেস্‌বার্গ শহর থেকে চারিদিকে, ট্রান্সভালের সুবিস্তৃত ভূমিতে।

কেবল সংগ্রাম নয়, আপোস-মীমাংসার পথে-ও ভারতীয়রা অগ্রসর হ'লো। বস্তুতপক্ষে, কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে সকল সত্যাগ্রহ আন্দোলনেই সংগ্রামের চেয়ে সহযোগিতার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। এর কারণ এই ছিল যে, বৃটিশ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের লড়াইটা যতোই প্রবল হোক, তারা উভয়েই ছিল একই বুর্জোয়া শ্রেণীরই মানুষ। তাই তাদের স্বার্থের লড়াইটা প্রবল হ'লেও, তা কতকটা ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের রূপ নিয়েছিল। তার একদিকে যেমন ছিল আস্ফালন, অন্যদিকে তেমনি ছিল পরস্পরের স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

গান্ধীজীকে সচরাচর সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উদ্ভাবক বলা হয়। গান্ধীজী কতকটা নিজে-ও একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের দিক থেকে, তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের এই নীতি ও রীতি দু হাজার বছর ধ'রে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে প্রযুক্ত হয়েছে। গান্ধীজী তাকে ভারতের প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, এই মাত্র।

॥ দশ ॥

আর একটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করি। পৃথিবীতে যতো বার এই ধরনের অহিংস প্রতিরোধের নীতি গৃহীত হয়েছে, প্রতিবারেই তা হয়েছে কোনো সুদৃঢ় শক্তিশালী এক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আবার যখনই সেই শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখনই দেখা গেছে, তার বিরোধিতা ঘটেছে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। গান্ধীজী খ্রীষ্টকেই প্রথম সত্যাগ্রহী ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু যিশু খ্রীষ্টের পূর্বে জুডিয়া বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যতোদিন স্বাধীন, কিংবা দুর্বল, ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত ছিল, ততোদিন সেখানে জোনা, নোআ ও মোজেজ প্রভৃতি মহাপুরুষদের "চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত" নীতিরই প্রচলন ও প্রচার ছিল। এমন কি খ্রীষ্টের অনতিপূর্ববর্তী ঋষি হাগাই-এর বাণীর মধ্যেও আমরা তারই প্রতিধ্বনি শুনি। ঋষি হাগাইয়ের কাল প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৫২০। জুডিয়া বা তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল যখন শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হোলো, তখন দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য প্রবলতর হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিবিধান করবার আর কোনো আশা ছিল না। কারণ, এই শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছিল অসম্ভব। তাই রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মানুষরা যখন দেখলো যে, পার্থিব দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত থেকে তাদের আর অব্যাহতি নেই, তখন তাদের মধ্যে দেখা দিল পার্থিব বিষয় সম্পর্কে গভীর হতাশা এবং অবৈপ্লবিক সহিষ্ণু মনোবৃত্তি। তারা একদিকে যেমন সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও দারিদ্র্যের মহিমা কীর্তন ক'রে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে চাইলো, তেমনি অন্যদিকে অপার্থিবের আশায় ও কল্পনায় মেতে উঠলো। খ্রীষ্টপূর্ব ঋষিরা, যাঁরা রোম সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসেন নি, তাঁদের বাণীর মধ্যে অপার্থিবের প্রতি এই রকম নিবিড় অনুরাগ দেখা যায় না। তাই তাঁরা বিপ্লবী, তাঁরা হিংসাপরায়ণ, তাঁরা প্রতিবিধিৎসু। হাগাই-এর বাণীর মধ্যে তাই মর্ত্যলোকের পার্থিব সুর সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। তাঁর বাণীর মধ্যে খ্রীষ্টের 'স্বর্গীয় ব্যবস্থার' কল্পনা নেই, তা পার্থিবের দীপ্তিতে ভাস্বর ও তেজোময়। "I will shake the heavens and earth, and the sea and the dry land.······And the desirable things of all nations shall come, and I will fill this house, with my glory, saith Yahveh of

hosts. The silver is mine, the gold is mine, saith Yahveh of host."

পরে আবার যখন রোম সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরলো, তার দৌর্বল্য প্রকাশ পেলো, তখন খ্রীষ্টানরা বিনা দ্বিধায় ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার বাণী ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করলেন—মহম্মদের মতোই তরবারিযোগে প্রচার করতে চাইলেন খ্রীষ্টধর্ম। খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম শাখা ইসলামের যখন অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেই সময়ে আরব দেশে রোম সাম্রাজ্যের মতো শক্তিশালী কোনো শাসন-ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, সেখানে খ্রীষ্টধর্ম মহম্মদের মারফত সহিংস, সশস্ত্র ও বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করেছিল। অবশ্য, মরুভূমিতে পার্থিব সম্পদের অপাচুর্য ও তাঁদের অপার্থিবের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত করেছিল।

গান্ধীজীর ত্যাগ, অহিংসা বা পারলৌকিকতার সঙ্গে আদিম খ্রীষ্টানদের রীতিনীতির বহুল সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্যের প্রধান কারণ—গান্ধীজীও রোম-সাম্রাজ্যের অনুরূপ বিশাল শক্তিশালী একটি সাম্রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে সশস্ত্র বিদ্রোহ যেমন ছিল কল্পনার অতীত, পার্থিব সুখ-সম্পদ্-ও ছিল তেমনি অবাস্তব। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী দরিদ্র জনসাধারণের কাছে-ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিল একটি আতঙ্কের বস্তু। তার বিপুলত্ব তাকে অনেক পরিমাণে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল। বিশেষত, সিপাহী-বিদ্রোহের পরাজয়ের পর, তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা করাও ছিল যেমন বৃথা, তেমনি পার্থিব দুঃখদৈন্যের নিরশন হওয়ার আশা-ও ছিল অবাস্তব। ফলে, ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণ একদিকে যেমন গান্ধীর ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও অহিংসার মধ্যে সান্ত্বনা পেলো, তেমনি আশা ও ভরসা পেলো তাঁর ধর্ম, ভগবান ও পারলৌকিকতার মধ্যে। তাই আদিম খ্রীষ্টধর্মের অনুরূপ পথেই গান্ধীর খ্রীষ্টীয় ধর্ম-ও গ'ড়ে উঠলো—তা মহম্মদের মতো সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ নিলো না।

কেবল খ্রীষ্ট বা গান্ধীর কালেই নয়, অন্যান্য সময়ে-ও যখনই দেখা গেছে, জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ ঘটেছে এবং রাষ্ট্রের কাছে তার কোনো প্রতিকার মিলছে না, অথচ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের বিন্দুমাত্র আশা নেই, তখনই এই অহিংস প্রতিবাদের পথ গৃহীত হয়েছে। পশ্চিম জগতে এর নাম দেওয়া হয়েছে., নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance. গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে এই নিষ্ক্রিয় আন্দোলন থেকে পৃথক ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, সত্যাগ্রহ নিষ্ক্রিয় নয়। অর্থাৎ ইউরোপের "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সগুলি" যেন

নিষ্ক্রিয়ই ছিল ![1] কোয়েকার বা দুখবরদের আন্দোলনের কথাই ধরা যাক্। তাঁরা সভাসমিতি, প্রচার, আন্দোলন, আইন অমান্য ইত্যাদি সত্যাগ্রহের সমস্ত পথগুলিকে সময়োপযোগিভাবে ব্যবহার করতেন। সেদিক থেকে তাঁরা গান্ধীজী বা গান্ধীবাদীদের অপেক্ষা কোনো অংশেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। গান্ধীজীর আন্দোলনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হ'লো অধিকতর ব্যাপকতা এবং বৃহত্তর জনসংখ্যা। অথচ আন্দোলনকারীর সংখ্যার উপর গান্ধীজী নিজে বিন্দুমাত্র জোর দেন নি। তাঁর মতে, একজন মানুষও সত্যাগ্রহ করলে যথেষ্ট। তাতেই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে, অবিচার-অনাচার লোপ পাবে, 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হবে। "I do not regard the force of number as necessary in a just cause."[2] অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় বা ভারতবর্ষের প্রধান আন্দোলনগুলিতে তিনি জনসংখ্যার ওপর নির্ভব না ক'রে পারেন নি, জনসাধারণ প্রস্তুত নয় ব'লেই তিনি বারে বারে আন্দোলন স্থগিত রেখেছিলেন। অবশ্য, ব্যষ্টিবাদী বুর্জোয়া-সমাজের মুখপাত্র হিসাবে ব্যক্তি-মহিমাকে বাক্যত স্বীকার ও প্রচার না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। এই প্রচারের কবলে তিনি নিজেও কবলিত হয়েছিলেন। তেলা পোকার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, তারা নাকি তাদের জারক রসে অন্যান্য পোকাকে ভিজিয়ে, কেবল তাদের জাতি নয়, বর্ণ-ও বদলে দিয়ে স্বজাতিভুক্ত ক'রে নেয়। গান্ধীজীর বেলাতেও হয়েছিল তা-হ। তিনি সত্য সন্ধান করতে গিয়ে বুর্জোয়া প্রচারের জারক রসে পতিত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রচার-বাক্যগুলিকে স্বর্গীয় বাণী ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সংখ্যা-বিদ্বেষ তারই অন্যতম নিদর্শন। তাই আমরা গান্ধীজীর জীবনে লক্ষ্য করি, পরে যখন ভারতবর্ষে স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা ও আত্মসংগঠন-শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ শ্রমিক বা কৃষাণরা যখন আর কেবল বুর্জোয়া যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলো, তখন গান্ধীজীর মধ্যে ব্যষ্টিবাদিতা (individualisam) দ্রুত একটি চরম রূপ গ্রহণ করলো, গান্ধীজী আন্দোলনকে ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর ক'রে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের প্রথমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে ফিরে এলেন—তাঁর 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' আন্দোলনে। জনসাধারণের প্রচণ্ড সংগ্রামী শক্তির বিস্ফোরণকে শক্তিহীন ও

১ "সত্যাগ্রহের মূল-মন্ত্রের প্রয়োগ সামাজিকভাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে ট্রান্সভালেই প্রথম হইল। টলস্টয় এই কথাই বলেন। আমি শুদ্ধ সত্যাগ্রহ প্রয়োগের ঐতিহাসিক উদাহরণ পাই না। আমার ইতিহাসের জ্ঞান অল্প বলিয়া এ বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারি না।"

২ ইয়াং ইণ্ডিয়া, হাণ্টার কমিটিতে প্রশ্নোত্তর।

দুর্বল করবার মানসেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আন্দোলন গৃহীত হয়েছিল, একথা বলা চলে। এই আন্দোলন ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশী ধনতন্ত্রবাদের 'সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌'। সুতরাং আন্দোলনকারীর সংখ্যার অনুপাতের দিকে লক্ষ্য না দিলে গান্ধীর সত্যাগ্রহের সঙ্গে বৃটিশ কোয়েকার ও রুশ দুখবরদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র পার্থক্য থাকে না। একথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রুশ দুখবর আন্দোলন শক্তিশালী রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ঘটেছিল।

গান্ধীজী বলেন, ডাঃ ক্লিফোর্ডের নেতৃত্বে 'নন্‌-কন্‌ফর্মিস্ট' খ্রীষ্টানরা ও ভোটের দাবীতে ইংরেজ মহিলারা যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করেছিলেন, তা ছিল দুর্বলের আন্দোলন—সেসব আন্দোলন থেকে বিপক্ষের প্রতি বৈরী ভাব দূর করা হয় নি। অন্যপক্ষে, তাঁর নিজের আন্দোলন ছিল শক্তিমানের আন্দোলন, তাতে বিপক্ষের প্রতি প্রেম ও ক্ষমা ছাড়া বিন্দুমাত্র বৈরী ভাব ছিল না। গান্ধীজীর এই উক্তি অলীক কল্পনা মাত্র। তিনি তাঁর আন্দোলনকে এমনি একটি পথে পরিচালিত করতে হয়তো চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুবর্তীরা যে সেই দার্শনিক মনোভাবকে বিন্দুমাত্র গ্রহণ করে নি, কেবল বিপক্ষকে পরাজিত করবার জন্যে তাকে রণকৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছিল, একথা সত্য। তাই কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে, সর্বত্রই দেখা গেছে, জনসাধারণের মধ্যে রোষ ও আক্রোশ স্থলে স্থলে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। হিংসার এই সাময়িক খণ্ড প্রকাশের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে বিপক্ষের প্রতি রোষ ও ক্ষোভ প্রচুর পরিমাণে ছিল, সেগুলিকে তারা রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবে দমন ক'রে রেখেছিল মাত্র। সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে শক্তিমানের আন্দোলন, তাও বলা চলে না। গান্ধীজী ছাড়া তাঁর শিবিরের অন্যান্য সেনানায়করা এ কথা বিশ্বাস করতেন না। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা নিঃসংকোচে বলেছিলেন, অহিংস আন্দোলন তাঁদের কাছে 'expedient' মাত্র। সম্ভব হ'লে, সুযোগ থাকলে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তাঁদের আপত্তি ছিল না। গান্ধীজী নিজে-ও বলেছিলেন: "একথা আমি বোঝাতে চাই না যে, ভারতীয়দের যদি মতাধিকার বা অস্ত্রবল থাকতো, তবুও তারা সত্যাগ্রহ করতো। ভোটাধিকার থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের আবশ্যকই হয় না। আর যদি অস্ত্রবল থাকে, তবে অপর পক্ষ অবশ্যই সাবধান হয়ে চলেন।" (—'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ") অন্যত্র: "মিষ্টি কথায় তিনি (মিঃ চেম্বারলেন) আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, 'তোমাতে আমাতে তরবারির সম্পর্ক।' কিন্তু আমাদের তরবারি কোথা? তরবারির আঘাত সহ্য করবার দেহ থাকে তো আমরা তাই

ভাগ্য মনে করবো।" (—গান্ধীজীর 'আত্মকথা') সুতরাং বোঝা যায়, ইউরোপীয় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে ভারতীয় সত্যাগ্রহের মূলত পার্থক্য নেই। সত্যাগ্রহ দুর্বলেরই আন্দোলন। সত্যাগ্রহকে শক্তি, সহিষ্ণুতা ও ধর্মের মহিমা দেওয়ার ব্যাপারটা কতক পরিমাণে এই রকম দাঁড়ায়: ভিখারীর ভাণ্ডারে চাল নেই; উপবাস তার অনিবার্য; কিন্তু সেদিন ছিল একাদশী; তাই ভিখারী ভাবলো, ব্রত করলে কেমন হয়? উপবাস তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে পুণ্যলাভ-ও হবে খানিকটা, আর তাতে উপবাস সহ্য করবার মানসিক সাহায্যও জুটবে। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে শক্তির ও ধর্মের মহিমা দিয়ে তাঁর অনুবর্তীদের মনোবল যে বাড়িয়ে তুলেছিলেন, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পরিবর্তে 'সত্যাগ্রহ' নামটি কেন এই আন্দোলনকে দেওয়া হোলো, তার অন্যতম কারণ হিসাবে গান্ধীজী বলেন: "যুদ্ধ যতোই এগোতে লাগলো, নামটা ততই বেমানান মনে লাগলো। এই মহাসংগ্রামকে একটা ইংরেজি নামে ডাকতে আমার লজ্জা করতো। তাছাড়া ঐ বিদেশী শব্দটি সম্প্রদায়ের মুখে চালু করাও কঠিন ছিল।" নূতন নামকরণের পক্ষে এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। কেবল তাই নয়, কোনো সংগ্রামকে নিষ্ক্রিয় নামে অভিহিত করলে সংগ্রামের উদ্যম হ্রাস পেতে পারে, এই আশঙ্কাও ছিল। তাই নিষ্ক্রিয় কথাটির বিরুদ্ধে গান্ধীজী সতর্ক হয়েছিলেন মনে হয়।

যাই হোক, আমরা লক্ষ্য করেছি, রোম সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনেই মূলত অহিংসাত্মক সংগ্রাম বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে অহিংসার সংস্কৃতি আমেরিকা মুলুকেও পৌঁছেছিল। সেখানে তা যে-কয়জন মনীষীর মধ্যে প্রধানত প্রকাশলাভ করেছিল, তাঁদের মধ্যে অ্যাডিন ব্যালু (Adin Ballou) ও গ্যারিসন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ব্যালু ও গ্যারিসন প্রায় সমসাময়িক। অবশ্য, অহিংস যুদ্ধের সংঘ ও সূচী গ্যারিসনের মধ্যেই পূর্ণতর রূপ লাভ করেছিল।

উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসনের জন্ম হয় মাসাচুসেট্‌সে, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর কালের আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ। তাই বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগেই গ্যারিসন দাস প্রথা-উচ্ছেদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্মের ঠিক দশ বৎসর বাদে, তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্যারিসন বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র অহিংসার প্রচার ও অহিংস সংগ্রামের

মধ্যে দিয়েই কোনো মহৎ কার্য সাধিত হ'তে পারে। তাই অহিংসা প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্যারিসন একটি সংঘ স্থাপন করেন এবং অহিংস উপায়ে দাস-প্রথার উচ্ছেদের জন্যে প্রচার চালাতে থাকেন। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রচারে দাস-প্রথার সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করতে থাকে। গ্যারিসনের কাছে হত্যার ভয় দেখিয়ে চিঠিপত্র প্রায়ই আসতো। কিন্তু গান্ধীজীর মতোই গ্যারিসনও ঘাতকের অস্ত্রকে ভয় করতেন না। বন্ধু-বান্ধবের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কোনো অস্ত্র কখনো সঙ্গে নিতেন না। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস যুদ্ধ পূর্ণ উদ্যমে চলতো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আইনত আমেরিকা থেকে দাস-প্রথার উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং সত্যিকার উচ্ছেদের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল একটি ব্যাপক রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের। সেই গৃহযুদ্ধের বিজয়ী নেতা ছিলেন প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন,—অহিংস যোদ্ধা উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন নন!

সুতরাং দেখা যায়, ঐতিহাসিকতার দিক থেকে 'সত্যাগ্রহ' গান্ধীজীর নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। অনুরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে তা বহুবার প্রকাশ লাভ করেছে। তবে সময়োপযোগী অস্ত্র হিসাবে অহিংস যুদ্ধের কলাকৌশল এবং রীতিনীতিকে গ্রহণ করবার সকল গৌরব যে গান্ধীজীর, এ-কথা বলা বাহুল্য। অস্ত্র আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করলেও—হোক তা অহিংস অস্ত্র—সৈনাপত্যের গৌরব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবে কে? সে গৌরব তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বৃটিশ সরকারের কাছেও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হোলো। কারণ, ট্রান্সভাল তখনো 'ক্রাউন কলোনি' বা খাস উপনিবেশ ব'লে গণ্য হোতো। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। ট্রান্সভালে স্বায়ত্ত-শাসন না থাকায় সেখানকার সরকারী কার্যকলাপের দায়িত্ব শেষে খোদ বৃটিশ সরকারের ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-দলনে বৃটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন থাকলে-ও ভারতবর্ষের শাসনকার্যে পাছে গোলযোগ ঘটে, এই ভয়ে দায়িত্ব তাঁরা নিতে নারাজ। তখন উপনিবেশ-সচিব ছিলেন লর্ড এল্‌গিন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে নিতান্ত অমায়িকভাবেই জানালেন যে, ভারতবাসীর উপর এমন অন্যায় বৃটিশ সরকার কখনো হ'তে দিতে পারেন না। এশিয়াটিক বিল নামঞ্জুর করবার জন্যে তাঁরা সম্রাটকে পরামর্শ দেবেন।

কিন্তু তাঁরা সেই সঙ্গে আর-ও একটি পরামর্শ সম্রাটকে দিলেন। স্থির হোলো, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে ট্রান্সভালকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে। এর

ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-দলন চলবে, অথচ তার দায়িত্ব বৃটিশ সরকারকে নিতে হবে না।

ট্রান্সভালে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হোলো। নূতন আইনসভায় প্রথমে হোলো বাজেট, ঠিক তার পরেই এশিয়াটিক বিল। স্থির হোলো, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই থেকে এশিয়াটিক আইন বলবৎ হবে। ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে নিজেদের নাম লেখাবার জন্যে হুকুম এলো ভারতীয়দের উপর।

কিন্তু কে মানে হুকুম! ভারতীয়রা ক্রমেই আরো সংঘবদ্ধ হ'তে লাগল। বৃটিশ সরকারের প্রতারণা তাদের আরো ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। প্রিটোরিয়ার এক জনসভায় স্থির হোলো, এই অপমানজনক আইন ভারতীয়রা কেউ মানবে না। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের পথে তারা এর প্রতিরোধ করবে। সরকারী জুলুমের ভয়ে গোড়ায় শ পাঁচেক লোক পাস নিয়েছিল। কিন্তু এর বেশী সরকারের সমস্ত চেষ্টাই ।বফল হোলো। শুরু হোলো ব্যাপক গ্রেফ্‌তার। বিচারে সত্যাগ্রহীদের উপর অবিলম্বে ট্রান্সভাল ত্যাগের আদেশ এলো। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা ফের আদেশ অমান্য করলেন। গান্ধীজী-ও গ্রেফ্‌তার হলেন। গান্ধীজীর গ্রেফতারের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিবসে বন্দী সত্যাগ্রহীতে কারাগার ভ'রে গেলো। এইভাবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে বন্দীর সংখ্যা হোলো শতাধিক। মেয়েরাও বাদ গেল না। জেলের বাইরে ভারতীয়দের মধ্যে অপূর্ব চাঞ্চল্য এবং উৎসাহ দেখা গেলো। এমন সময় ট্রান্সভাল সরকারের পক্ষ থেকে এলো সন্ধির প্রস্তাব। শর্ত, প্রথমে ভারতীয়রা সত্যাগ্রহ বন্ধ ক'রে স্বেচ্ছায় গিয়ে নাম লিখিয়ে পাস নিয়ে আসবে, তাহ'লে ট্রান্সভাল সরকার পরে আইনটি তুলে নেবেন। সরকারের প্রধান কর্তা জেনারেল স্মাট্‌সের ধূর্ততা সম্পর্কে গান্ধীজী যে সন্দিহান ছিলেন না, এমন নয়; তবু তিনি এই শর্তেই আপোস করতে রাজী হলেন। কারণ, আপোস ও সহযোগিতাই সত্যাগ্রহের প্রথম ও শেষ কথা। সত্যাগ্রহ স্থগিত রইলো। গান্ধীজী ভারতীয়দের বুঝিয়ে বললেন, ধ'রেই নেওয়া যাক, জেনারেল স্মাট্‌স্ তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন। যদি না রাখেন, তবে ভয় কি, আবার সত্যাগ্রহ শুরু করা যাবে।[১]

---

১ এ সম্পর্কে প্রথম সত্যাগ্রহী যিশুর বাণী স্মরণীয়:

"Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer and thou be cast into prison." (Matt. v, 25)

অবশ্য, গান্ধীজী স্বেচ্ছায় ও সহজে কারাবরণ করতেন। রোম সাম্রাজ্যের কারাগারের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারাগার অনেক সহনীয় ছিল, এ প্রসঙ্গে সেকথাও উল্লেখযোগ্য।

অনেকে প্রতিবাদ করলেন, তাতে জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তা ব্যাহত হবে ; পরে সত্যই যদি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, তখন তাদের সাহায্য মিলবে না। কিন্তু গান্ধীজী জবাবে বললেন, সত্যাগ্রহীর যুদ্ধ সাময়িক উত্তেজনার উপর নির্ভর করে না। কারণ, তা শান্তি, ধৈর্য ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহীর সর্বপ্রথম কর্তব্য শত্রুকে বিশ্বাস করা ; সুতরাং আন্দোলন স্থগিত রইলো। গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের বললেন, তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগভাবে নিজেদের নাম লিখিয়ে পাস নিয়ে আসেন এবং স্থির করলেন, সর্বপ্রথমে তিনিই পাস নেবেন। কিন্তু তবু প্রতিবাদের শেষ হোলো না ঃ একদা গান্ধীজী স্বয়ং এই পাসের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন, আজ অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে পাসের প্রতি এমন প্রীতি উথলে উঠলো কেন ? এই প্রশ্নের জবাবও গান্ধীজী তাঁর স্বাভাবিক বাক্‌-চাতুর্যের সঙ্গেই দিলেন ঃ "স্বেচ্ছায় নমস্কার করাটাই ভদ্রতা। কিন্তু কেউ যদি নমস্কার করিয়ে নেয়, সেটা হোলো জুলুম। আমরা এখন স্বেচ্ছায় পাস নেবো ; এটাই সৌজন্য।" কিন্তু এতে-ও সকল আন্দোলনকারীর সন্দেহের নিরসন হোলো না। কারো কারো ধারণা হোলো, গান্ধীজী ঘুষ খেয়েছেন, এমন কি কল্পনায় ও জনশ্রুতিতে ঘুষের পরিমাণটাও নির্ধারিত হয়ে গেলো, পনের হাজার পাউণ্ড। তাই পরদিন পাস নেওয়ার কিছু আগে গান্ধীজী জনৈক ভারতীয় কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। নির্দয় প্রহারের ফলে তিনি আহত ও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সুস্থ হ'তে তাঁর দশ-এগারো দিন সময় লাগলো। তাঁর আগ্রহাতিশয্যের ফলে প্রথম পাসখানি তাঁর জন্যে রেখে বাকী অন্যান্য সবাইকে পাস দেওয়া হোলো।

ট্রান্সভালস্থ ভারতীয়দের উদ্যোগে আন্দোলন পরিচালিত হ'লেও সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা এই আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আন্দোলনের আকস্মিক ছেদে ট্রান্সভালের বাইরেও প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। গান্ধীজী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এমনি একটি জনরব নাতালেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ সময়ে তাঁর পরিবার নাতালের ফিনিক্সেই ছিলেন। গান্ধীজীর আহত হবার সংবাদে তাঁরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাই সুস্থ হয়েই গান্ধীজী রাজনৈতিক ও পারিবারিক উভয় কারণেই নাতালে গিয়ে পৌছলেন।

নাতালে জনসভার আয়োজন হ'লো। গান্ধীজী স্থির করলেন, ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ট্রান্সভাল সরকারের সঙ্গে তিনি কি শর্তে সন্ধি করেছেন, এই সভায় তা জানাবেন। তাঁর কোনো কোনো বন্ধু তাঁকে সতর্ক ক'রে দিলেন যে, এখানেও

একদল লোক তাঁর কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তারা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এই সতর্ক-বাণী গান্ধীজীকে বিরত করলো না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহীর বাণী[১] স্মরণ ক'রে নির্ভয়ে সভামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সভা শুরু হয়েছিল রাত্রি আটটায়। সভার কাজ এবার শেষ হয়ে এলো। এমন সময় একজন পাঠান লাঠি হাতে সভামঞ্চে এসে দাঁড়ালো। আলোগুলি অকস্মাৎ নিভে গেলো। চারিদিক থেকে অন্ধকার আর অন্ধকার বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো ছুটে এলো এক নিমেষে। গান্ধীজী বলেন: "আমি বুঝতে পারলাম। সভাপতি শেঠ দাউদ মহম্মদ টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের বোঝাতে লাগলেন। আমাকে যাঁরা বাঁচাতে চান, তাঁরা আমাকে ঘিরে ধরলেন। আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই আমি করি নি। কিন্তু আক্রমণ হবে ব'লে যাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের পকেটে পিস্তল ছিল। তিনি ফাঁকা আওয়াজ করলেন। ইতিমধ্যে পার্শী রুস্তমজী হাঙ্গামার আভাস পেয়ে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডারকে খবর দিয়েছিলেন। পুলিশ এসে গেলো। গণ্ডগোলের মাঝ দিয়ে পথ ক'রে পুলিশ আমায় ঘিরে রুস্তমজীর বাড়ি পৌঁছে দিল।"

পরদিন পুনরায় গান্ধীজী পাঠানদের বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু গান্ধীজীর কথায় তারা কর্ণপাত করলো না। গান্ধীজী ফিনিক্সে ফিরে গেলেন। কিন্তু আক্রমণের আশঙ্কা গেলো না। ফিনিক্সে গান্ধীজীকে তাঁর বন্ধুরা পাহারা দিতে লাগলেন। গান্ধীজী বলেন, "যদিও এই দলের (পাহারায় রত শিষ্য বন্ধুদের) সঙ্গে ভারবানে তামাসা করেছি, আমার সঙ্গে তাঁদের আসতে মানা করেছি, তবু এ দুর্বলতা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, যখন তাঁরা পাহারা দিচ্ছিলেন, তখন আমার মন অধিকতর নির্ভয় ছিল। একথা-ও মনে হয়েছিল, যদি এঁরা সঙ্গে না থাকতেন, তবে কি সত্যই আমি এতোখানি নির্ভয় হ'তে পারতাম?"

আগে বলেছি, আবার বলছি, অহিংস আন্দোলন কেবল তখনই সম্ভব, যখন মানুষের কতকগুলি নাগরিক অধিকারকে আইনত স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় এবং রাষ্ট্র সেই অধিকার রক্ষার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। এই জন্যেই দেখা যায়, সত্যাগ্রহী আন্দোলন কোনো না কোনো শক্তিশালী সরকার-শাসিত অঞ্চলেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অহিংস সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর জীবনরক্ষার জন্যে কি নাতালে, কি ট্রান্সভালে, কি ভারতবর্ষে সর্বত্র পুলিশ ও সরকার যে বারে বারে ব্যবস্থা অবলম্বন

---

১ সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী যিশু বলেন:

"He that loveth his life shall lose it and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal." (John xii. 25)

করেছে, তা লক্ষণীয়। ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে যখন ভারতের শাসনভার এলো, যখন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন-ব্যবস্থার সে দৃঢ়তা আর রইলো না, তখনই দিল্লীতে ভারতীয় বুর্জোয়া সরকারের অসতর্ক অকর্মণ্যতায় সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর ঘটলো মৃত্যু। নাতালে, ট্রান্সভালে, এমন কি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বিক্ষুব্ধ নোয়াখালিতে বৃটিশ সরকার যা পেরেছিল, নেহরু-পরিচালিত দেশীয় সরকার দিল্লীতে তা করতে সমর্থ হোলো না। দুর্বল রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অহিংস আন্দোলনের যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি তা যে সম্ভব-ও নয়, এ তার চূড়ান্ত প্রমাণ।

যাই হোক, স্মাট্‌স্ কিন্তু সত্যাগ্রহী ছিলেন না। তাই ভারতীয়রা যখন স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়ে পাস নিয়ে গেলো, তখন তিনি এশিয়াটিক আইন বাতিল করা তো দূরের কথা, ভারতীয় দমনের জন্যে নূতন আইনের খসড়া করলেন। তাই আবার আন্দোলনের প্রয়োজন হোলো। গান্ধীজী বোঝালেন: শত্রুকে সুযোগ দেওয়াই সত্যাগ্রহীর ধর্ম। "যারা সই দিয়ে টাকা নেয়, তাদের নামেও আদালতে মামলা করতে হয়। তারা মামলার বিরুদ্ধতা করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অবশেষে ডিক্রি হয়, মাল ক্রোক হয়, অনেকখানি সময় নষ্ট হয়, কিন্তু সেজন্যে কি সতর্কতা অবলম্বন করা যায় বলুন?"

গান্ধীজী জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে পত্র দিয়ে জানালেন যে, স্মাট্‌স্ অন্যায়ভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। অ্যালবার্ট কার্টরাইট, যিনি মীমাংসার মধ্যস্থতা করেছিলেন, তিনিও লজ্জিত হলেন। অবশেষে স্থির হোলো, সরকার যদি তাঁদের প্রতিশ্রুতি মতো এশিয়াটিক আইন রদ না করেন, তবে গৃহীত পাসগুলি পুড়িয়ে ফেলা হবে। কিন্তু সরকার পক্ষ নীরব রইলেন; এশিয়াটিক আইন রদ তো করলেনই না, বরং দ্বিতীয় আইনটিও পাস হয়ে গেলো। ফলে একদিন সভা ক'রে সমারোহের সঙ্গে ভারতীয়রা তাঁদের গৃহীত পাসগুলি পুড়িয়ে ফেললেন। আবার সংগ্রাম ঘোষিত হোলো।

আইনসভার যে অধিবেশনে দুই নম্বর এশিয়াটিক আইন পাস হয়, সেই অধিবেশনেই ভারতীয়-দলনের জন্যে জেনারেল স্মাট্‌স্ আর একটা নূতন আইনের খসড়া পেশ করলেন, 'ইমিগ্রেসন রেষ্ট্রিক্‌শন্ এ্যাক্ট'। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করা। এশিয়াটিক আইনের গণ্ডি এড়িয়ে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অধিকারে ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে পারতেন, এই আইনের বলে তাঁদের প্রবেশাধিকারও লোপ পেলো। তাই গান্ধীজী স্থির করলেন, এই আইনের বিরুদ্ধেও সত্যাগ্রহ করা হবে। এই আইন ভঙ্গের জন্যে প্রয়োজন ছিল এমন একজন

লোকের, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ পূর্বে ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন নি। এই উদ্দেশ্যে সোরাবজী শাপুরজী আড়জনিয়াকেই সত্যাগ্রহ কমিটি যোগ্য সত্যাগ্রহী রূপে গ্রহণ করলেন।

ট্রান্সভাল সরকারকে পূর্বাহ্নে নোটিশ দিয়ে সোরাবজী ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ট্রান্সভাল সরকার প্রথমে সোরাবজীকে গ্রেফ্‌তার করলো না। পরে তাঁর উপর আদালতে হাজির হবার হুকুম এলো। বিচারে সোরাবজীর কোনো শাস্তি হোলো না, তাঁকে কেবল এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রান্সভাল ত্যাগ ক'রে যেতে বলা হোলো। সোরাবজী সে-আদেশ অমান্য করলেন। ফলে তাঁর এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হোলো।

এশিয়াটিক আইন ভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে ভারতীয়রা যে গৃহীত পাসগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেজন্যে সরকার কাউকে গ্রেফ্‌তার করলো না। কারণ, প্রথমত এত অধিকসংখ্যক কয়েদী রাখবার ব্যাপারটা সরকারের পক্ষে ছিল ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয়রা পাস পুড়িয়ে ফেললেও সরকারী খাতায় তাদের নাম ছিল। সুতরাং এখন নূতন ভারতীয়ের প্রবেশ রোধ করতে পারলেই সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

পাসগুলি নষ্ট করায় সরকার যখন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করলো না, তখন স্থির হোলো ভারতীয়রা অন্য উপায়ে সরকারকে আক্রমণ করবে। এবার, দু রকমের ভারতীয়কে নাতাল থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানোর সিদ্ধান্ত স্থির হোলো—পূর্ব থেকে যাদের ট্রান্সভালে বসবাসের অধিকার আছে, আর যাঁরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারেন।

এই নূতন সত্যাগ্রহীর দল যখন নাতাল থেকে ট্রান্সভাল সীমান্তে পৌঁছলো, তখন ট্রান্সভাল সরকার বেশ প্রস্তুত ছিল। সত্যাগ্রহীদের বন্দী করা হোলো। সত্যাগ্রহ ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করলো। ভারতীয়রা কেউ বিনা লাইসেন্সে ফেরি ক'রে, কেউ বা বিনা পাসে ট্রান্সভালে প্রবেশ ক'রে, দলে দলে গ্রেফ্‌তার হ'তে লাগলো। জেল ভ'রে উঠলো।

গান্ধীজীও আবার গ্রেফ্‌তার হলেন। প্রিটোরিয়া জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হোলো।

জেলে তিলধারণের ঠাঁই রইলো না। সরকার বিপদে পড়লো। যাঁদের গ্রেফ্‌তার ক'রে ট্রান্সভালের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসা হোলো, তাঁরা আবার ফিরে এলেন। এবার স্থির হোলো, ভারতীয়দের দলে দলে গ্রেফ্‌তার ক'রে জাহাজে ভ'রে ভারতবর্ষে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। বন্দীদের মধ্যে এমন অনেক ভারতীয় ছিলেন, যাঁরা

জীবনে কখনো ভারতবর্ষ দেখেন নি বা ভারতে যাঁদের পরিচিত আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুক্ত গিরমিটিয়াদের বংশধর। সুতরাং এঁদের পক্ষে ভারতবর্ষে নির্বাসন ছিল অনাহারে ও অনাশ্রয়ে প্রাণদণ্ডেরই নামান্তর। ট্রান্সভাল সরকারের এই নৃশংস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষেও তুমুল আন্দোলন শুরু হোলো। অন্যপক্ষে, ট্রান্সভাল সরকারের এই জুলুম সত্যাগ্রহীদের উপর যে কোনো প্রভাব বিস্তার করলো না, তা নয়। গান্ধীজীর স্বীকারোক্তি: "নির্বাসনের দ্বারা সরকারেরই অপমান বাড়িতেছিল। এ বিষয়ে কতকগুলি মামলায় সরকার হারিয়াছিলেন। এদিকে ভারতীয়রাও আর ভালো রকম লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আগেকার মতো সত্যাগ্রহীর সংখ্যা-ও বেশি ছিল না। কতক সত্যাগ্রহী ভয় পাইয়াছিল, কতক বা হার মানিয়াছিল।"

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা দিলো। ট্রান্সভাল, নাতাল, কেপ কলোনি ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট একত্রিত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলো। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ধনিকদের অধিকার তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী রূপেই মূলত দাবী করছিলেন। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে যাওয়াকে তিনি সমর্থনের চোখে দেখলেন না। ভারতবর্ষে-ও তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল, তা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকে কিছু কিছু দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলন। সুতরাং বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হলেন। এই প্রতিনিধিদলের প্রার্থনা ছিল বৃটিশ সরকার যদি দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাম্রাজ্য থেকে বাইরে যেতে দেন, তবে তাঁরা যেন ভারতীয়দের জন্যে কোনো সুবন্দোবস্ত করেন। গান্ধীজীই এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন।

বৃটিশ সরকারের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাদের দাবী কতক পরিমাণে পেলো সত্য, কিন্তু ভারতীয়দের অবস্থা রইলো যথাপূর্ব, বরং পূর্বাপেক্ষা মন্দ। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাবার জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া ভারতীয়দের কোনো গত্যন্তর ছিল না। প্রস্তুতির বিষয় সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন: "টাকার জন্যে আমার ভাবনা ছিল। দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাবার উপযুক্ত অর্থ আমার কাছে নেই, এই দুঃখ আমাকে বিষম ব্যথিত করছিল। কিন্তু টাকা শীঘ্রই এসে পড়লো। স্যার রতন টাটা পঁচিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন।" এই টাকা দিয়ে গান্ধীজী এমন একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করতে চাইলেন, যাতে সেখান থেকে দীর্ঘকাল ধ'রে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালানো যেতে

পারে, শত শত অহিংস সত্যাগ্রহী সৈনিকের বাসস্থান ও আহারের অভাব না ঘটে। ফিনিক্সের কৃষিক্ষেত্র ছিল নাতালে। কিন্তু সত্যাগ্রহ চলছিল ট্রান্সভালে। জোহানেস্‌বার্গের কাছাকাছি কোথাও একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের কথা স্থির হোলো। সেখানে গান্ধীজীর বন্ধু তথা শিষ্য মিঃ কালেন্‌বাখের তিন হাজার তিন শ বিঘা জমি কেনা ছিল। সেই জমি তিনি সত্যাগ্রহীদের ব্যবহারের জন্যে দিলেন। এইভাবে জোহানেস্‌বার্গ থেকে একুশ মাইল দূরে নূতন একটি কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠলো। গান্ধীজী তার নাম দিলেন 'টলস্টয় ফার্ম'। টলস্টয় ফার্মকে গান্ধীজীর অহিংস যুদ্ধের কেল্লা বলা যেতে পারে। বহু সত্যাগ্রহী সপরিবারে এখানে এসে আশ্রয় নিলেন। বছরের পর বছর ধ'রে এখান থেকে অহিংস যুদ্ধের রসদ-সরবরাহ এবং আক্রমণ চলতে লাগলো। এ বিষয়ে গান্ধীজীর অহিংস যুদ্ধের প্রথম কেল্লা ফিনিক্স-ও অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। ইতিপূর্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষে ভারতবর্ষে বহু আলোচনা ও আন্দোলন করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গেও তাঁর আলাপ-আলোচনা হোলো। আলাপ-আলোচনার ফল সম্পর্কে তিনি গান্ধীজীকে বললেন, "সব মীমাংসা হয়ে গেছে। এশিয়াটিক আইন রদ হবে। এমিগ্রেসন আইন থেকে সাদা-কালোর বিচার উঠে যাবে। তিন পাউণ্ড করও দিতে হবে না।"

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এবারেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। ফলে তিন পাউণ্ড কর রহিতের দাবীকে সত্যাগ্রহের অঙ্গীভূত করা হোলো।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারও ওদিকে ক্ষান্ত ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যাতে বংশানুক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধনসম্পত্তি ভোগ করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারতীয়দের বিবাহকেও অবৈধ ঘোষণা করলো। এইভাবে তিন পাউণ্ড কর এবং বিবাহের বৈধতার প্রশ্ন ভারতীয় আন্দোলনকে এমন একটি ব্যাপক রূপ দিলো, যার ফলে ভারতীয় সর্বসাধারণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণের জন্যে উৎসাহিত হোলো।

গান্ধীজী এবার তাঁর রণক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। ইতিপূর্বে নাতাল থেকে সত্যাগ্রহীরা ট্রান্সভালে প্রবেশ ক'রে এমিগ্রেশন আইন ভঙ্গ করেছিলেন। তখন যুদ্ধ ছিল কেবল ট্রান্সভাল সরকারের বিরুদ্ধে। এখন দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গঠিত হওয়ায় সে যুদ্ধের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলো। ফলে এমিগ্রেশন আইন ভঙ্গের জন্যে ট্রান্সভাল থেকেও সত্যাগ্রহীরা নাতালের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। প্রথম সত্যাগ্রহী

দলটি কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। গান্ধীজী এঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এঁরা প্রথমে সীমান্ত অতিক্রম ক'রে নাতালে প্রবেশ করবেন। নাতালে সম্ভবত পুলিশ ওঁদের গ্রেফ্তার করবে। যদি না করে, তবে ওঁরা সটান নিউক্যাশ্‌লে কয়লার খনি অঞ্চলে চলে যাবেন এবং সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্যে শ্রমিকদের উত্তেজিত করবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এইটি হোলো স্বর্ণ মুহূর্ত। সত্যাগ্রহী মহিলারা নাতাল সীমান্তে গ্রেফ্তার হলেন না, তাঁরা সটান চ'লে গেলেন নিউক্যাশ্‌লে, খনি-অঞ্চলে। সমগ্র খনিতে বিদ্যুৎ-গতিতে সত্যাগ্রহ ছড়িয়ে পড়লো। হাজারে হাজারে ভারতীয় শ্রমিক ঘোষণা করলো হরতাল।[১] ধর্মঘটী শ্রমিকদের স্রোত অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠলো।

গান্ধীজী-ও অবিলম্বে নিউক্যাশ্‌লে উপস্থিত হলেন। মনে হোলো, গান্ধীজী যেন নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ এক বিপুল শক্তিশালী অস্ত্রাগারের সন্ধান পেয়েছেন। মহিলা সত্যাগ্রহীরা গ্রেফ্তার হলেন। তাঁদের শৌর্য ও সহিষ্ণুতার কাহিনী ভারতেও আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

এখন দেখা দিলো এক নূতন সমস্যা। এই সহস্র সহস্র কর্মত্যাগী শ্রমিককে কেমন ক'রে আহার ও আশ্রয় দেওয়া যায়, গান্ধীজী তা-ই ভাবতে লাগলেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সাহায্য করছেন সত্য, কিন্তু তাতে ক'দিন চলবে? গান্ধীজী স্থির করলেন, এই বিপুল জনতা নিয়ে তিনি ট্রান্সভালে প্রবেশ করবেন, তাতে একদিকে সরকারের এমিগ্রেশন আইন যেমন চূড়ান্তভাবে ভঙ্গ করা হবে, তেমনি অন্যদিকে সরকার যদি শ্রমিকদের গ্রেফ্তার করে, তবে জেলেই তাদের আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হ'তে পারবে। গান্ধীজী আগাগোড়া বাক্যত force of number-এ অবিশ্বাসী হ'লে-ও, গোড়ার দিকে কার্যত যে তিনি তাতে বিশ্বাসী ছিলেন, তার প্রমাণ এখানেও মেলে। এই সময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "অনেক লোক এক সঙ্গে গেলে যে-কাজ হয়, অল্প লোক গেলে সে-কাজ হয়-ও না।"

সত্যাগ্রহ শিবিরে ঐ সময় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক সমবেত হয়েছিল। ওখান থেকে ট্রান্সভালের সীমান্ত ছিল ছত্রিশ মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ দু দিনে পায়ে হেঁটে

---

১ এই সত্যাগ্রহ সম্পর্কে রেভারেণ্ড হোম্‌স্ বলেন:

"It was in essence, I suppose, a strike—a withdrawal of the Indians from labour in the towns and villages, and a paralysis, therefore, of the industrial and social life of the Republic."

সত্যাগ্রহের আত্মিক শক্তি সম্পর্কে গান্ধীজী যাই বলুন, তার সত্যিকার শক্তি যে শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যেই নিহিত ছিল, তা রেভারেণ্ড হোম্‌সের মতো একজন গান্ধীবাদীকেও স্বীকার করতে হয়েছে।

যাবার সিদ্ধান্ত হোলো। ইতিমধ্যে খনির মালিকদের সঙ্গে গান্ধীজীর কিছু আলাপ-আলোচনা-ও হোলো। কিন্তু তাতে কোনো ফল হোলো না।

অতঃপর শুরু হোলো আইন অমান্যের এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধ শ্রমিকের পুরোভাগে চলেছেন অহিংস যুদ্ধের সেনানায়ক গান্ধীজী। অপূর্ব সে দৃশ্য! পরবর্তীকালে গুটি কয়েক গান্ধীবাদীর পুরোভাগে তিনি যে ডাণ্ডী অভিযান করেছিলেন, সে দৃশ্যকে এর পাশে কী বিবর্ণ-ই না লাগে!

শোভাযাত্রীর দল অগ্রসর হ'তে লাগলো। পথে গান্ধীজী পর পর দুবার গ্রেফ্‌তার হলেন এবং জামিনে খালাস পেলেন। সরকার চাচ্ছিল, গান্ধীজীর অবর্তমানে শোভাযাত্রীর দল অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ুক, তখন তাদের উপর অত্যাচারের সুযোগ মিলবে। কিন্তু সে-সুযোগ মিললো না। হাজার হাজার শ্রমিক শান্তভাবেই অগ্রসর হ'তে লাগলো।

আবার গ্রেফ্‌তার হলেন গান্ধীজী। এবার মিঃ পোলক শোভাযাত্রীদের নিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। হেড্‌লবার্গে শ্রমিকদের গ্রেফ্‌তারের জন্যে দুখানা ট্রেন অপেক্ষা করছিল। শ্রমিকদের গ্রেফ্‌তার শুরু হোলো।

অবশেষে মিঃ পোলক, মিঃ কালেন্‌বাখ এবং মিঃ ওয়েস্ট, একে একে সবাই গ্রেফ্‌তার হলেন। বিচারে গান্ধীজীর হোলো ন মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতেও আন্দোলন থামলো না। গান্ধীজী বলেন: "সরকারের সমস্ত ব্যবস্থাই বিফল হইল। সারা আকাশ যদি ভাঙিয়া পড়ে, তবে আর তাহাতে জোড়া-তাড়া দেওয়ার ঠাঁই থাকে কোথায়? নাতালের ভারতীয় গিরমিটিয়ারা সবাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের প্রতিরোধ করে, এমন সাধ্য কাহার?"

কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমিক ও জনসাধারণের এই প্রচণ্ড শক্তির প্রতি কী ঘোর অবিশ্বাসই না তাঁর জন্মেছিল! ভারতীয় কৃষাণ ও শ্রমিকরা যখন আর বুর্জোয়াদের জন্যে লড়তে চাইলো না, তারা নিজেরা সংগঠিত হয়ে নিজেদের লড়াই লড়তে প্রস্তুত হোলো, তখন তিনি তাদের এড়িয়ে চললেন, তাঁর যুদ্ধের ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণতর হোলো,—এক হাস্যকর পরিণতি লাভ করলো ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মধ্যে।

কিন্তু সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরে হাজার হাজার শ্রমিক মূলত ধনিকদের লড়াই-ই লড়ছিল। তাই শ্রমিকদের শক্তিতে ও সংখ্যায় গান্ধীজীর ছিল অটল বিশ্বাস, নির্ভয় নির্ভর।

যাই হোক, শ্রমিকদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু হোলো। বন্দী শ্রমিকদের

বিচারে হয়েছিল সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু তাদের কারাগারে পাঠানো হোলো না. বন্দী হিসাবে পরিশ্রমের জন্যে পাঠানো হোলো খনিতে। তারা যেন সেই মধ্যযুগের 'গ্যালি স্লেভ'! কেবল তারা বন্দী নয়, ক্রীতদাস! শ্রমিকদের উপর এই নির্যাতনের ফল কিন্তু ভালো হোলো না। অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা ছিল না, সেখানে-ও সংঘবদ্ধভাবে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটলো। এবার আতঙ্কগ্রস্ত সরকার বন্দুক ব্যবহার করতে লাগলো।

ভারতীয় শ্রমিকের উপর এইভাবে দীর্ঘকাল একটানা অত্যাচার করা কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, ইউরোপীয় শ্রমিকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। তাই ভারতীয়দের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার সংকেত হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করতে চাইলো। এই কমিশনকে ভারতীয়রা প্রথমে বর্জন করলে-ও পরে স্বীকার ক'রে নিলেন। আসলে, শ্বেত শ্রমিকদের জাগরণ ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষেও খুব প্রীতিকর ছিল না।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় রেল ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। এই ধর্মঘট সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন: "এই ধর্মঘট এমন ভীষণ হইয়াছিল যে, ইউনিয়ন সরকারকে দেশে সামরিক আইন জারী করতে হইয়াছিল। রেল কর্মচারীরা যে কেবল বেতন-বৃদ্ধি চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে, রাজ্যের উপর সর্বময় প্রভুত্বের অধিকার-ও তাঁহারা চাহিয়াছিলেন।" সরকারের উপর এই রেল ধর্মঘটের প্রভাব কী পরিমাণ হয়েছিল, সে বর্ণনা-ও গান্ধীজী করেন: "আমি যখন সত্যাগ্রহীদের লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার (জেনারেল স্মাট্‌সের) যে-দম্ভ দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আর ছিল না।"

সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ-সাধনের জন্যে সত্বর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারতীয় সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের সঙ্গে যে কোনো শর্তে সন্ধি করতে চাইলো। তিন পাউণ্ড কর রহিত হোলো; ভারতীয় বিবাহ একপত্নীক হ'লে বৈধ ব'লে গণ্য হোলো; পাস সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনেক পরিমাণে শিথিল করা হোলো। এমনি ভাবে আপাত-দৃষ্টিতে অহিংস সত্যাগ্রহের জয় হ'লে-ও বস্তুত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এক মর্মান্তিক বিভেদের মূল্যেই সেদিন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় ধনিকরা তাদের প্রাপ্য লাভ করলো—যে মূল্যের কঠিন ঋণ তারা আজো দক্ষিণ আফ্রিকায় শোধ করছে। 'অর্থাৎ, খনি ও রেল শ্রমিকদের যুগ্ম জাগরণ না ঘটলে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ যে বিন্দুমাত্র সফল হোতো না, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেদিন আফ্রিকাস্থ শ্বেত ও কৃষ্ণ বুর্জোয়াদের মধ্যে যে কৃত মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল,

তা সত্যাগ্রহের বিজয়ী শক্তির ফলে হয় নি, হয়েছিল মিলিত শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের আতঙ্কে। কিন্তু সত্য-সন্ধানী হওয়া সত্বে-ও এই সহজ সত্য গান্ধীজীর চোখ এড়িয়ে গেলো। তিনি অবিলম্বে বিজয়-উল্লাসে বিলাতের পথে ভারতে রওনা হলেন। ভাবলেন, তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ-ই তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সুযোগ সুবিধা লাভের সংগ্রামে সাফল্য দিয়েছে।

॥ এগারো ॥

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করলেন। সুতরাং ঐ সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল, বা তার ইতিহাসের ধারার স্বরূপ কী, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। নইলে সেখানে গান্ধীজীর ভূমিকাটিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙন দেখা দিলো। কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার ইউরোপের মতোই এবার ভারতবর্ষেও ধীরে ধীরে একটি নাগরিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বা বুর্জোয়া সমাজের অঙ্কুরোদ্গম হোলো।[১] ফলে, ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীব্যাপী সুকঠিন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের খোসাতে ফাটল দেখা দিলো। সামাজিক বনিয়াদে এই অর্থনৈতিক ফাটলের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের আকাশস্পর্শী শাসনের সৌধটা যেমন ভেঙে পড়লো তেমনি ভারতব্যাপী সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শুরু হোলো ঠোকাঠুকি, গুঁতোগুঁতি—দেশময় আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় গোলযোগ, আত্মকলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব। ঐ সময়কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাকে ইংলণ্ডের War of Roses বা জার্মানির ত্রিশ-বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে অনেক দিক থেকে তুলনা করা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে যখন এমনিভাবে একটি দেশীয় বুর্জোয়া সমাজ স্বাভাবিক ভাবে গ'ড়ে উঠতে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে ভারতে অপেক্ষাকৃত পরিণত ইউরোপীয়—পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ—বুর্জোয়াদের ঘটলো প্রবেশ। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভাঙন ধরবার ফলে ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানেরই কথা ছিল। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমান না হওয়ায়, এবং ইউরোপে পুঁজির জন্ম ভারতীয় পুঁজির কয়েক শতাব্দী পূর্বে হওয়ায়, ভগ্নপ্রায় ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অবয়বের ছিদ্রপথে ভারতীয় নবজাত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের স্থলে ইউরোপীয় বুর্জোয়ারাই মাথা তুলে দাঁড়ালো। এইভাবে ভারতবর্ষে ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বাভাবিক অভ্যুত্থান সম্ভব হোলো না।

---

১ মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় ভারতীয় নাগরিক জীবন যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল, ইউরোপে বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পূর্বে যেমনটি দেখা যায়। লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুর্শিদাবাদ শহরের বর্ণনা করেন: "As extensive, populous and rich as the city of London."

ভারতবর্ষে ইউরোপের যে সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্র আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক অগ্রগতির দিক থেকে বৃটেনই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। সুতরাং ভারতীয় শিশু বুর্জোয়ার স্থান বৃটেনের তরুণ বুর্জোয়ারাই অধিকার ক'রে নিলো এবং ভারতের দেশীয় শিশু বুর্জোয়া সমাজের তারা করলো কণ্ঠরোধ ও হত্যা। আরো প্রায় শতাব্দীকাল বাদে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই ঔরসে ভারতে গ'ড়ে উঠলো এক নবতর জারজ বুর্জোয়া সমাজ—যার নির্বীর্য জড়ত্ব আমাদের চমকিত ও উদ্‌বিগ্ন করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বৃটিশরা বাংলাদেশ অধিকার করলো, পত্তন করলো এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন সর্বপ্রথম ভারতে এসেছিল, তখন তারা মূলত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এসেছিল, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারেব কল্পনাও তারা করে নি। বৃটেনে উৎপন্ন মালের বাজার হিসাবেও সেদিন তারা ভারতবর্ষে আসে নি, তারা ভারতবর্ষে এসেছিল ভারতীয় মালের জন্যে, যে-মাল তারা ভারতে সস্তায় কিনে ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করতে পারবে এবং এইভাবেই একটা মোটা মুনাফা তাদের কুক্ষিগত হবে। তাই আমরা দেখি. প্রথম যুগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিল্পের অধঃপতন নয়—ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পদ্রব্য স্বল্প দামে বা বিনা দামে কেনা। কিন্তু ভাবতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গিয়ে গোড়া থেকে একটা অসুবিধা বৃটিশ বণিকরা লক্ষ্য করতে লাগলো। ভারতবর্ষ থেকে মাল নিতে হ'লে তার মূল্য হিসাবে বিনিময়ে ভারতবর্ষকে কিছু বৃটিশ মাল দেওয়াও দরকার। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতবর্ষের উৎপাদন-শিল্পের অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে এসেছিল, যাতে বলা চলত, যা নেই ভারতে, তা নেই পৃথিবীতে। সুতরাং ভারতবর্ষকে কোনো বৃটিশ পণ্য দিয়ে তার বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করবার উপায় ছিল না বৃটেনের। কাজেই স্বর্ণ বা রজত মূল্য ছাড়া ভারতীয় মাল পাওয়ার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাই ঐ সময় বৃটেন থেকে বৎসরে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মতো সোনা, রূপো এবং অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা বাইরে রফ্‌তানি করবার মতো অনুমতি পেয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু বণিক পুঁজিপতিদের পক্ষে ঘর থেকে বাইরে সোনা-রূপো চালান দেওয়ার মতন মর্মান্তিক ঘটনা আর কিছুই ছিল না। কারণ, তাদের ধারণা ছিল দেশের সত্যিকার সমৃদ্ধি হোলো তার সঞ্চিত, রাশীকৃত ধাতব সম্পদ্‌। সুতরাং প্রতি বৎসর যে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য ভারতবর্ষে রফ্‌তানি হয়ে যায়, এটা তাদের কাছে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠলো। কেবলই তারা মতলব ভাঁজতে লাগলো, কেমন ক'রে ভারতীয় মাল কেনা যাবে, অথচ তার বিনিময়ে স্বর্ণ বা

রজত মূল্য দিতে হবে না। প্রথমের দিকে তারা ইংল্যাণ্ড থেকে ধাতব মুদ্রা রফ্‌তানি বন্ধ ক'রে আমেরিকা এবং আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে নির্মমভাবে লুণ্ঠন চালিয়ে ক্রীতদাস বিক্রয় ক'রে যা পেতো, তা দিয়েই ভারতীয় মালের দাম দিতো। ঠিক এই সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ভাঙন দেখা দিলো, ইংরেজরা তার সুযোগ গ্রহণ করলো পরিপূর্ণরূপে। ভারতে স্থাপন করলো সাম্রাজ্য। জলদস্যুতা ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যের অংশ বিশেষ। এবার তারা ভারতের স্থলভাগে নেমে স্থলদস্যুতা শুরু করলো। বাণিজ্যের নামে চললো লুণ্ঠন, সুবর্ণ বা রজত মূল্যের বড়ো একটা প্রশ্নই আর রইলো না। বৃটিশ পুঁজিপতিরা লাভ করলো তাদের স্বপ্ন-স্বর্গ।

এইভাবে ভারতের এই লুণ্ঠিত সম্পদ্ গিয়ে সঞ্চিত হ'তে লাগলো ইংল্যাণ্ডে এবং এই সঞ্চিত সম্পদের জোরেই ইংলণ্ডের বণিক্ পুঁজিতন্ত্র রূপান্তরিত হোলো শিল্প-পুঁজিতন্ত্রে। ভারতীয় সম্পদের স্রোত যতো প্রবলভাবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পক্ষেত্রে প্রবাহিত হ'তে লাগলো, ততোই সেখানে দ্রুত গ'ড়ে উঠলো কল-কারখানা, ঘটলো শিল্পবিপ্লব বা InJustrial Revolution. উদীয়মান বৃটিশ শিল্প-পুঁজির প্রতিফলন ঘটলো বৃটিশ বিজ্ঞানেও। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে হারগ্রীভ্‌স্ সাহেব আবিষ্কার করলেন স্পিনিং জেনা; ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে আর্করাইট সাহেব আবিষ্কার করলেন 'ওঅটার ফ্রেম'; ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে এলো তাঁর তুলো ধুনবার, সুতো কাটার কল; ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে এলো তাঁর যন্ত্র-চালিত তাঁত। সর্বোপরি, ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ব্ল্যাস্ট ফারনেসের সঙ্গে বাষ্পচালিত যন্ত্রের ঘটলা সংযোগ। এইভাবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পসম্ভাবনা এক বিপুল শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করলো। ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদের উপর ভিত্তি ক'রেই ইংল্যাণ্ডে ঘটলো শিল্প-বিপ্লব। অর্থাৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড নিজের অজ্ঞাতে, অনিচ্ছাতে, পৃথিবীর শিল্পসভ্যতাকে এক অভিনব পরিণতির পথে এগিয়ে দিলো। মার্ক্‌স্ বলেছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে তাদের অজ্ঞাতে ইতিহাসের হাতিয়ার রূপে কাজ করেছে; কারণ, তারা নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপ ভাবেই বলা চলে, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ফলে কোটি কোটি লুণ্ঠিত শোষিত ভারতবাসী তাদের অজ্ঞাতে অনিচ্ছায় পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোয়া সমাজকে এক চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে, যে-পরিণতির মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার মৃত্যু।

ইংল্যাণ্ডের কলকারখানা ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে দেখা দিলো নূতনতর সমস্যা, প্রয়োজন হোলো উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যে সুবিস্তৃত বাজারের। ফলে,

বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা চাইলো ভারতবর্ষকে বৃটিশ মাল বিক্রয়ের বাজার রূপে ব্যবহার করতে। ভারতে শুরু হোলো বৃটিশ শোষণের এক নূতনতর অধ্যায়। এ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিক্-পুঁজিপতিরা প্রধানত ভারতীয় বয়নজাত দ্রব্যকে ভারতে রফ্‌তানি ক'রে সেখানে উচ্চ মূল্যে তা বিক্রয় করতে। ফলে, বৃটিশ বণিক্-পুঁজিপতিদের সঙ্গে বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিদের ঘটলো বিরোধ। বৃটেনের শিল্প-পুঁজিপতিরা বণিক্-পুঁজিপতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত ক'রে সেখানে তাদের নিজেদের অবাধ আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলো। এখানেও নবতর বুর্জোয়া শোষকরা আবার পুরাতন প্রথা অনুসারে তুললো মানবিকতার ধুয়া। ইংল্যাণ্ডে এদের প্রতিনিধি ও প্রচারকরা তীব্র ভাষায় করতে লাগলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমালোচনা, নিন্দা। অভ্যুত্থান ঘটলো অ্যাডাম স্মিথ্, ফক্স, পিট্, বার্ক্, শেরিডান, ম্যাকলে প্রভৃতি মহাজনদের। বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে শুরু করলো প্রচার ও সংগ্রাম। ধুয়া তুললো ফ্রি ট্রেড বা অবাধ বাণিজ্য। সাধারণত, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দকেই ভারতীয় ইতিহাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার লোপের সাল ব'লে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তাদের একচেটিয়া অধিকার ক্রমেই লোপ পেতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল হিসাবে ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। তিনি বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিদের নয়া শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তক রূপেই ভারতে আসেন। এখন থেকে বৃটিশ শোষণের রূপটা এমন হয়ে ওঠে যে, যাকে শাণিত ছুরিকার সঙ্গে তুলনা করা চলে। গূঢ়তায় নৃশংস, অথচ দীপ্তিতে দৃপ্ত ও উজ্জ্বল। এই হোলো খাঁটি বুর্জোয়া কাল্‌চার। ঐ যুগের বুর্জোয়া কালচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন এডমাণ্ড বার্ক্। ভারত-হিতৈষণার জন্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও তাঁর স্তুতি করেন। (বস্তুত পক্ষে, বর্তমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপই হোলো এই!) গান্ধীজী তো তাঁর ছাত্রাবস্থায় বক্তৃতার পাঠাভ্যাস শুরু করেছিলেন পিটের বক্তৃতা দিয়েই।

এখন বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষকে যে ভাবে শোষণ করতে চাইলো, তা কার্যকরী করার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের নাগরিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া, এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা; এবং এই ভারতময় কৃষিক্ষেত্রেও যাতে শোষণকার্যটি বিনা গোলযোগে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করা যায়, তার জন্যে জমিদারী-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতবর্ষে বৃটিশ শোষণ ব্যবস্থার ঘাঁটি রূপে বহু জমিদারীর

প্রতিষ্ঠা করলেন। শাসনের সুব্যবস্থার নামে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠতে লাগলো এক বিরাট শোষণ-যন্ত্র। মুসলমানদের হাত থেকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে যাওয়ার ঐ সময় মুসলমানরা বৃটিশের প্রতি বিন্দুমাত্র সদয় ছিলেন না। বৃটিশরাও ঐ অবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সমীচীন ভাবলো না। ফলে, দেশময় যে সব জমিদারী গঠিত হোলো, সেগুলির অধিকাংশেরই অধিকারী হলেন হিন্দুরা। অবশ্য, কোনও কোনও মুসলমান যে ইংরেজের প্রসাদ-দাক্ষিণ্য লাভ করলেন না এমনো নয়। আজ ভারতীয় হিন্দুরা ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনগ্রসরতার উল্লেখ ক'রে যে গর্ব অনুভব করেন, তার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এই অবধি সহযোগিতাই যে রয়েছে, সে কথা আমাদের ভুললে চলবে না। যাই হোক, নয়া শোষণ-ব্যবস্থা অনুসারে ইংল্যাণ্ড থেকে কলে তৈয়ারী কাপড় আসতে লাগলো, আসতে লাগলো কলে কাটা সুতো। কাটুনি আর তাঁতীদের উঠলো অন্ন। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যে সুতো এলো, তার পরিমাণ পূর্বেকার চেয়ে ৫,২০০ গুণ বেশী।

ফলে ভারতের নাগরিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার ঘটলো অপমৃত্যু। মানুষ দলে দলে শহর ছেড়ে চললো গ্রামে। গ্রাম ভ'রে উঠলো, উপচে পড়লো মানুষের স্রোত। কিন্তু এতো মানুষের ঠাই হোলো না কৃষিতে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এরই নাম দিলো overpopulation. ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনকে পুনরায় গ'ড়ে তুলে গ্রামাঞ্চলের কৃষি থেকে তারা অতিরিক্ত মানুষের চাপ দূর করতে চাইলো না। ভারতের নাগরিক সভ্যতাকে ধ্বংস ক'রে তাকে কেবল দিগন্তবিসারী কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে না পারলে বাণিজ্যের নামে তাদের ভারতব্যাপী শোষণ-ব্যবস্থাকে তারা চালু রাখে কেমন ক'রে? তাই 'মানবহিতৈষী' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে যেমন একদিকে গাইতে লাগলো গ্রাম্যজীবনের মহিমা, তেমনি অন্যদিকে ভারতের দুঃখদারিদ্র্যের জন্যে দায়ী করলো ভারতের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার হিসাবে ম্যাল্থাস সাহেবের overpopulation-এর সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক তত্ত্বও ভারতে এসে হাজির। সুষ্ঠুভাবে শোষণের জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তাই তারা একদিকে যেমন ভারতবর্ষে করদ মিত্র সামন্ত রাজাদের জীইয়ে রাখছিল, তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষে আমদানি করেছিল জমিদারি-প্রথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লবের পরে যখন ইউরোপের বুর্জোয়া অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ হয়েছিল, বুর্জোয়াদের প্রতিরোধে যে

প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হ'য়েছিল, তার পুরোভাগে ছিলেন পাদরী ম্যাল্‌থাস। সুতরাং, ভারতে স্থানীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের প্রতিরোধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দেশময় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখতে চাইলো, তখন তারা অমোঘ তত্ত্বরূপে ভারতবর্ষে আমদানি করলো ম্যাল্‌থাসের বাণীকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে ভারতে স্থানীয় বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণ দমন করা সম্ভব হোলো না। ভারতে বুর্জোয়াদের জন্ম হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে—তাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়ে। ফলে ভারতীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সামন্ততান্ত্রিক প্রচারগুলিকে উদরস্থ করলো, তারা-ও আওড়াতে লাগলো সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্ব, গ্রাম্য জীবনে প্রত্যাবর্তনের কথা, জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যের মূল কারণ রূপে গ্রহণ করলো ভারতের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে। গান্ধীজীর মধ্যে এই সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক প্রচার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আশ্রয় লাভ করেছিল। তিনি একদিকে যেমন গ্রাম্যজীবনের মহিমায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভারতের অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রতিরোধক রূপে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মচর্যের। সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আফিম-খাওয়া ভারতীয় বুর্জোয়ারা তাই কেবলই ঝিমিয়েছে, তাদের মধ্য বিপ্লবী সংগ্রামী শক্তির প্রচণ্ড প্রকাশ কখনো ঘটেনি। তারা প্রতি দিনই সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক অবয়বের মধ্যে কায়ক্লেশে পুষ্ট হ'তে চেয়েছে তাই গান্ধীজীর জীবন-দর্শন, যা মূলত সাম্রাজ্যবাদী প্রচার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে গ'ড়ে উঠেছিল, তা ভারতবর্ষকে কলকারখানার পথ ত্যাগ ক'রে হস্তশিল্প এবং কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হ'তে উপদেশ দিয়েছে। তাই তাঁর এই প্রচার বৃটিশেরই সহায়ক হয়েছে, কারণ এই প্রচারের অর্থ ছিল ভারতকে বৃটিশের বাজাররূপে রক্ষা করা।

ভারতীয় জনসাধারণ শিল্পজীবন ত্যাগ ক'রে সকলে কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, ভারতে বারে বারে এলো দুর্ভিক্ষ, মহামারী। পঙ্গপালের মতো মরলো মানুষ। কিন্তু ম্যাল্‌থাসের থিওরি আর মরে না। দেশের অন্নাভাব যেমন কেবলই বাড়তে লাগলো, তেমনি ম্যাল্‌থাসের মহত্ত্বও কেবলি দৃঢ়তর হোলো। ভারতবর্ষকে কৃষি-কলোনি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে ইংরেজরা নিজেরাও ভারতবর্ষে এসে চাষ-আবাদে মন দিলো। এদের মধ্যে চা-কর এবং নীলকরদের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাদের নৃশংস অত্যাচার মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক গাঢ় কৃষ্ণ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে তথাকথিত বৃটিশ ব্যবসায় চালু রাখবার জন্যে বৃটিশরা ভারতীয়দের মধ্য থেকেই তাদের তাঁবেদার খুঁজে বার করতে লাগলো। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজদের সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিল। ভারতবর্ষের রাজত্ব যে তাদেরই ছিল এবং বৃটিশরা তা ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদেরই কাছ থেকে, এমনি একটা ধারণা তাদের মধ্যে দৃঢভাবে বদ্ধমূল ছিল। তাই ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জেহাদ চালিয়ে যেতে লাগলো, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলো সারা উত্তর ভারতব্যাপী ওয়াহাবি আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে। এই আন্দোলন বা বিদ্রোহের মধ্যে পুরাতন জীর্ণ বিগত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপক চেষ্টা চলেছিল। সুতরাং এগুলি বৃটিশ-বিরোধী হ'লেও আসলে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল।

এখানে লক্ষণীয় যে, যে-খ্রীস্টান ধর্মের শাখা রূপে একদা মহম্মদ তাঁর ইসলাম ধর্ম গ'ড়ে তুলেছিলেন, সেই খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধেই ধর্মের নামে ভারতীয় মুসলমানরা ঐ সময়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেল। ইউরোপের যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রীস্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের মূলে যেমন অর্থনীতিক স্বার্থ বর্তমান ছিল, ভারতবর্ষে-ও তেমনিটি ছিল। কেবল মুসলমানদের বেলাতেই নয়, অনুরূপ ধর্মযুদ্ধ বা ধর্মমৈত্রীর মূলে সর্বদা অর্থনৈতিক কারণই থাকে। হিন্দুদের বেলাতেও যে তার ব্যতিক্রম হয় নি, আমরা তা শীঘ্রই লক্ষ্য করবো।

ভারতীয় হিন্দুরা প্রধানত মুসলমান শাসনে দীর্ঘকাল থাকায় বৃটিশ বুর্জোয়া শাসন-ব্যবস্থাকে তারা অনেকখানি সানন্দেই গ্রহণ করলো। এ ব্যাপারটা তাদের কাছে সাময়িকভাবে প্রভু পরিবর্তনের মতো মুখরোচক হয়ে উঠলো। এইভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একদল ভারতীয় হিন্দু বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শোষণের সহায়ক রূপে দেখা দিলো। এই শোষণের অংশও তারা কিছু কিছু পেতে লাগলো। এইভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রসাদে পুষ্ট হয়ে গ'ড়ে উঠলো হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ।[১] বাংলাতেই ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের

১ এখানে হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ বলতে কিন্তু কেবল হিন্দুকেই বোঝায় না। এর মধ্যে পার্শীরা এবং সামান্যসংখ্যক মুসলমানও ছিলেন। গোড়ার দিকে মুসলমান সম্প্রদায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংস্পর্শ বর্জন করায় দেশে মূলত যে বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাতে হিন্দুরাই ছিলেন সংখ্যাপ্রধান। তাই প্রথম যুগে উদ্ভূত এই বুর্জোয়া সমাজকে হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ ব'লেই অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী কালে মুসলমানরা যখন বৃটিশের তোষণ শুরু করেছেন, তখন যে বিলম্বিত বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাকেই বলা হয়েছে মুসলমান বুর্জোয়া সমাজ। এর মধ্যে নিম্নশ্রেণীর পূর্বে বঞ্চিত তপশীল হিন্দুরাও কিছু পরিমাণে ছিলেন।

প্রস্তর-ভিত্তি প্রোথিত হয়েছিল। তাই সেদিন বাঙ্গালী হিন্দুরাই ছিলেন বৃটিশের সহযোগিতায় সর্বাগ্রগণ্য। ফলে বাংলাদেশেই প্রথমে হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠলো। খ্রীস্টান ধর্মের অন্যতম শাখা ইসলাম যখন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ভারতবর্ষে খ্রীস্টান সভ্যতাকে বিজাতীয় ব'লে বর্জন করলো, ঠিক তখনই নবজাত ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়ারা বৃটিশ বুর্জোয়াদের সহযোগী হবার পরিপূর্ণ চেষ্টায় খ্রীস্টান সভ্যতার সঙ্গে হিন্দু সভ্যতার এক অভিন্ন-সত্তার সন্ধান করতে লাগলো। তার ফলে ভারতেব হিন্দু বুর্জোয়া ও ইংল্যাণ্ডের খ্রীস্টান সাম্রাজ্যবাদীদেব মধ্যে ঘটলো ধর্ম-মৈত্রী, ধর্মীয় সহযোগিতা। এই মৈত্রী ও সহযোগিতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো রাজা রামমোহনের যুগে। বৈদিক হিন্দু এবং ভিক্টোরিয়ান খ্রীস্টান ধর্ম অভিন্ন-হৃদয় হয়ে উঠলো। এই অভিন্ন হৃদয়তার প্রকাশ রূপে জন্ম হোলো ব্রাহ্ম ধর্মেব। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হোলো ব্রাহ্ম সমাজ। হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মের এই মিলন একদা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করলো গান্ধীজীর ধর্মে—যখন খ্রীস্ট এবং গান্ধী প্রায় একাকার হয়ে গেলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, (বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং স্থানীয় বুর্জোয়া সহযোগিতা গান্ধীজীর মধ্যেই পূর্ণতম প্রকাশ লাভ কবেছিল।)

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এই সময়কার হিন্দুদের সহযোগিতা, এবং পক্ষান্তরে মুসলমানদের অসহযোগিতার ফলেই পরবর্তীকালে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বুর্জোয়া পরিণতির যে অসাম্য ঘটলো, তার ফলে (অবশ্য এই অসাম্যকে বৃটিশরা ক্রমাগত জীইয়ে রেখেছিল) একদা ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান বুর্জোয়াদের মধ্যে ঘটলো চরম বিবোধ, আত্মঘাতী কলহ, দেশঘাতী বিচ্ছেদ। অনূ্যন শতাব্দীকাল পূর্বে বর্তমান হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা সমাজের ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মধ্যে যে অসাম্যেব বীজ বপন ক'বে গিয়েছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়মিত কূটনৈতিক বারিসিঞ্চনের ফলে তা-ই একদা দিগন্তব্যাপী এক বিষ-মহীরুহে আত্মপ্রকাশ করলো। ঘটলো নৃশংস সাম্প্রদায়িক কলহ। অবশেষে একদিন ওই বিষবৃক্ষের ফল গান্ধীজিকেও গ্রহণ করতে হোলো। কারণ ভারতের সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিবাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম করুণতম কাহিনী হোলো গান্ধীজীর হত্যা!

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে কলকারখানা গ'ড়ে তোলার বিরোধিতা করলেও নিজের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্যে অতঃপর ভারতবর্ষে রেলপথ প্রবর্তন করতে বাধ্য হোলো। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে রেলপথের উপযোগিতা সম্পর্কে

ডালহাউসী বলেন : "Every increase of fecilities for trade has been attended, as we have seen, with an increased demand for articles of European produce in the most distant markets of India" তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, রেলপথ প্রবর্তনের ফলে কেবল যে ভারতের দিকে দিকে বৃটিশ মাল বিক্রীত হবে তাই নয়, বৃটেনে রপ্তানির জন্মে ভারতের সর্বত্র থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করাও হবে সম্ভব। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার জন্মে ব্যাপকভাবে ভারতের সর্বত্র রেলপথ প্রবর্তিত হোলো, বহু পথ-ঘাট খাল-নালারও হোলো ব্যবস্থা। এমনিভাবে রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির আমদানির ফলে আনুষঙ্গিক কল-কারখানাগুলিও গ'ড়ে উঠলো। প্রয়োজন হোলো ভারতীয়দের মধ্যে থেকে দলে দলে কর্মচারী সংগ্রহ করা। তাই ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার হোলো শুরু। এইভাবে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমেই পুষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো।

আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, মুসলমানরা তাদের বিগত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভারতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মানসে বৃটিশের সঙ্গে অসহযোগিতা এবং অনেকক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছিলেন। তাই ইংরেজরাও মুসলমান সম্প্রদায়কে সংশয় এবং অপ্রীতির চোখে দেখতো, সিপাহীবিদ্রোহের পর তা কানায় কানায় পূর্ণ হোলো। অন্যপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে নবজাত হিন্দু বুর্জোয়ারা তাদের সহযোগ ও সমর্থন চালিয়ে গেলো পূর্ণোদ্যমে। এইভাবে বৃটেনের পক্ষপাতিত্ব এবং ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি ভিন্নতর মনোভাব পোষণের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি বিভেদ ক্রমেই গভীরতর হয়ে উঠতে লাগলো। হিন্দুদের মধ্যে যখন 'আলোকপ্রাপ্ত' মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুবিস্তৃত হয়ে উঠলো, তখন মুসলমানরা রইলো নিরক্ষর, ইংরেজী-শিক্ষা বিবর্জিত।

ভারতবর্ষ কিন্তু দীর্ঘকাল বৃটিশ মাল বিক্রয়ের বাজার রূপেই কেবল রইলো না। পুঁজির ধর্ম সস্তায় শ্রমিক খোঁজা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবার ভারতবর্ষের শ্রমিক শক্তিকেও শোষণের জন্মে ব্যবহার করতে লাগলো। ভারতবর্ষে শুরু হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের "ফাইন্যান্স কপিট্যালের" যুগ। কিন্তু পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়ম অনুসারে পুঁজির প্রসার যে ভাবে হয়, এখানে সে ভাবে হোলো না। বৃটেন থেকে কোনো পুঁজিই এলো না ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত লুণ্ঠিত অর্থই ভারতবর্ষের বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ'ড়ে তুললো। আবার ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত সংগৃহীত অর্থকেই ভারতবর্ষের নামে ঋণ হিসাবে লিখে

দেওয়াও হোলো। এইভাবে ভারতবর্ষে বৃটিশ শোষণের ধারা ক্রমেই রূপান্তরিত হ'তে লাগলো।*

এতোদিন পর্যন্ত বৃটিশের শোষণকার্যে সহায়তা ক'রে হিন্দু বুর্জোয়ারা দিনে দিনে ক্রমেই পুষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু এবার মুসলমান সম্প্রদায়ও তাদের বর্জন ও অসহযোগের নীতি পরিত্যাগ ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহচর্যে বুর্জোয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে চাইলো। বৃটিশের তোষণে তারাও এবার হ'য়ে উঠলো শতমুখ। এ ব্যাপারে তাদের নেতৃত্ব করলেন স্যার সৈয়দ আহ্মদ খান। এদিক থেকে স্যার সৈয়দকে মুসলিম রামমোহন বলা চলে। রামমোহনের যুগে নবজাত হিন্দু বুর্জোয়ারা যেমন খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের একান্ত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিল, তেমনি এখন নবজাত মুসলমান বুর্জোয়ারা-ও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টান ধর্মের সাদৃশ্য আবিষ্কার (!) করলো। মহম্মদের জীবন ও বাণীকে স্যার সৈয়দ এমন-ভাবে প্রচার করতে লাগলেন যে, ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের পক্ষে ধর্মের দিক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলনের আর কোনো অন্তরায়ই রইলো না। ইউরোপে বা আমেরিকায় [১] বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের কালে খ্রীস্টের জীবনকে যেভাবে rational ক'রে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, ভারতীয়, মুসলমান বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের কালেও মহম্মদের জীবনকে তেমনি rational বা যুক্তিসংগত ক'রে স্যার সৈয়দ চিত্রিত করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ মনীষীদের মতোই তিনি অতিপ্রকৃতকে ত্যাগ ক'রে "প্রকৃতকে" (natural) নিয়েই তাঁর ধর্মের আলোচনাগুলি চালাতে লাগলেন। এজন্যে কেউ কেউ তাঁকে ব্যাঙ্গার্থক আখ্যাও দিলো 'নেচারী' ব'লে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশীয় পুঁজিবাদীদের সম্মিলিত শোষণের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা ক্রমেই দুঃসহ শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হোলো ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়। ঠিক ঐ সময়েই আবার ভারতীয় অসংখ্য মানুষের দুঃখবেদনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই যেন মহাসমারোহে বহু অর্থব্যয়ে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হোলো মহারানী ভিক্টোরিয়ার দরবার। এই অত্যাচারে

*. ভারতবর্ষ 'স্বাধীন' হওয়ার পরেও বৃটিশ শোষণের এই ধারাই ভারতবর্ষে বর্তমান রয়েছে। এবং সেই ধারার তল্পধারক হয়েছেন ভারতীয় বুর্জোয়ারা। তাই বৃটিশ শোষণটা আজ ভারতবর্ষে কতকটা হিন্দু পরম ব্রহ্মের রূপ ধারণ করেছে, সর্বব্যাপী, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অনধিগম্য।

১. আমেরিকায় এঁদের অগ্রণী ছিলেন নাগরিক টমাস পেইন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার চালাতে থাকেন। তিনিই **'United States of America'** এই শব্দগুচ্ছটির রচয়িতা।

ও অপমানে দেশব্যাপী আক্রোশ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। অত্যাচারের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে ষড়যন্ত্র এবং হিংসাত্মক প্রস্তুতির প্রচুর সংবাদও সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের হাতে এলো। ফলে এক দিকে পাছে স্থানীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ভারতীয় জনসাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসে, বিদেশী শাসকরা যেমন এই ভয় পেতে লাগলো, তেমনি অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী স্থানীয় জমিদার-বণিকরাও ভয় পেতে লাগলো, জনসাধারণের বিস্ফুরিত আক্রোশ তাদের উপরে গিয়েও হয়তো বা পড়ে। বৃটিশ সরকার প্রথমে একদিকে দেশের জনসাধারণকে এবং অন্যদিকে ভারতীয় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের দমন করতে চাইলো। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্যে পাস হোলো ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট্। জনসাধারণকে নিরস্ত্র করবার জন্যে তারা অবিলম্বে অস্ত্র আইন-ও পাস করলো। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাতেই নিরস্ত হোলো না, দমন-নীতির সঙ্গে কূটনীতিরও ঘটালো সংযোগ। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হাত মেলাতে-ও চাইলো। এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। এইভাবে ভারতের প্রধূমিত গণবিক্ষোভকে শান্ত দমিত করবার উদ্দেশ্যেই ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হোলো প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এ. ও. হিউমের জীবনীকার সার উইলিয়ম ওএডারবার্ন বলেন: "Towards the close of Lord Lytton's viceroyalty, that is, about 1878 and 1879, Mr. Hume became convinced that some definite action was called for to counteract the growing unrest." দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং গোপন ষড়যন্ত্রের বহু সংবাদ সরকারী সূত্রে মিস্টার হিউম পেয়েছিলেন। মিঃ হিউমের কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন সংক্ষেপে বলেন: "Many of the entries reported conversations between men of the lowest classes, all going to show that these poor men were pervaded with a sense of the hoplessness of the existing state of affairs, that they were convinced that they would starve and die, and they wanted to do something. They were to do something, and stand by each other and that something meant violence."

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ঐ সময় ভারতে এক চূড়ান্ত বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছিল, সে কথাও হিউম স্বীকার করেন: "I could not then and do not now,

entertain a shadow of doubt that we were then truly in extreme danger of a most terrible revolution."

এই আসন্ন গণ-বিপ্লবের ভয়েই আতঙ্কগ্রস্ত মিঃ হিউম তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাখবার জন্যে তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পেছনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কী অভিসন্ধি ছিল, তা ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে লর্ড ডাফরিন-প্রদত্ত বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায়:

"Amongst the natives I have met there are a considerable number who are both able and sublime and upon whose loyal co-operation one could undoubtedly rely. The fact of their supporting the government would popularise many of its acts which now have the appearance of being driven through the legislature by force and if they in their turn had a native party behind them, the government of India would cease to stand up, as it does now, an isolated rock in the middle of a tempestuous sea, around whose base the breakers dash themselves simultaneously from all the four quarters of the heavens" ('Life of the Marquis of Dufferin and Ava' by Sir Alfred Lyall)

অর্থাৎ সহজ ভাষায়, কংগ্রেস স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রামশীল অংশ থেকে 'রাজভক্ত' সহযোগী, কৃপালোভী বুর্জোয়াদের পৃথক ক'রে রাখা এবং তাদের অন্তরালে থেকে ভারতীয় কল্যাণের নামে ভারতবর্ষ শোষণ করা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের এই কূটনৈতিক পরিকল্পনায় কতোখানি সফল হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের পরবর্তী দীর্ঘ ষাট বৎসরের ইতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। ভারতবর্ষে যখনই কোনো চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখনই শনৈঃ-সংস্কারের পথে ভারতের স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নামে এই সহযোগী বুর্জোয়া সমাজকে সাম্রাজ্যবাদীরা বর্মরূপে পেয়েছে। কারণ, দেশের গণ-জাগরণ ছিল, যেমন বিদেশী বুর্জোয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সর্বনাশা, তেমনি স্বদেশী বুর্জোয়াদের পক্ষেও সম্পূর্ণ ভয়ংকর। কিন্তু স্বদেশী বুর্জোয়াদের নিজেদের স্বার্থের জন্যেও মাঝে মাঝে আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। কখনো কখনো ভারতীয় বুর্জোয়ারা দেখেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে

একটু ঠেলে সরিয়ে না দিলে যেমন তাদের নিজেদের পক্ষ-বিস্তারের সুবিধা হচ্ছে না, তেমনি জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে যে, তাকে নেতৃত্ব না দিলে তাকে সামলানোও সম্ভব হবে না। তখনই দেশীয় বুর্জোয়ারা সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু দেশীয় জনসাধারণের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও আতঙ্ক এতোই প্রবল যে, এই সংগ্রামকে তারা কখনো উপসংহারে পৌছতে দেয়নি, পাছে দেশীয় দরিদ্র জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা চলে যায়, তাদের কেবলই এই ভয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী জনসাধারণের ভয়ে ফরাসী বুর্জোয়ারা যে-ভাবে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিতালি করেছিল, ভারতীয় আন্দোলনগুলির কালেও ভারতীয় বুর্জোয়ারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বারে বারে সন্ধি করেছে সেই ভাবে।

আপন পক্ষ বিস্তারের প্রয়োজনেই হোক, কিংবা দরিদ্র জনসাধারণের তাড়নাতেই হোক্, কংগ্রেসের মধ্যে অচিরে একটি সংগ্রামী অংশের উদয় হোলো এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কংগ্রেস তাদের দাবি পেশ করলো। প্রথমে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই দাবি ছিল অতীব সামান্য, এমন কি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও নয়, কেবলমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে দু'চার জন ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগের আবেদন-নিবেদন মাত্র। এই যুগের ভারতীয় বুর্জোয়ারা বেশ বুঝতো যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাদের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বৃটিশ সরকার ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়ারা নিজেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন না থাকলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা[১] থেকে বেশ বুঝতো যে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের ক্রমপরিণতি এবং তার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। সুতরাং তারা এবার হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একটি মুসলমান বুর্জোয়া সমাজ খাড়া করতে চাইলো। এই divide et impera-র নীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহু অভিজ্ঞতার ফসল। আয়ার্ল্যাণ্ডেও তারা প্রোটেস্টাণ্ট আইরিশ এবং ক্যাথলিক আইরিশদের মধ্যে এমনি একটি বিবাদ-ব্যবধান ঘটাবার চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ঘটাইবার এই কাজে বৃটিশের প্রধান সহায় হলেন সার সৈয়দ আহ্মদ খান। তিনি তাঁর অন্যতম বন্ধু কর্নেল গ্রেহামকে লেখেন : "I have undertaken a heavy task against the so-called National Congress and founded an association, the Indian United Patriotic Associa-

১ আমেরিকান বুর্জোয়া পরিণতি এবং তার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক সকরুণ অধ্যায়।

tion"…স্যার সৈয়দের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আলিগড়পন্থীরাও বৃটিশের প্রতি অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করলো। অবশেষে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশের প্রতি রাজভক্তির শপথ নিয়েই প্রতিষ্ঠা হোলো মুসলিম লীগের। এই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বেকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার একটি সাদৃশ্য আছে। বলা চলে, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু বুর্জোয়ারা সংঘবদ্ধভাবে যা করতে চেয়েছিল, কেবল সেই সূচীরই অনুবর্তন করতে চাইলো মুসলমানরা ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে স্যার সৈয়দকেও নিন্দা করা যায় না। কারণ, ইতিহাসের অগ্রগতিতে একটি অতি-প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্যে তিনি মুসলমান সমাজকে সেদিন উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন এবং বৃটিশের সঙ্গে সেজন্যে সহযোগিতা ছিল অনিবার্য। রামমোহনের যুগ থেকে গান্ধীর যুগ পর্যন্ত হিন্দু বুর্জোয়ারাও এমন একটি সহযোগিতার ধারাকে নিরবধি বহন ক'রে চলেছে, সাময়িক সংগ্রামগুলি তাকে কমা, পূর্ণচ্ছেদের ছন্দায়িত তরঙ্গ দিয়েছে মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যে সকল হিন্দু বুর্জোয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে শীঘ্রই একটি সংগ্রামশীল দলও গ'ড়ে উঠলো। এই দলের পুরোভাগে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং পাঞ্জাবে লালা লজপৎ রায়।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এসে তার সহযোগিতায় যখন হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তখন তারা খ্রীস্টান ধর্মের মহত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টান ধর্মের বহুল সাদৃশ্যের সন্ধান পেয়েছিল, গ'ড়ে তুলেছিল বুর্জোয়া খ্রীস্টান ধর্মের বৈদিক সংস্করণ ব্রাহ্ম ধর্ম। কিন্তু এবার যখন হিন্দু বুর্জোয়াদের এক অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাইলো, তখন তারা খ্রীস্টান সভ্যতাকে হিন্দু সভ্যতার চেয়ে খাটো ব'লে প্রচার করতে চাইলো, * খ্রীস্টান ধর্মের মহত্ব অস্বীকার ক'রে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব করলো ঘোষণা। দেশময় শুরু হোলো গণেশের পূজা, কালীর অর্চনা, স্থাপিত হোলো গো-রক্ষা সমিতি। সকল দিক

১ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু বুর্জোয়া সংগ্রামী অভ্যুত্থানের যিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই লোকমান্য তিলক ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে বাল্যবিবাহের উৎকট প্রচারক হয়ে ওঠেন এবং 'এজ্ অব কনসেণ্ট' বিলের প্রবলতম বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের ঝোঁকে তিনি হিন্দু বুর্জোয়াদেরকে সামন্ততান্ত্রিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এদিক থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে লোকমান্য তিলককেই সাভারকরের জন্মদাতা বলা যায়।

থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও খ্রীস্টান ধর্মকে হিন্দু ধর্মের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক্রমেই প্রবলতর এবং ব্যাপকতর হ'য়ে উঠলো, এবং এই ভাবে সেদিন হিন্দু বুর্জোয়ার সংগ্রামী অভ্যুত্থানের মধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল, সংকীর্ণ, সামন্ততান্ত্রিক একটি শক্তির বীজ অঙ্কুরিত হোতে লাগলো,—যা পরবর্তীকালে ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করলো হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। ঐ সময় আবার অন্যদিকে মুসলমান বুর্জোয়ারা স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করায় হিন্দু বুর্জোয়াদের সংগ্রামী অংশ তাদের বিদ্বেষের চোখে দেখতে লাগলো, তাদের হিন্দুয়ানীর প্রচারে অনেক ক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ ইংরেজ এবং ম্লেচ্ছ মুসলমান এক হয়ে গেলো। এই ঐতিহাসিক প্রমাণটি সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে, তদানীন্তন "মুসলিম-বিদ্বেষী" বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু রচনা যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে একটি সংগ্রামী শক্তির জন্ম হ'লেও তার ভিত্তি কিন্তু মোটেই গভীর বা বিস্তৃত ছিল না। কারণ, সমাজের তলাকার অসংখ্য জনসাধারণের সঙ্গে তা ছিল প্রায় সম্পর্কবিহীন। গরীব ছাত্র, মধ্যবিত্ত বেকার বা অল্প উপার্জনে ব্যাপৃত বুদ্ধিজীবীরাই ছিল এই সংগ্রামশীল অংশের মূল আশ্রয়। সুতরাং, দেশে কোনো বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। ফলে, সংগ্রামশীল হিন্দু বুর্জোয়ারা তখন প্রধানত সাম্রাজ্যবিরোধী ব্যক্তিগত রচনা, বক্তৃতা, প্রচার—এবং কোনো কোনো চরমপন্থী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যাই হোক, ক্রমেই কিন্তু এই সংগ্রামী শক্তি বিন্দু বিন্দু ক'রে সঞ্চিত হ'তে থাকলো, এবং তা সংগ্রামের প্রায় উপযোগী একটি অবস্থা প্রাপ্ত হোলো ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিণতির সঙ্গে বাইরের ঘটনা এসে-ও যোগ দিলো। ঐ সময় জারশাসিত সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া জাপানের কাছে হোলো পরাজিত। বহু শতাব্দীর জন্য কোনো এশীয় শক্তির কাছে ইউরোপীয় শক্তির পরাজয় এই সর্ব প্রথম। ফলে ভারতীয় বুর্জোয়ারা ইউরোপীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করার সাহস পেলো। কেবল তাই নয়, প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক জয়গুলির ফলেও ঐ সময়ে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অবয়বেও গুরুতর ভাঙন ধরেছিল। এই সুযোগে হিন্দু বুর্জোয়ারা সংগ্রামের আশু কারণ হিসাবে গ্রহণ করলো বঙ্গ-ভঙ্গকে। সংগ্রাম হোলো শুরু। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে বিদেশী দ্রব্যবর্জনের সূচী ঘোষিত হোলো। আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস চরমপন্থী বুর্জোয়াদের এই বৃটিশ-বিরোধী ব্যবস্থাকে বিনা শর্তে সমর্থন

না করলেও পর বৎসর, ১৯০৬ সালে, কংগ্রেসে যখন চরমপন্থীদের প্রাধান্য ঘটলো, তখন কংগ্রেস কেবল বিদেশী বর্জনকেই সমর্থন করলো না, সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের মধ্যেই ভারতের স্বায়ত্তশাসন দাবি করলো। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী বর্জনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি এবং জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও হোলো প্রবর্তিত। কংগ্রেসে সাময়িক-ভাবে সংগ্রামশীল বুর্জোয়াদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলেও তাঁদের এই সূচীতে কংগ্রেসের অপর অংশ – যাঁরা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা চান—সুখী হলেন না। ফলে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে গোখলের নেতৃত্বে নরমপন্থীদের সঙ্গে তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের ঘটলো বিচ্ছেদ। হিন্দু বুর্জোয়া শিবিরের এই আত্মকলহের সুযোগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সতর্কতার সঙ্গেই গ্রহণ করলো! ফলে সংগ্রামশীলদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হোলো। সংবাদপত্রে রাজদ্রোহী প্রবন্ধ লেখার অজুহাতে তিলকের হোলো ছয় বৎসরের কারাদণ্ড। অন্যান্য নেতাদের হোলো কঠিন শাস্তি। চারিদিকে নির্যাতন চললো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এক হাতে যখন কঠোর দমন-কার্য চালিয়েছে, ঠিক তখনই তারা অন্য হাতে দিতে চেয়েছে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা। কারণ, তারা বেশ জানতো যে, কেবল অত্যাচার দিয়ে কোন সংগ্রামকে রোধ করা যায় না, তাই এবারেও তারা তাদের সুপরীক্ষিত নীতির প্রয়োগ করলো। তারা এক হাতে যখন কঠোরভাবে চরমপন্থীদের দমন করতে লাগলো, তখনই অন্য হাতে নরমপন্থীদের সঙ্গে মৈত্রী-মীমাংসার আলাপ আলোচনা চালালো। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত হোলো মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম। অধিকাংশ চরমপন্থী কারাগারে বা দ্বীপান্তরে থাকায় নরমপন্থীদেরই কর্তৃত্ব ছিল কংগ্রেসে। সুতরাং তারা অচিরে বৃটিশ সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করলো। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সংশোধিত হোলো বঙ্গভঙ্গ। নরমপন্থী-কবলিত কংগ্রেস প্রচার করলো, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বৃটিশের সদাশয়তায় দেশে আনন্দের আর সীমা নেই, বৃটিশ রাজনীতিকদের প্রতি বিশ্বাসে ও কৃতজ্ঞতায় জনসাধারণের বক্ষ উদ্বেল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে…।

বস্তুত, বৃটিশ রাজনীতিকদের করুণায় যে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় নি, হয়েছিল চরম-পন্থীদের বিদেশী বর্জনের আন্দোলনের ফলে, তা বলাই বাহুল্য। এমনি ভাবেই সেদিন তিলকের নেতৃত্বে হিন্দু বুর্জোয়াদের একাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘা দিতে শিখলো।

এদিকে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারাও কিন্তু বেশী দিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিতালি রাখতে পারলো না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এবং সাহায্যে ক্রমেই মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্তার লাভ করেছিল। এবার

তাদের মধ্যেও মধ্যবিত্তের সমস্যা প্রবল হ'য়ে উঠলো। বেকার যুবক, গরীব অসহায় ছাত্র এবং স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের সংখ্যা যেমন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তেমনি তাদের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই তীব্রতর আকার ধারণ করলো। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাদের মধ্যে সংগ্রামী শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটলো—১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে যেমনটি ঘটেছিল হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেও যেমন বহির্জগতের ঘটনা ভারতীয় সংগ্রামী স্রোতকে ফেনিল ক'রে তুলেছিল, এবারও আবার হোলো তেমনিটি। ইটালী-তুরস্কের যুদ্ধ এবং বল্কান যুদ্ধের মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘা দেওয়ার সুযোগ পেলো। মওলানা মহম্মদ আলির উদ্যোগে ডাক্তার আনসারীর অধীনে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে তুরস্কে Red Crescent Misson প্রেরিত হোলো। আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'আল হিলাল' পত্রিকায়, জাফর আলি খাঁ তাঁর 'জমিন্দার' পত্রিকায় এবং মওলানা মহম্মদ আলি তার 'কমরেড' ও 'হামদরদ' পত্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুমুলভাবে প্রচারকার্য শুরু করলেন।

হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি, হিন্দু বুর্জোয়াদের সংগ্রামশীল অংশ সংকীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির মধ্যেই ফিরে গিয়েছিলেন। এখানেও আমরা পুনরায় অনুরূপ একটি অবস্থাই লক্ষ্য করি। মুসলমান বুর্জোয়াদের বৃটিশ সাম্রাজ্য-বিরোধিতা আবার খ্রীস্টান ধর্ম-বিরোধিতায় পরিণত হোলো, ভারতীয় মুসলমানরা খ্রীস্টান ধর্মের অপেক্ষা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারেই অত্যন্ত উৎসাহী হ'য়ে উঠলেন। আরব-সভ্যতা কিভাবে অন্ধকার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীপ-বর্তিকাকে বাইরের বর্বরতার বিপদ-ঝ্যাত্যা থেকে সযত্নে সাগ্রহে রক্ষা করেছিল, কিভাবে সক্রেতিস প্লেতো, এরিস্টলকে তারাই একদা স্পেনের পথে অন্ধ হৃতসর্বস্ব ইউরোপকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, কিভাবে তারা অঙ্কশাস্ত্র, বস্তুবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে একদা মৌলিক গবেষণা এবং প্রয়োগ-চেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান সম্পদকে সমৃদ্ধতর করেছিল, তারই উচ্ছ্বসিত ইতিহাস কেবলই প্রচারিত হ'তে লাগলো। প্রচারিত হ'তে লাগলো যে, বহু শতাব্দী পূর্বেই খ্রীস্টান ধর্মের অপমৃত্যু ঘটেছিল, সে যে পুনর্জীবিত হ'য়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ, প্রাণ-শক্তিতে উচ্ছল সারাসেন সভ্যতার জীবন-প্রাচুর্যের সংস্পর্শে সেদিন ইউরোপ এসেছিল। এইভাবে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের বৃটিশ-সাম্রাজ্য-বিরোধিতা খ্রীস্টান ধর্ম-বিরোধী ইসলাম-স্তুতিতে এবং বিগত কীর্তির আত্মম্ভরিতায় প্রকাশ লাভ করলো এবং আকার ধারণ করলো

প্যান-ইসলামের। বিগত হেজাজী সভ্যতার পুনরভ্যুত্থানের প্রভাতী গাইতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো: "শুনা হ্যায় কদসিয়োঁসে ময়নে উও শের ফির হুঁসিয়ার হোগা।" (দেবদূতদের কাছ থেকে শুনেছি ওই (আরব) ব্যাঘ্র আবার জেগে উঠবে।) সার মহম্মদ ইকবাল আরব সভ্যতার বিগত দিনগুলি স্মরণ ক'রেও ক্রন্দন ধ্বনিত করলেন। সিসিলি-দ্বীপে আরব সভ্যতার এক সৌধের ধ্বংসাবশেষ দেখে ফুকরে উঠলেন তিনি, 'কাঁদো, চক্ষু থেকে রক্ত ঝরিয়ে কাঁদো, আরব সভ্যতার ওই কবর দেখা যাচ্ছে।'*

এখানে স্মরণীয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের অঙ্গরূপেই সেদিন ইসলাম সভ্যতার স্তুতি এবং প্যান-ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছিল। খিলাফৎ সমস্যা এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের অভিযানের বিরুদ্ধে-ও ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলন-ও ছিল বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রকাশ মাত্র। আমরা লক্ষ্য করি, ভারতে মুসলমান বুর্জোয়া শক্তি যখন সহযোগিতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল, যখন বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার মতো শক্তি বা সাহস তারা সঞ্চয় করে নি, তখন ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফৎ বা তুরস্কের সমস্যা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র-ও মাথা ঘামাচ্ছে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীল সুলতান আবদুল হামিদ তাঁর প্যান-ইসলামের সূচী গ্রহণ করেন। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ সমাজ-ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক অবয়বের বিরুদ্ধে যে তরুণ বুর্জোয়া শক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তারই প্রচণ্ড আঘাতের হাত থেকে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে কোনোক্রমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাতেই সেদিন সুলতান আবদুল হামিদ এই প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু 'তরুণ তুর্কের' অভ্যুত্থানকে রোধ করা ছিল অসম্ভব। তাই ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তরুণ তুর্কী তার পুরাতন খলিফা এবং তার শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করলো এবং প্যান-ইসলামের প্রচার সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গেলো। কিন্তু ঐ সময়েও ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ব্যাপৃত থাকায় খিলাফৎ বা প্যান-ইসলামের সমস্যা তাঁদের আদৌ ব্যস্ত করলো না। ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারা বৃটিশ-বিরোধী শক্তিসঞ্চয় করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা খলিফা-প্রীতি এবং প্যান ইসলামের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করলো—যদিও তুরস্কের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিণতির পক্ষেও তা ছিল

* "রোয়ে আয়ে লাখ দিলকর আয় দিদাখুন বহানা কর,
উও নজর আতা হ্যায় তহজিব হেজাজীকা মজার।"

সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। এইভাবে কয়েক বৎসর পূর্বে হিন্দু বুর্জোয়ারা যেমন বৃটিশ বিরোধিতার উদ্দেশ্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু-ধর্ম-দর্পের পথ গ্রহণ করেছিল, তেমনি ভারতের মুসলমান বুর্জোয়ারা-ও গ্রহণ করলো সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল খিলাফৎ এবং প্যান-ইসলামের পথ। ফলে, হিন্দু ও মুসলমান বুর্জোয়াদের মধ্যে একদা যে বৃটিশ-বিরোধিতা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছিল, তা-ই পরবর্তী কালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের উপযোগী ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হোলো।

এই সময়ে শুরু হোলো প্রথম মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধে বৃটেন তুরস্কের বিপক্ষে থাকায়, মুসলমান বুর্জোয়াদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রকাশরূপে তুরস্ক-প্রীতি প্রবল হ'য়ে উঠলো। মুসলমান সংবাদপত্রগুলি বৃটেনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাতে লাগলো। ফলে মওলানা আজাদ, মওলানা মহম্মদ আলি প্রভৃতি বৃটিশ-বিরোধী মসলেম নেতারা দীর্ঘকালের জন্যে বিনা বিচারে হলেন অন্তরীণ।

এমন সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রথম দিকে গান্ধীজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করলেও, তিনি শীঘ্রই হিন্দু ও ভারতীয় মসলেম বুর্জোয়া শক্তির মধ্যে সাময়িক মিলন ঘটালেন। কেবল তাই নয়, হিন্দু বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেও যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে ব্যবধান ও বিরুদ্ধতা ঘটেছিল, তিনি তারও ঘটালেন অবসান। (অবশ্য, একদল নরমপন্থী ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের বাইরে চলে যান। তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতাব ধ্বজা আরো দীর্ঘকাল নির্লজ্জভাবেই বয়ে বেড়াতে থাকেন।)

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদও গান্ধীজীর মধ্যে এমন একজন মানুষের সন্ধান পেলো, যাঁর জীবন-দর্শন পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সহায়ক হ'য়ে উঠবে। গান্ধীজীর জীবন-দর্শনে দারিদ্র্যের স্তুতি, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং অহিংসাই ছিল প্রধান। বৃটিশ শোষণের ফলে দেশে দারিদ্র্য ছিল অনিবার্য, সুতরাং দারিদ্র্যকে ত্যাগের মহিমা দিলে শোষক সাম্রাজ্যবাদীরই যে ছিল সুবিধা, একথা বলাই বাহুল্য। গান্ধীজী যে সহনশীলতা এবং অহিংসার প্রচার করছিলেন, তাই দেশের বিপ্লবী শক্তিকে পরোক্ষভাবে বিরত বিভ্রান্ত করছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারে, কথাবার্তায় non-violenceএর উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। কেবল তাই নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল, ভারতবর্ষকে বিশাল কৃষিক্ষেত্র-রূপে ব্যবহার করতে। সুতরাং ভারতবর্ষে কলকারখানার যাতে উন্নতি না হয়, তাই ছিল তাদের

একান্ত কাম্য। গান্ধীজী যখন ভারতবর্ষকে কলকারখানার বিরোধী * হ'তে এবং কৃষিক্ষেত্রে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতেই ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে বসলেন। বস্তুতপক্ষে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি ও শিক্ষার পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছিল গান্ধীজীর মধ্যে। দারিদ্র্যের স্তুতি, ত্যাগ, ক্ষমা, সহনশীলতা এবং অহিংসা ছিল সেই সংস্কৃতি ও শিক্ষার মূল কথা। মানুষগুলো পাভ্লভের কুকুরের মতো। তাই গান্ধীজী মানুষের সেবা মানুষ হ'য়ে-ও তাঁর আবাল্য শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিপার্শ্বকে কখনো উত্তীর্ণ হ'তে পারলেন না।

* গান্ধীজীর এই যন্ত্রবিরোধিতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায় একটি কৌতুককর ঘটনা থেকে। (অবশ্য পরবর্তীকালে বহু রচনায় ও ভাষণে গান্ধীজী নিজেকে যন্ত্রবিরোধী ব'লে স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হয়েছেন!) দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম শেষে দেশে ফেরার সময় গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন মিঃ কলেনবেক। কলেনবেকের একটা দূরবীন ছিল। গান্ধীজীর যন্ত্রবিরোধী যুক্তি অনুসারে কলেনবেক ঐ দূরবীনটিকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন।

বারো

মহাযুদ্ধের শুরু হয় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট তারিখে। গান্ধীজী তার দুদিন বাদে বিলাতে পৌছেন। ঐ সময় ভারতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থীদের প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের নামে কংগ্রেস বৃটিশকে সাহায্য করতে চাইলো। লণ্ডনে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে লালা লজপৎ রায়, জিন্না* এবং অন্যান্য নেতারা বৃটিশ সরকারকে কংগ্রেসের সংকল্প জ্ঞাপন করেন। অহিংসাপন্থী হওয়া সত্ত্বেও গোখলের ছাত্র গান্ধীর পক্ষে এই সহিংস যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। গান্ধীজী হোটেল সেসিলে তার অভ্যর্থনা-সভায় ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশ্য আবেদন জানালেন, তারা যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে নিজেদের ভাবেন এবং সেই হিসাবে কর্তব্য করেন। গান্ধীবাদীরা অনেকেই গান্ধীজীর সহিংস যুদ্ধের সমর্থনে বিস্মিত হ'লেন। তাদের জবাবে গান্ধীজী যা জানালেন, তাকে হিংসার প্রশস্তি বলা চলে: "হিংসা ব্যাপক বস্তু। আমাদের এই প্রাণ হিংসার বহ্নি শিখায় উৎসর্জিত। মানুষ বাহিকভাবে হিংসা না ক'রে ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না। কোনও দেহধারীই বাহ্য হিংসা থেকে মুক্ত হ'তে পারে না।"† লণ্ডনে যে সব ভারতীয় ছিলেন, তাঁদের অনেককে নিয়ে তিনি একটি সেবাদল গ'ড়ে তুললেন। এখানে এই কাজের সংস্পর্শে এসেই তার সঙ্গে মিসেস সরোজিনী নাইডুর প্রথম পরিচয় ঘটে। অহিংস সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে যখন সহিংস যুদ্ধের সাহায্য করা হয়, তখন সেই অহিংসাও যে হিংসারই সহায়ক হ'য়ে ওঠে, সে বিষয়ে গান্ধীজী অবশ্য যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। "বন্দুক নিয়ে যে যুদ্ধ করে, আর যে তার সাহায্য করে, অহিংসার দৃষ্টিতে আমি সে দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। যে ব্যক্তি লুণ্ঠনকারীর দলে চাকরী করে, সে লুণ্ঠনই করুক, বা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করুক, বা তাদের

---

* এখানে লক্ষণীয়, মিঃ এম. এ জিন্না তখনো মুসলিম বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করছেন না। তিনি অপেক্ষাকৃত পরিণত হিন্দু বুর্জোয়াদের সহযোগী শিবিরেই রয়েছেন এবং কংগ্রেস নেতা ও নেত্রীদের দ্বারা বর্ণিত হ'চ্ছেন "মিলনের বাণীবাহক" রূপে। তিনি মুসলিম গোখলে। তিনি বৃটিশের সঙ্গে চূড়ান্ত সহযোগী। পরবর্তী কালে মুসলিম বুর্জোয়া সম্প্রদায় যখন হিন্দু বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধতা করছে এবং সেই বিরুদ্ধতায় সাফল্যের লোভে বৃটিশের সঙ্গে করছে হীন প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগিতা, তখনই তিনি বৃটিশ সহযোগিতার নেতা হিসাবে তিনি মুসলিম বুর্জোয়াদের সারথ্য গ্রহণ করেছেন।

† গান্ধীজীর 'আত্মকথা' থেকে।

সেবাই করুক, দস্যুতার অপরাধে সে-ও লুণ্ঠনকারীদের সঙ্গে একই অপরাধে অপরাধী।"*

কিন্তু এবার তিনি কেবল সেবাকার্যেই সন্তুষ্ট রইলেন না। তিনি ভারতে এসে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ভারতীয়দের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহও করতে লাগলেন। বৃটিশকে সাহায্য করার অত্যুৎসাহে ভেসে গেলো তাঁর অহিংসার ধর্ম, তত্ত্ব-দর্শনের মহিমা! অথচ ভারতের স্বার্থে যখন সামান্যতম দাঙ্গাহাঙ্গামাও ঘটেছে, তখনই তিনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন, তখনই তাঁর অহিংসা ও সত্যের সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা ভারতবাসীর বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী শক্তির বুকে জগদ্দল পাথরের মতো এসে চ'ড়ে বসেছে—এর অর্থ কি? গান্ধীজী যে সামাজিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তার স্বরূপ সন্ধানের মধ্যেই এর যথার্থ অর্থ মিলবে, অন্যত্র নয়। গান্ধীজী ছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বার্থের পূর্ণতম প্রকাশ এবং ভারতীয় বুর্জোয়ারা ছিলেন মূলত বৃটিশের সহযোগী।† তলাকার অসংখ্য মানুষের বিক্ষোভের উত্তাপ মাঝে মাঝে তাঁদের তরল অস্তিত্বের উপর বিপ্লবের বুদ্বুদ তুলেছে, এইমাত্র।

এই সময় গান্ধীজীর প্লিউরিসি হয়। তিনি ঈষৎ সুস্থ হ'লেই দেশে রওনা হন। ভারতবর্ষে ফিরে গান্ধীজী প্রায় সেরে ওঠেন এবং ভারতবর্ষ ভ্রমণে বার হন। এবারে ভারতের তীর্থস্থানগুলির প্রতিই তাঁর বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। তীর্থভ্রমণ শেষে তিনি আমেদাবাদে ফিরে আসেন এবং সেখানে তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। এই সময় ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরমিটিয়া পাঠাবার যে প্রথা ছিল, তাকে আইন ক'রে বন্ধ করার জন্যে গান্ধীজী অনেক চেষ্টা করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জুলাই থেকে এই প্রথা লোপ পায়।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যখন একটি মূলত ধনিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন, ঠিক তার পূর্বক্ষণেই তিনি সেখানে ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে করেছিলেন মিতালি। কারণ, গণতন্ত্রের নামে কোনো আন্দোলন করতে হ'লে গণতন্ত্রের মূল অধিকারী কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য না নিলে চলে না। বিশেষত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো হিন্দু বাড়ির পূজা-পার্বণের মতো। নৈবেদ্য ঠাকুর নিজে খান না ব'লেই সম্ভবত নৈবেদ্যের সমারোহটা তাঁর নামে করাই

* ঐ একই গ্রন্থ থেকে।

† অবশ্য পরবর্তী কালে ১৯২২ সালে বিচারের সময় গান্ধীজী তাঁর এই সহযোগিতা সম্পর্কে কৈফিয়ত দেন: "In these efforts at service I was actuated by the belief that it was possible by such services to gain a status of full equality for my countrymen."

নিরাপদ। কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে, বুর্জোয়া আন্দোলনগুলো গণ-দেবতার নামেই হয়েছিল এবং নৈবেদ্যের সম্ভার-ও ছিল পুরুত-ঠাকুরদের নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু গণ-দেবতা ঠাকুরটি আবার জাগ্রত কিনা, তাই তাঁর নামে নৈবেদ্য সাজিয়ে তাঁকে বঞ্চিত করা সহজ নয়। সুতরাং গণ-দেবতার বুর্জোয়া সেবাইত এবং, পুরোহিতদের সর্বদা ই ভয় যে, গণ-দেবতার কোটি কোটি হস্ত কখন তাঁর প্রাপ্য নৈবেদ্যকে এসে গ্রাস ক'রে বসেন। তখন তাদের কাছে গণ-দেবতা মুহূর্তে আবার গণ-দৈত্যে পরিণত হন। তাদের নির্লজ্জ সুবিধাবাদী প্রচার চলতে থাকে।* ভারতীয় 'স্বাধীনতা' আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রাক্কালেও তাই গান্ধীজীকে আমরা কৃষক ও শ্রমিক নেতারূপেই দেখি। সেগুলির মধ্যে চম্পারণ ও খেড়ার কৃষক আন্দোলন এবং আমেদাবাদের শ্রমিক আন্দোলনই শ্রেষ্ঠ।

নীলকরদের অত্যাচার বাংলার ইতিহাসের এক বীভৎস অধ্যায়। বাংলার কৃষাণদের সমবেত চেষ্টায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নীলকরদের অত্যাচার বাংলাদেশে লোপ পায়। কিন্তু সুবে বাংলার অপরাংশ বিহারে তা যথাপূর্ব চলতে থাকে। সেখানে-ও কৃষাণ-বিদ্রোহ যে হয় নি, এমন নয়। ১৮৬৭ সাল থেকে বারে বারে সেখানে কৃষকদের অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং নীলকর ও সরকার সেগুলিকে প্রতিবারেই যেমন দমন করেছে কঠিন হস্তে, তেমনি কৃষকদের এক-আধটুকু সুযোগ সুবিধাও দিয়েছে। বর্তমান নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের প্রধান অভিযোগ ছিল তিনকাঠিয়া প্রথা। দেশে আহারের উপযোগী ফসল থাক আর না থাক, কৃষকদের নীলের চাষ করতেই হবে বিঘা প্রতি তিন কাঠা। কেবল তাই নয়, চাষীকে নিজের খরচে গাড়ি ক'রে নীলের গাছগুলিকে ক্ষেত থেকে নীলকুঠিদের খামারে পৌঁছে দিতে হোতো। বিনা মজুরিতে সেগুলিকে পচাতে ও তৈরী করতেও তারা বাধ্য থাকতো। জেলা চম্পারণে কৃষকরা এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলো। সেজন্যে তারা সাহায্য চাইলো গান্ধীজীর। কৃষকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে গান্ধীজী চম্পারণ রওনা হলেন, প্রথমে এলেন পাটনায়। সেখানে মওলানা মজহরুল হক, ব্রজকিশোর প্রসাদ এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ

* তিনি (গান্ধীজী) তীব্রভাবে 'জনতাতন্ত্রের' নিন্দা করিলেন। এই জনতা-তন্ত্রকে তিনি সর্বাপেক্ষা বিপদ বলিয়া ভাবেন। যুদ্ধকে তিনি যেমন ঘৃণা করেন, তেমন আর কেহই করেন না। তবু যদি তাঁহাকে বাছিয়া লইতে বলা হয়, তবে তিনি এই জনতাদৈত্যকে বন্ধনমুক্ত করিবার অপেক্ষা যুদ্ধকেই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

"মহাত্মা গান্ধী"—রোমাঁ৷ রোলাঁ

প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা হোলো। স্থানীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও গান্ধীজীকে এ-বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি এবং সমর্থন জানালেন। চম্পারণে পদার্পণ করলেন গান্ধীজী। চম্পকের অরণ্য আর ছিল না সেখানে, ছিল সমৃদ্ধিহীন মাঠের হতশ্রী দিগন্তবিস্তার। নীলকরের অত্যাচারে নিপীড়িত নির্যাতিত চম্পারণ তার রিক্ত বেদনা দিয়েই সেদিন গান্ধীজীকে অভিনন্দিত করলো।

শীঘ্রই গান্ধীজীর উপর নীলকরদের পড়লো রোষদৃষ্টি। তাই অবিলম্বে তাঁর চম্পারণ ত্যাগের জন্যে এলো সরকারী আদেশ। কিন্তু এই অন্যায় আদেশ নির্বিবাদে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না গান্ধীজীর পক্ষে। গান্ধীজী আদেশ অমান্য করলেন। এবার তাঁর ওপর আদালতে হাজির হবার হুকুম হোলো। এই হুকুমের সংবাদ তড়িৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। হাজারে হাজারে ভীড় ক'রে এলো মানুষ। এতো সংখ্যাতীত মানুষের সমাগম চম্পারণ বহুদিন দেখে নি। বিক্ষুব্ধ জনতার এই বিপুল দুরন্ত উচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করার মতো স্পর্ধা ছিল না সরকারের। মামলা প্রত্যাহৃত হোলো।

চম্পারণের দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে গান্ধীজী ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন, তাদের শিক্ষা ও সেবার নানা ব্যবস্থা করতে চাইলেন। এইভাবে যে গান্ধীজী দিনে দিনে চম্পারণের কৃষকদের সংঘবদ্ধ ক'রে তুলছিলেন, সে বিষয়ে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিল। সুতরাং গান্ধীজীর ওপর কেবলই তাড়া আসতে লাগলো, আর তাঁকে সময় দেওয়া চলে না, অনুসন্ধানের কাজ তাঁকে শীঘ্রই শেষ করতে হবে। জবাবে গান্ধীজী জানালেন, কেবল অনুসন্ধান নয়, অন্যায়ের শেষ না ক'রে এখান থেকে এক পা-ও তিনি নড়বেন না। চম্পারণের কৃষক-শক্তি সম্পর্কে সরকারের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তা যদি এবার গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তবে তার আলোড়ন যে সমস্ত ভারতবর্ষকে তরঙ্গায়িত ক'রে তুলবে, সে বিষয়ে সরকারের কোনো সন্দেহ ছিল না। কাজেই সরকার হঠাৎ সদাশয় হ'য়ে উঠলো, বসালো সরকারী কমিশন। তিনকাঠিয়া প্রথার ঘটলো বিলোপ। এমনিভাবে সেদিন উত্তর ভারতের সহস্র সহস্র কৃষকের প্রীতি ও ধন্যবাদ গান্ধীজীর ভারতীয় নেতৃত্বের পথকে প্রশস্ত ক'রে দিলো।

অবিলম্বেই গান্ধীজীর ডাক এলো বোম্বাই থেকে। খেড়ায় কৃষাণরা উঠেছে জেগে, আমেদাবাদে শ্রমিকরা চেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার। গান্ধীজী খেড়া এবং আমেদাবাদের আহ্বানকে সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষ দেখলো আইন অমান্য, অনশন, সত্যাগ্রহ।

এই সময় নরমপন্থী-কবলিত ভারতীয় কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে বৃটিশের তাঁবে চ'লে

এসেছিল। কারণ, কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে বৃটিশ শাসকদের নিয়মিত দেখা যাচ্ছিল সম্মানিত অতিথিরূপে।* ভারতীয় সহযোগী হিন্দু বুর্জোয়াদের এই ভূমিকায় গান্ধীজীও সানন্দে অবতীর্ণ হলেন। খেড়ার অহিংস সত্যাগ্রহের অনতিকাল বাদেই বড়লাটের অনুরোধ ক্রমে তিনি সহিংস যুদ্ধের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

প্লিউরিসির পর গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি, সৈন্য সংগ্রহের কঠোর পরিশ্রমের ফলে তা আবার ভেঙে পড়লো। গান্ধীজী কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হোলেন।

গান্ধীজী যখন রোগে শয্যাশায়ী, তখনই সংবাদ এলো যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটেছে। গান্ধীজী আনন্দিত হলেন। কিন্তু সে-আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হোলো না। গান্ধীজী তখনো রোগ-শয্যায়, তাঁর হাতে এলো কুখ্যাত রাউলাট কমিটির এক কপি রিপোর্ট। গান্ধীজী স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। এ কী কৃতঘ্নতা! এই জন্যেই কি অহিংসার আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হ'য়েছিলেন?†

যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যে-সমস্ত দমননীতিক আইন প্রবর্তিত করা হয়েছিল, যুদ্ধশেষেও সেগুলিকে অক্ষুণ্ণভাবে চালু রাখার পরিকল্পনায় এই রাউলাট বিলের উৎপত্তি। বৃটিশের সঙ্গে উচ্চ মধ্য শ্রেণীর লোকেরা সহযোগিতা করলেও সমাজের তলায় অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। যুদ্ধকালেই পাঞ্জাবের গাদর আন্দোলনের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রকাশ ঘটে। সরকার সেই আন্দোলন কঠিন হস্তে দমন করেছিল। যুদ্ধের পরেই কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিক অবয়বে একটা দোলা লাগলো। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সোভিয়েট বিপ্লবের আঘাতে পৃথিবীর পুঁজিতন্ত্রের একাংশ ধ্বসে পড়েছিল। তার তরঙ্গ ভারতবর্ষে এসেও লাগলো। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে এমন ব্যাপকভাবে

* ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড পেটল্যাণ্ড, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই-এর গভর্নর লর্ড উইলিংডন, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের গভর্নর সার জেম্‌স্ মেস্টন কংগ্রেস অধিবেশনগুলিকে 'অলংকৃত' করেন।

† এতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর আস্থা যে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল, একথা ভাববার অবশ্য কোনো কারণ নেই। কারণ, রাউলাট আইন এবং অমৃতশহরের হত্যাকাণ্ডের পর-ও তিনি বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতাকে ধ্রুব অভ্রান্ত পথ ব'লে আঁকড়ে ছিলেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকেও মণ্টফোর্ড সংস্কারকে গ্রহণ ক'রে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি আবেদন করেন:

"The Reforms Act coupled with the Proclamation is an earnest of the fntention of the British people to do justice to India and it ought to remove suspicion on that score...Our duty therefore is not to subject the Reforms to carping criticism, but to settle down quietly to work so as to make them success." (Young India. Dec. 31, 1919.)

শ্রমিক ধর্মঘট দেশময় দেখা দিলো, যা ভারতবর্ষে এর পূর্বে কখনো আর হয় নি। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই মিলে ধর্মঘট শুরু হোলো। ক্রমেই এই ধর্মঘট ব্যাপকতর হ'য়ে ১৯১৯ সালের জানুয়ারির দিকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্রমিকের মধ্যে পড়লো ছড়িয়ে। যুদ্ধের সময়েই সৈন্যদের মধ্যে কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে, যুদ্ধশেষে, অর্থনীতিক অবয়বটা যখন রাতারাতি চুপসে গেলো, তখন সেখানেও বিক্ষোভ প্রবলতর হ'তে লাগলো। নিম্ন মধ্য শ্রেণীরও ছিল ওই একই অবস্থা। ক্রমেই তারা অধিক পরিমাণে কর্মহীন, সম্বলহীন হয়ে পড়ছিল। সুতরাং বৃটিশ সরকার লক্ষ্য করলো, সমগ্র দেশে একটা প্রচ্ছন্ন বিপ্লব ক্রমেই ধূমায়িত হ'য়ে উঠছে। তাই তারা গ্রহণ করলো দমন-নীতি। সুতরাং এই দমন-নীতির প্রতিবাদ না ক'রে কংগ্রেসের উপায় ছিল না।

কিন্তু প্রায় দীর্ঘ বিগত দশ বৎসর ধ'রে কংগ্রেস নিতান্ত নরমপন্থীদের কবলে পড়েছিল। মুসলমান মধ্য শ্রেণীর বিপ্লবী অংশটিও কারাগারে রুদ্ধ ছিল। সুতরাং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে নরমপন্থী মুসলিম প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সঙ্গে নরমপন্থী কংগ্রেসের মিলন সম্ভব হোলো।* এই মিলনের ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিতান্ত অমায়িকভাবে বৃটিশ সরকারের কাছে সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের আংশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করলেন। কিন্তু তলায় বিপ্লবী শক্তি যতোই জমতে লাগলো, তার উত্তাপে নরমপন্থীদেরও ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠতে হোলো। ভারতের জন-সাধারণের এই অসন্তোষকে সাময়িকভাবে ক্ষান্ত করার জন্যে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলো যে, ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সত্বর স্বায়ত্তশাসনশীল ক'রে তোলার জন্যেই তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার প্রবর্তনের লোভ দেখানো হোলো। একদিকে সরকার নরমপন্থীদের যেমন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের লোভ দেখাতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি চরমপন্থীদের দমনের জন্যে তারা প্রবর্তিত করতে চাইলো রাউলাট আইন। তোষণ ও শোষণের বিপরীত দুই নীতিকে একই সঙ্গে বৃটিশ সরকার কাজে লাগাতে লাগলো। এই দ্বৈত-নীতির প্রতিফলন হিসাবেই পরিকল্পিত হোতো দ্বৈত শাসনের রীতি।

কিন্তু বৃটিশের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হোলো না। দেশের অর্থনীতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং দেশের জনমতকে একেবারে উপেক্ষা করা কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। গান্ধীজী স্থির করলেন, রাউলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যদি সত্যই আইন পাস হয়, তবে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। এই

* লখ্‌নৌ প্যাক্ট।

উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুকরণে এখানেও তিনি একটি সত্যাগ্রহ কমিটি গ'ড়ে তুললেন। এমনিভাবে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে একটি সত্যাগ্রহ বাহিনী গ'ড়ে উঠতে লাগলো।

রাউলাট কমিটির বিরুদ্ধে দেশময় আন্দোলন যেমন একদিকে তীব্র হ'য়ে উঠলো, আইন পাস করার জন্যে সরকারের জেদও যেন ততোই প্রবল হ'য়ে উঠলো। বড়লাটকে গান্ধীজী পত্র লিখে জানালেন, এ-অবস্থায় তাঁর সত্যাগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সংগঠনের জন্যে গান্ধীজী তাঁর দুর্বল শরীর নিয়েই ভারত ভ্রমণে বহির্গত হলেন। প্রথমে গেলেন মাদ্রাজ। সেখানে শ্রীবিজয় রাঘবাচারী এবং রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে তাঁব বহু আলাপ-আলোচনা হোলো। স্থির হোলো, দেশব্যাপী হরতালের মধ্য দিয়েই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালানো হবে। গান্ধীজী বলেন: "সত্যাগ্রহের সংগ্রাম আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম—ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ শুদ্ধির দ্বারাই আরম্ভ করা উচিত মনে হয়। সুতরাং ঐ দিনে সকলে উপবাস কববেন এবং নিজ নিজ কাজকারবার বন্ধ রাখবেন।"

সমস্ত ভাবতবর্ষেই এই কর্মসূচী গ্রহণের কথা স্থির হোলো। হরতালের দিন প্রথমে ধার্য হয়েছিল ১৯১০ সালের ৩০শে মাচ। পরে ওই তারিখ এক সপ্তাহ পেছিয়ে দেওয়া হয়, ধর্মঘটের দিন স্থির হয় ৬ই এপ্রিল। ৬ই তারিখের ধর্মঘট পরিচালনার জন্যে গান্ধীজী বোম্বাই-এ ফিরে গেলেন। হরতালের তারিখ পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে দিল্লীতে গিয়ে পৌছল না। তাই ৩ শে মার্চ তারিখেই সেখানে পূর্ণ হরতাল পালিত হোলো। হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন হ'য়ে উঠলো। শ্রদ্ধানন্দজি জুম্মা মসজিদ থেকে হিন্দু মসলেম জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। কেবল রাউলাট বিলের প্রতিবাদ নয়, হিন্দু-মুসলমানের এহ অভূতপূর্ব মিলন সরকারকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো। রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে পুলিশে শোভাযাত্রীদের পথ আটকালো, গুলী চালালো। নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদেব মধ্যে নিহত এবং আহতের সংখ্যা অল্প হোলো না। দিল্লীতে ব্যাপকভাবে শুরু হোলো পুলিশী জুলুম, সরকারী অত্যাচার। লাহোর এবং অমৃতশহরেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটলো। চারিদিক থেকে তার আসতে লাগলো, গান্ধীজীর আগমন কামনা ক'রে। ৬ই এপ্রিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে বোম্বাই-এ-ও হরতাল পালিত হোলো। দেশের সর্বত্রই ধর্মানুষ্ঠানের প্রশান্ত গম্ভীর স্তব্ধতা বিরাজিত ছিল। কেবল দিল্লীতে কিছু গোলযোগ ঘটলো, তাও পুলিশের উশ্‌কানিতে। গান্ধীজী অবিলম্বে দিল্লী রওনা হলেন। কিন্তু সরকার তাঁকে পথে গ্রেফতার ক'রে বোম্বাই পাঠিয়ে

দিলো। গান্ধীজীর গ্রেফতারের সংবাদে ভারতীয় জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো। বোম্বাই পায়ুধুনীতে সশস্ত্র পুলিশ জনতাকে সংগীনের গুঁতোয় ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলো। আমেদাবাদে শ্রমিকরা হ'য়ে উঠলো ক্ষিপ্ত। একজন সার্জেণ্টকে তারা খুনও ক'রে বসলো। নড়িয়াতে রেললাইন তুলে ফেলার চেষ্টাও হোলো। আমেদাবাদে জারী হোলো সামরিক আইন। সরকারের নিরঙ্কুশ জুলুম নিষ্করুণভাবে চলতে লাগলো। পাঞ্জাবেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হোলো, অমৃতশহরে হোলো কিছু লুটপাট, কিছু বা খুনখারাপি।

১১ই এপ্রিল রাত্রিতে জেনারেল ডায়াব তাঁর সৈন্য সামন্ত দিয়ে অমৃতশহর ঘেরাও করলে। ১৩ই তারিখে ছিল স্থানীয় পরব। তাই নরনারী শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে এসে জড়ো হলো জালিয়ানওয়ালাবাগেব মাঠে। জনতাব মধ্যে কোনো প্রকার অশান্ত বিক্ষুব্ধ ভাব ছিল না। আগের দিন রাত্রিতে জেনারেল ডায়ার সভাসমিতি ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ক'রে নাকি এক হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই এই নিষেধাজ্ঞা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় নি। পুণ্য উৎসবে সমবেত জনতা আইন অমান্য করছে, এই অজুহাতে জেনারেল ডায়ার তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে এসে পৌছলো, তারপর কোনোপ্রকার সতর্ক না ক'রেই নিরুপায় জনতার ওপর গুলী চালাতে লাগলো। দশ মিনিট কাল অবিশ্রাম গুলী চললো। জালিয়ানওয়ালাবাগের চারিদিকেই ছিল উঁচু প্রাচীর, বাইরে পালাবার পথ ছিল না। দশ মিনিটে পাঁচশত লোক নিহত হোলো, আহত হোলো আবো অনেক বেশি। এমনি ভাবেই সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের বদ্ধ প্রান্তরে হিন্দু, মুসলমান ও শিখের রক্তধারা এক জাতীয় জাগরণের ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে মিলিত হোলো।

কিন্তু তবুও সরকার ক্ষান্ত হোলো না। জারী হোলো সামরিক আইন। নিরস্ত্র জনতার উপর বিমান থেকে বর্ষিত হোতে লাগলো বোমা। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামরিক আদালতে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অপমান ও লাঞ্ছনা করা হোলো। সংবাদ-সেবকের লৌহ পর্দা সমস্ত পাঞ্জাবের কণ্ঠ চেপে ধরলো। পাঞ্জাবের এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ নেতাদের কাছে গিয়ে পৌছতেও লাগলো প্রায় চার মাস। জেনারেল ডায়ারকে সরকার পুরস্কৃত করলো বিশ হাজার পাউণ্ডের একটি তোড়া দিয়ে। এমন াক হাউস অব্ লর্ডসে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডকে সরকারীভাবে সমর্থন করা হোলো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই স্পর্ধায় সেদিন সমগ্র ভারতের মর্মস্থল ক্রুদ্ধ আক্রোশে কম্পিত হ'য়ে উঠেছিল। গান্ধীজী বিপ্লবের সংকেত দেখলেন দেশের আকাশে-বাতাসে। তখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি গান্ধীজীর প্রীতি যথেষ্ট পরিমাণে

বিদ্যমান ছিল, তাই জাতীয় জীবনের মহামুহূর্তেও অকস্মাৎ তাঁর অহিংসার আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠলো। (মাত্র একবৎসর আগে পর্যন্ত তিনি তাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেবার হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন!) তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর একটি বিরাট ভুল হ'য়ে গেছে—"a blunder of Himalayan dimensions which had enabled ill-disposed persons, not true passive registers at all, to perpetrate disorders." দেশের গণ-জাগরণকে কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই নয়, দেশের পুঁজিবাদীরাও ভয় করতো। এবার তারা-ও ভীত হ'য়ে উঠলো। তাদেরই মর্মবাণী গান্ধীজীর মুখে ধ্বনিত হোলো মাত্র। বৃটিশ সরকার তার রক্তাক্ত হাতখানা কংগ্রেসী নেতাদের দিকে এগিয়ে দিলো। কংগ্রেসী নেতারা সাগ্রহে তা জাপটে ধরলেন। ১৯১৯ এর ডিসেম্বর মাসেও তাই গান্ধী-প্রমুখ নেতাদের আমরা মণ্টফোর্ড সংস্কার গ্রহণের জন্যে উপদেশ দিতে দেখি। দেশকে বিপ্লবের পথে নয়, শান্তি ও সহযোগিতার পথেই স্বায়ত্তশাসন আয়ত্ত করতে হবে, এই কথা বলা হয়।

কিন্তু ভারতের জনসাধারণ সেদিন জেগেছিল, কেবল স্বাধীনতা-তত্ত্বের দায়ে নয়, অভাব-অনটনের দায়ে। তাই বুর্জোয়া রাজনীতিকদের তত্ত্বকথা তারা শুনলো না। ১৯১৯ সালে শ্রমিকদের যে দেশব্যাপী অসন্তোষ শুরু হয়েছিল, তা ১৯২০ এবং ১৯২১ সালেও ক্রমেই তীব্রতর ব্যাপকতর হ'তে লাগলো। ১৯২০র শেষের দিকে যে অর্থ-নীতিক সংকট শুরু হোলো, তা শ্রমিক অসন্তোষে দিলো আহুতি। ১৯২০র প্রথম ছয় মাসে শ্রমিক বিক্ষোভ চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছিল। ঐ সময় প্রায় দুইশত ধর্মঘট হয় এবং প্রায় পনের লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে যোগ দেয়। এই সময়ের বিক্ষুব্ধ দেশের অবস্থা এবং তার বুর্জোয়া নেতৃত্বের মধ্যে ব্যবধানটি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাতে লজপৎ রায় তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেন:

"It is no use blinking the fact that we are passing through a revolutionary period.. (But) we are by instinct and tradition averse to revolutions."

এখানে দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এক উভয় সংকটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার সম্মুখে যে-পথ বিস্তারিত তা ছিল ক্ষুরধারের মতো সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক। একদিকে গণবিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের শ্বাপদসংকুল অরণ্য। গান্ধীজীই দেশীয় বুর্জোয়াদেরকে তাদের এই ক্ষুরধার পথ দিয়ে সন্তর্পণে নিয়ে

চললেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে গিয়ে উঠলেন না, চললেন সমুদ্রপথে, সমুদ্রের একান্ত প্রান্তভাগ দিয়ে,—এমন একটা অবস্থায়, যদি উত্তাল তরঙ্গ ধেয়ে আসে, তবে যেন একলাফে গিয়ে তাঁদের পক্ষে সাময়িকভাবেও অরণ্যের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয়। তাই আমরা দেখি গান্ধীজী জনসাধারণের নেতৃত্ব নিয়ে সেদিন যে সংগ্রাম শুরু করলেন, তার মধ্যে যেমন সংগ্রামের ভাব রইলো, তেমনি রইলো সহযোগিতাব,—তা যেমন হোলো অসহযোগী, তেমনি হোলো অহিংস্রক। এই বৈপরীত্যের সংযোগ ও সামঞ্জস্যসাধনই ছিল বুর্জোয়াদের উভয় সংকট থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। গান্ধীজীর অসামান্য প্রতিভাই তাকে সেদিন সম্ভব করেছিল। একদিকে তিনি যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বারে বারে ঘা দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে বারে বারে ঘা দিলেন ভারতীয় জনসাধারণকে। এবং এই উভয় প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বুর্জোয়ারা তাদের ভারসাম্য বজায় রাখলো।

এদিকে মুসলমান বুর্জোয়ারাও সহযোগিতাব পথ থেকে সংগ্রামের পথের দিকে আসতে বাধ্য হোলো। মুসলমান বুর্জোয়াদেব সংগ্রামশীল অংশ যুদ্ধকালে কারাগারে ছিলেন। এবং সেই সুযোগে নরমপন্থী মুসলমান বুর্জোয়াবা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছিল এবং স গ্রামী জনসাধারণকে বোঝাচ্ছিল যে, ধর্মের জন্যে—খিলাফৎ স্বার্থরক্ষাব খাতিরেই তাবা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। কিন্তু বৃটিশ সরকাব খিলাফৎ সংক্রান্ত শর্তগুলি মানতে চাইলো না। যুদ্ধশেষে চরমপন্থী মুসলমান বুর্জোয়া নেতারাও একে একে বাইরে আসতে লাগলেন। এদিকে হিন্দু জনসাধারণের মতোই মুসলমান জনসাধারণেরও আর্থিক দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ছাড়া মুসলমান বুর্জোয়াদেরও আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। কাজেই হিন্দু ও মুসলমান বুর্জোয়ারা হাতে হাত মেলালেন। খিলাফৎ আন্দোলনকে হিন্দুরা তাদের নিজেদের আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করলো। (এ প্রসংগে স্মরণীয়, খিলাফতের বিষয়টি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক। তুরস্কের স্থানীয় জনসাধারণ একদিন স্বহস্তে খিলাফতের উচ্ছেদ করেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে প্রাচীন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ তুরস্কের জনসাধারণ তাদের সুযোগ্য নেতা মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তুরস্কের সুলতান ও খলিফা ষষ্ঠ মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আবদুল মজিদকে কেবল খলিফা হিসাবে রাখেন। আবদুল মজিদের রাষ্ট্রীয় অধিকার আর কিছুই থাকে না। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে তুরস্কের জনসাধারণ আবদুল মজিদকেও বিতাড়িত করেন এবং খিলাফতের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ঘটে।) ইতিপূর্বে

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আলি ভাইএরা* তাঁদের খিলাফৎ ইস্তাহার জারী করেছিলেন। এই ফতোয়া অনুযায়ী আলি ভাইরা এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে খিলাফৎ কমিটি ক্রমেই গান্ধীজী এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রভাবে আসে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আবুল কালাম আজাদ কারাগার থেকে মুক্ত হন। তিনিও অকৃপণ অকুণ্ঠিতভাবে এই খিলাফৎ এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। আজকের ক্ষীণ, কর্মক্লান্ত, ভগ্নপ্রায় মানুষটিকে দেখে সেদিনের সেই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের অগ্নিদৃপ্ত যুবককে কল্পনা করা যায় না। ১৯২০-র মে মাসে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির যে সম্মেলন হোলো, তাতে গান্ধী প্রস্তাবিত অসহযোগ সূচী গৃহীত হয়। পরের মাসেই এলাহাবাদে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নেতাদের একটি মিলিত সভায় এই প্রস্তাবকে করা হোলো সমর্থন। সমগ্র ভারতবর্ষ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমাসন্ন সংগ্রামের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এই সময় এলো ভারতীয় মুসলমানদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট তারিখে খিলাফৎ-বিরোধী সেভরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হোলো। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাতেও অসহযোগের নীতি গৃহীত হোলো এবং উদ্দেশ্যরূপে ঘোষিত হোলো ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা এবং খিলাফতের দাবী-পূরণ।

মওলানা মহম্মদ আলি এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ ভগ্নমনোরথ হ'য়ে ১৯২০-র অক্টোবর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বোম্বাই-এ নেমেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন।

১৯১৯-এর নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে নভেম্বর মাসে ছিল আইন সভার নির্বাচন। জনসাধারণের একটি সুবৃহৎ অংশ এই নির্বাচন বর্জন করলো। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বয়কটও যথেষ্ট পরিমাণে সফল হোলো। তবে আইন-ব্যবসায়ীদের আদালত-বয়কট আশানুরূপ সফল হোলো না—মতিলাল নেহেরু এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মতো মাত্র কয়েকজন লোকই আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করলেন।

১৯২০-র ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হোলো, তাতে

* ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা কারামুক্ত হন। তাঁরা দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক থাকায় ভারতীয় জনসাধারণের কাছে তাঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রচুর হয়। এমন কি হিন্দু জনসাধারণ অনেক সময় গান্ধীজীকে কৃষ্ণের এবং আলি ভাইদের ভীম ও অর্জুনের অবতার ব'লে বর্ণনা করতেন।

সংগ্রামের এই নূতন সূচী প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হোলো। কংগ্রেসের আদর্শেও এলো পরিবর্তন। গঠনতান্ত্রিক উপায়ে সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্থলে এবার লক্ষ্য হোলো শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ পথে স্বরাজ লাভ। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের সংগঠনে যে শৈথিল্য ছিল, এবার তা সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রে তাকে সুদৃঢ় সংঘবদ্ধ ক'রে আধুনিক দলীয় যন্ত্রের আকার দেওয়া হোলো। একটি স্থায়ী পরিচালক কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটির হোলো উদ্ভব। কংগ্রেসের সভ্যরা সুদূর গ্রামে গ্রামান্তরে সর্বত্র ছড়িয়ে রইলো। কংগ্রেসের নূতন কর্মসূচীর প্রবর্তন করলেন গান্ধীজী স্বয়ং। এইরূপে তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে পরিণত হোলো।

কিন্তু এই সংগ্রামের স্বরূপ কি, কর্মসূচী কি, তা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হোলো না। আইন অমান্যের মধ্যে জাতির ক্ষিপ্ত অসন্তোষ কেবলমাত্র খানিকটা ছাড়া পেলো। জাতীয় নেতারাও তার বেশি কিছু করলেন না। গান্ধীজী তাঁর শিশু-সুলভ সারল্যের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, এক বৎসর বাদে অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষ নিশ্চয় স্বরাজ পাবে। জনসাধারণ নিঃসংশয়ে তাঁর কথাগুলিকে গ্রহণ ক'রে সেই পবিত্র দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু তরুণ নেতাদের মন থেকে সংশয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হোলো না। তখনকার রাজনীতির তরুণ উৎসাহী ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চাইলেন, গান্ধীজীর যুদ্ধের কর্মসূচী কি, সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে ভারতবর্ষ তার স্বাধিকার লাভ করবে। কিন্তু গান্ধীজীর তেমন কোনো সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তাই সুভাষচন্দ্র হতাশ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থে বর্ণনা করেন :

"What his real expectation was I was unable to understand. Either he did not want to give out all his secrets prematurely or he did not have a clear conception of the tactics whereby the hands of the Government could be forced."

গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পনা গোপন রেখেছিলেন, একথা কল্পনা করাও অন্যায়। কারণ, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী জীবনে গোপনতার—অর্থাৎ মিথ্যাশ্রয়ের বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। তাঁর যুদ্ধের সকল পরিকল্পনাই তিনি শত্রুপক্ষকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেন। এবারেও যদি তাঁর সুনির্দিষ্ট কোনো সূচী থাকতো, তবে তিনি তা দেশের জনসাধারণকে তো জানতেন-ই এবং সরকারও সে বিজ্ঞপ্তি থেকে বাদ পড়তো না। তাই বুঝি

গান্ধীজী বলেন, সত্যাগ্রহ 'সার্চলাইটের' মতো। সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহের পথে যেমন অগ্রসর হন, তাঁর আত্মার আলোতে তাঁর সম্মুখের পথটুকু তেমনি আলোকিত হ'য়ে উঠতে থাকে। সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গান্ধীজীর "উৎফুল্ল অস্পষ্টতার" কথা জহরলাল নেহরুও তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন :

"It was obivious that to most of our leaders Swaraj meant something much less than independence. Gandhiji was delightfully vague on the subject, and he did not encourage clear thinking about it either."

যাই হোক, জনগণের বিক্ষোভের বাষ্পে জাতীয় আন্দোলন গতিশীল হ'য়ে উঠলো এবং তা দুরন্ত বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হোতে লাগলো। আমরা শীঘ্রই লক্ষ্য করবো, এই বেগবান আন্দোলন-যন্ত্রকে কোন্ পথে চালিত করতে হবে, দেশীয় নেতাদের সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায়, বা যে ধারণা ছিল তার মধ্যে স্বত-বিরুদ্ধতা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায়, আন্দোলন আপনার প্রচণ্ড গতিবেগে এমন একটি স্থানে এসে পৌঁছলো, যেখানে ভয়ার্ত চালক অকস্মাৎ আর্তনাদ ক'রে সমস্ত শক্তিতে ব্রেক কশে' ধরলেন। ফলে, জাতীয় আন্দোলনের বাষ্পীয় শকট কেবল থমকে থেমে দাঁড়াল না, তা আকস্মিক আঘাতে গেলো থেৎলে, হোলো খণ্ড-বিখণ্ড, বহু সম্প্রদায়ে, বহু দলে, শতধা-বিভক্ত।

১৯২১ সালে আন্দোলন ক্রমেই এগিয়ে চললো। তা কেবল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই প্রকাশ পেলো না। তার পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কৃষাণ এবং শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হ'য়ে উঠলো। আসাম-বেংগল রেলওয়ের শ্রমিকরা করলো ধর্মঘট, মেদিনীপুরে শুরু হোলো 'No-Tax' অভিযান, দক্ষিণ ভারতে ও মালাবারে ঘটলো মোপলা বিদ্রোহ। পাঞ্জাবে ধনী-মোহান্ত শাসিত সরকার সমর্থিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পবিত্র ক'রে তোলার জন্যেও শুরু হোলো আকালি আন্দোলন। এমনিভাবে আন্দোলন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে এক অপূর্ব পরিণতির দিকে অগ্রসর হোলো। সাম্রাজ্যবাদী সরকার গেলো ঘাবড়ে; প্রথমটা তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেলো। তারপর স্থির করলো, ইংল্যাণ্ডের রাজাকে বা কোনো রাজবংশীয়কে দেখলে ইংরেজরা যেমনভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ভারতীয়রাও তেমনি ওই মনুষ্যবিগ্রহদের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে পড়বে। তাই ব্যবস্থা হোলো, ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আসবেন এবং মহাসমারোহে ভারত-প্রদক্ষিণ করবেন। কিন্তু তার ফলটা হোলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৭-ই

নভেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে ভারতবর্ষ অভ্যর্থনা জানালো দেশময় ব্যাপক হরতালের মধ্য দিয়ে। গভর্নমেণ্ট এতোটা আশা করে নি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জীবন্ত প্রতীকের এই লাঞ্ছনায় তারা অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো, ভারতীয়রাও সরকারের নির্যাতনকে নির্বিবাদে নীরবে সর্বত্র সহ্য করলো না। অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রাম শোণিতাক্ত হ'য়ে উঠলো।

দেশে গ'ড়ে উঠলো জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই স্বেচ্ছাসেবক দলগুলি কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের অহিংস অসহযোগের ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠলেও, সেগুলির অধিকাংশই সামরিক কায়দায় সংঘবদ্ধ হোলো। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর এই বিপুল দুর্দম সংঘবদ্ধতা সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তুলেছিলো। নির্যাতনের সমস্ত অস্ত্র দিয়ে সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির বিরোধিতা করলো। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হোলো, হাজারে হাজারে মানুষ গ্রেফ্‌তার হোলো, কিন্তু আবার হাজারে হাজারে নূতন মানুষ এসে বন্দীদের শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা নিয়ে দাঁড়ালো। আতঙ্কগ্রস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর্তনাদ ক'রে উঠলো। সে আর্তনাদ ধ্বনিত হোলো ষ্টেটসম্যান এবং ইংলিশম্যান পত্রিকার পাতায়। ঐ পত্রিকাগুলি চেঁচাতে লাগলো, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কলিকাতা দখল ক'রে নিয়েছে, সরকার সেখানে সিংহাসনচ্যুত, চাই আশু সাহায্য, চাই অনমনীয় সংরক্ষণ-ব্যবস্থা।

প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনের কালে যে দুই-একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটেছিল, গান্ধীজী তীব্র ভাষায় সেগুলির নিন্দা করেছিলেন। বলেছিলেন, স্বরাজের দুর্গন্ধ তিনি পাচ্ছেন। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এখন একমাত্র আশা ছিলেন তিনি: হয়তো এই অহিংসার দার্শনিক ভারতের বিপুল স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে চূড়ান্ত সংগ্রামের পথে অগ্রসর হ'তে দেবেন না,—কারণ, সংগ্রাম শুরু হোলে হিংসাত্মক কার্য যে কিছু পরিমাণে ঘটবে-ই, তা ছিল সম্পূর্ণ অবধারিত, ইতিপূর্বেই তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছিল। তাই সরকার সতর্কভাবে গ্রেফ্‌তার চালাতে লাগলো। চরমপন্থী নেতাদের সবাইকে একে একে ধরা হোলো। কিন্তু সরকার সাবধানে সন্তর্পণে গান্ধীজীকে এড়িয়ে গেল। গান্ধীজীই একমাত্র মানুষ, যিনি এই বিপুল জনতার যন্ত্রকে সংযত রাখতে পারেন। তাঁর অবর্তমানে দেশের সর্বত্র এই বিপুল বিক্ষুব্ধ বাহিনীকে স্থির রাখা ছিল সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দেশের প্রায় সকল চরমপন্থী নেতাদের গ্রেফতার করা হোলো। সরকারী জেলগুলি উপছে পড়ছিল। ১৯২২-এর গোড়ায়

দিকে বন্দীর সংখ্যা ত্রিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ালো। দেশময় একটা স্তম্ভিত তীব্র উত্তেজনা স্পন্দিত হ'তে লাগলো। অবরুদ্ধ শ্বাসে দেশ প্রতীক্ষা করতে লাগলো গান্ধীজীর অঙ্গুলি সংকেতের। স্পন্দনের প্রতিটি তরঙ্গ গান্ধীজীর অনুভূতিশীল অস্তিত্বে এসে ঘা দিচ্ছিল। বৃটিশ সরকারের মতোই গান্ধীজীও ভীত হ'য়ে উঠলেন। তিনি দেখলেন, ঈশানের আকাশে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে কালবৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ মেঘ। বর্ষণ আসবে। কিন্তু কেবল বর্ষণ তো নয়, সেই সঙ্গে আছে ঝটিকার হাহা শ্বাস, বজ্রের হুংকার, বিদ্যুতের অগ্ন্যুদ্গার, করকার সম্পাত। দুরু দুরু বক্ষে সে-দিন গান্ধীজী যেন মনে মনে ব'লে উঠলেন, না না, বর্ষণের প্রয়োজন নেই; ঈশানের পুঞ্জীভূত ঐ মেঘ আকাশে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক, তৃষিত শস্যহীন রিক্ত ধরিত্রী শুকিয়ে মরুক, শুকিয়ে মরুক। সত্যই, এ সংগ্রাম তো তিনি কল্পনা করেন নি! তিনি স্বপ্ন-চক্ষে যে সংগ্রাম কল্পনা করেছিলেন, সেই দার্শনিক, কাব্যিক সংগ্রামের সঙ্গে এর সাদৃশ্য কই? এ তো সত্যাগ্রহীর বাহিনী নয়, এ যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ক্ষুধিত করের কঙ্কাল অযুত নখর বিস্তার ক'রে রয়েছে,—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নিষ্করুণভাবে ছিন্নভিন্ন ক'রে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে, আর সেই সঙ্গে গান্ধীজীর ত্যাগ, ক্ষমা ও অহিংসার মন্ত্রকেও। কম্পিত পদে গান্ধীজী পেছনে স'রে গেলেন। তাঁর সঞ্জীবন-মন্ত্র আজ যাকে জাগিয়েছে, তাকে তো তিনি চান নি। তাকে যে তিনি দানব ব'লে চিরদিন ভয় ক'রে এসেছেন!···

গান্ধীজীর এই পশ্চাতে পদক্ষেপ প্রথম সূচিত হোলো আমেদাবাদ কংগ্রেসে। আমেদাবাদ কংগ্রেস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বাক্যত ঘোষণা করলেও, চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশ দিলো না। চরমপন্থী নেতারা কারাগারে থাকায় কংগ্রেসের সংগ্রামশীলতা প্রচুর পরিমাণে ব্যাহত হোলো। রিপাবলিকান মুসলমান নেতা হজরৎ মোহানী যখন 'স্বরাজ'কে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি ব'লে ঘোষণা করলেন, গান্ধীজী তখন করলেন তার প্রতিবাদ। ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে পরিকল্পনা ছিল, চূড়ান্ত সংগ্রামের সময়ে ট্যাক্স-বন্ধের অভিযানও চলবে। কিন্তু আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন ট্যাক্স-বন্ধের এই বিষয়টিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলো।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবার আশার ক্ষীণ আলোক দেখতে পেলো। আমেদাবাদ কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে বড়লাট ভারত সচিবের কাছে ঐ সময় তার ক'রেছিলেন:

······"Gandhi had been deeply impressed by the rioting at Bombay as statements made by him at the time had indicated, and the

rioting had brought home to him the dangers of mass civil disobedience ;" খিলাফত দলের এক অংশ অহিংসার পথ ত্যাগ করতে বলেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজী হন নি, সে-সংবাদও ঐ তারে সানন্দে বড়লাট ভারত-সচিবকে জানালেন। আরো জানালেন যে, আমেদাবাদ কংগ্রেস তাঁদের প্রস্তাবে ট্যাক্স বন্ধের কোনো উল্লেখ করেন নি। (..."ommited any reference to the nonpayment of taxes ")

কিন্তু বিপ্লবের উত্তেজনায় মানুষ অধীর হ'য়ে উঠেছিল। যুদ্ধকে এখন আর কেবল মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের মধ্যে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা সম্ভব ছিল না। ভারতের কোটি কোটি কৃষাণও এবার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে এসে দাঁড়াতে চাইলো। বিভিন্ন জেলা থেকে গান্ধীজীর কাছে কেবলই আবেদন অনুরোধ আসতে লাগলো, অবিলম্বে ট্যাক্স-বন্ধের অভিযান শুরু হোক। দেশময় ট্যাক্স-বন্ধ অভিযানের অর্থ কি, গান্ধীজী বেশ বুঝলেন। দেশের জমিদার ও ধনিকদেরও স্পষ্ট বুঝতে বাকী রইলো না যে, এই অভিযানের ফলে কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে না, সারা দেশে কৃষাণ-শক্তি হয়ে উঠবে সংঘবদ্ধ, ট্যাক্স-বন্ধের অংশরূপে বন্ধ ভূমি-রাজস্ব, জমিদারী প্রথার হবে উচ্ছেদ—যা দেশের ধনিক শ্রেণী কোনো মতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু ট্যাক্স-বন্ধের অভিযানে অনুমতি না দেওয়ার বিপদও তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন। কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতেই গুণ্টুর জেলায় ট্যাক্স-বন্ধের অভিযান শুরু হ'য়ে গেলো। সংগ্রামের নেতৃত্ব যে বুর্জোয়াদের আঙুলের ফাঁকে কৃষাণ ও শ্রমিকদের হাতে চ'লে যাচ্ছে, এ-কথা বুর্জোয়া নেতারা আতঙ্কের সঙ্গে অনুভব করলেন। গুণ্টুর জেলার উপর অবিলম্বে উপরওয়ালা কংগ্রেসের হুকুম হোলো, আইনত সমস্ত ট্যাক্স মিটিয়ে দিতে। কিন্তু কংগ্রেস এবং গান্ধীজী ভয় পেলেন যে, দেশের এই উত্তেজিত অবস্থায় তাদের বৈপ্লবিক গতিকে কঠিন হস্তে প্রতিরোধ করাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাঁরা আবিষ্কার করতে চাইলেন একটা সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌, একটা ভ্যাকুয়ম ব্রেক—যার পথে দেশের বিপ্লবের প্রচণ্ড পুঞ্জীভূত বাষ্পকে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে শিথিল এবং শূন্য করা সম্ভব হবে। অহিংসার নামেই এই মহৎ কার্যটি সম্পন্ন হ'তে চললো। স্থির হোলো, বারদৌলি জেলাতেই এই ট্যাক্স-বন্ধের অভিযান প্রথমে শুরু হবে। ঐ সময় বারদৌলির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৮৭,০০০—অর্থাৎ ঐ সময়ের ভারতীয় জনসংখ্যার হাজার ভাগের চার ভাগ!

পরিকল্পিত বারদৌলি সত্যাগ্রহের কথা ভারতীয় বিপ্লবী জনসাধারণকে জানানো হোলো। প্রতারিত জনসাধারণ তাদের নেতাদের উপর স্থির নির্ভরে প্রতীক্ষা করতে

লাগলো। ১৯২২-এর ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে গান্ধীজী বড়লাটের কাছে তাঁর সত্যাগ্রহী কায়দায় চরমপত্র পাঠালেন। কিন্তু এর মাত্র কয়েকদিন পরেই দেশীয় নরমপন্থী বুর্জোয়া নেতাদের একটা সুযোগ মিলে গেলো। যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরা গ্রামে জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের বাধলো সংঘর্ষ। ফলে, জনতা পুলিশের ফাঁড়ি পুড়িয়ে দিলো এবং বাইশ জন পুলিশ নিহত হোলো। এর মধ্যে জনতার জয় সূচিত হয়েছিল। এই সংবাদ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী অনুভব করলেন, আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশের সর্বত্রই হাজার হাজার চৌরিচৌরা অনুষ্ঠিত হবে, গান্ধীজীর অহিংসা যাবে ভেসে, সহযোগী বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব হবে লুপ্ত, বিপ্লবের নিষ্করুণ রক্তাক্ত পথে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জন করবে। ১২-ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হন্তদন্তভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি মিটিং ডাকা হোলো, তাতে "চৌরিচৌরায় জনতার অমানুষিক কার্যাবলী"র করা হোলো তীব্র নিন্দা। গান্ধীজী কঠিন হস্তে বিপ্লবের ব্রেক ক'শে ধরলেন। কেবল ব্যাপক আইন অমান্য নয়, অবিলম্বে সকল প্রকার আইন অমান্যই বন্ধ ক'রে দেওয়া হোলো, অজুহাত দেখানো হোলো, অহিংস সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত নয়।

সমস্ত ভারতবর্ষ হতবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো। মতিলাল নেহরু, লজপৎ রায় প্রভৃতি নেতারা কারাগার থেকে গান্ধী এবং গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। গান্ধীজী তাঁদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করলেন না, জানালেন, কারারুদ্ধ নেতাদের কোনো নাগরিক অধিকার নেই, তাঁদের উপদেশ শ্রোতব্য নয়—তাঁরা 'civilly dead.'

এমনিভাবেই সেদিন নিতান্ত খাপছাড়াভাবে ভারতীয় সংগ্রামের এক অধ্যায় সমাপ্ত হোলো। রজনী পাম দত্তের ভাষায় "The battle was over. The whole cam|aign was over. The mountain had indeed borne a mouse."

সংগ্রামকে এমনি আকস্মিকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ায় দেশময় প্রচুর বাকবিতণ্ডা, অসন্তোষ, বিক্ষোভ দেখা গেলো। গান্ধীজী নিজের এই কাজে যে সহজে খুশী হ'য়েছিলেন, তা-ও বলা যায় না। কারণ, এর পরেই আমরা গান্ধীজীর মধ্যে কারাবরণের জন্যে একটি উদগ্র আগ্রহ লক্ষ্য করি। গান্ধীবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও সমর্থক রোমাঁ্যা-রোলাঁ-ও গান্ধীজীর ঐ সময়কার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন: "তিনি কাতরভাবে বন্দীত্বই কামনা করিতেছিলেন।··তিনি বলেন, কারাগার তাঁহাকে 'শান্তি' ও 'বিশ্রাম' দিবে। সম্ভবত, এই বিশ্রামেও তাঁহার

প্রয়োজন ছিল।" কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ সময় তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ছিল শহীদত্বের। তিনি আকস্মিকভাবে বেগবান যুদ্ধাশ্বের বল্গা আকর্ষণ ক'রে দেশবাসীকে যে আঘাত দিয়েছিলেন, তাকে মহিমান্বিত ক'রে তোলার জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল আত্ম-নির্যাতনের। কারাবরণের মধ্যেই ছিল এই আত্ম-নির্যাতনের সুযোগ। এবার সরকারও তার সুবিধামতো গান্ধীজীকে সে সুযোগ দিলো। ১০ই মার্চ তারিখে তিনি বন্দী হলেন। বিচারে তাঁর ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হোলো।

গান্ধীজী দুই বৎসরের কম কারাগারে ছিলেন। তিনি কারাগারের বাইরে এসে দেখলেন, ভারতের বিশাল প্রান্তরে বিপ্লবের যে মহাসৌধ তিনি নির্মাণ ক'রেছিলেন, সারা দেশে আজ তার ভগ্নস্তূপ প'ড়ে রয়েছে—সেখানে অজস্র অবাঞ্ছিত লতাগুল্ম জন্মেছে, তা হয়েছে অসংখ্য শ্বাপদ সর্পের বাসা!

জানি না, দেশব্যাপী বিপ্লবের মর্মান্তিক ধ্বংসস্তূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর সেদিন কী মনে হয়েছিল, সেদিন আবার ঐ মহাসৌধকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন কিনা! তবে, ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে তাঁকে অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল, তা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

॥ তেরো ॥

আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় বুর্জোয়াদের বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তা খ্রীস্টান ধর্মবিরোধী গোঁড়ামিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এখন গান্ধীজী এবং সহযোগী বুর্জোয়ারা যখন একান্ত আকস্মিক ভাবেই সংগ্রামের বল্গা আকর্ষণ করলেন, তখন বৃটিশ-বিরোধ এবং স্ব স্ব ধর্মপ্রীতির ভারসাম্য আর রইলো না। হিন্দু এবং মুসলমান বুর্জোয়াদের বিরাট দুই অংশ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিলো। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু-মহাসভার ঘটলো উত্থান।[১] মুসলিম লীগও নিজেকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করলো। দেশে প্রবল হ'য়ে উঠলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। দেশের জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী শক্তিকে অকস্মাৎ অবরুদ্ধ করায় তা আত্মকলহে পরিণত হোলো। বৃটিশ-বিরোধী হিংসার দমনই সাম্প্রদায়িক আত্মঘাতী হিংসার রূপ গ্রহণ করলো। কেবল এই একবারই নয়, বর্তমান কালে যতোবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছে, প্রতিবারই তার পশ্চাতে ছিল জনসাধারণের এই বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী শক্তি এবং বুর্জোয়া নেতৃত্বের কাপুরুষ স্বার্থান্ধ সহযোগিতা। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুও সাম্প্রদায়িক কলহের এই কারণকে তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে একরকম স্বীকার ক'রে নিয়েছেন :

"The drift to sporadic and futile violence in the political struggle was stopped, but the suppressed violence had to find a way out, and in the following years this perhaps aggravated the communal trouble."

ইতিমধ্যে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে নবজাগ্রত তুরস্ক আবদুল মজিদকে দূর ক'রে খিলাফতের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। ফ'লে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারা যে সামন্ততান্ত্রিক কারণটিকে তাঁদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার কারণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা আর রইলো না। খিলাফতের প্রতি নবজাগ্রত তুরস্কের ঘৃণা এবং ভারতীয় মুসলমানদের প্রীতি এমন একটা বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যাতে মোসলেম বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং মুসলমান নেতারা জনসাধারণের কাছ থেকে নিজেদের এই প্রতিক্রিয়াশীল হাস্যাস্পদ রূপটিকে

---

১ এই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানটি যে একদা গান্ধীজীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়। এ-ও স্মরণীয় যে জনসাধারণের সংগ্রামী শক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে একদা গান্ধীজীই পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিলেন।

গোপন করার জন্যে জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে লাগলেন যে, হিন্দুরাই মুসলমান জনসাধারণকে প্রতারিত করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিন্দুমহাসভাও ঠিক ওই একই কৌশল অবলম্বন করলো। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের অনেকেই, বিশেষত জমিদার শ্রেণী,—রাজস্ব বন্ধের অভিযান বন্ধ করা যাঁদের জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল,—তাঁরাও কংগ্রেসকে তিরস্কৃত করলেন। তিরস্কারের কারণ অবশ্য আসলে ছিল বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম নয়,—বৃটিশ-বিরোধী মোসলেম-বিরোধী সংগ্রামের ছদ্মবেশে হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা।

কংগ্রেসের অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ, যাঁরা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা চান, অথচ হিন্দুমহাসভা বা মুসলেম লীগের মতো সামন্ততান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে চান না, তাঁরাও দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেলেন। একদল গান্ধীজীর নেতৃত্বে বা তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রিয় শিষ্য রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্রভৃতির পরিচালনায় সংস্কারমূলক কাযে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন। সংস্কারমূলক কাযের মধ্যে প্রধান ছিল 'গ্রামোন্নয়ন', চরকায় সূতা কাটা, পাননিরোধ, অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি। পূর্বে বৃটিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার যে নীতিকে কংগ্রেস বর্জন করেছিল, এঁরা এখনো সেই নীতিকে বর্জন করতে চাইলেন, অর্থাৎ আইন সভায় বা শাসনকাযে যোগদানের বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাই এঁদের নাম হোলো No-changers. অন্যপক্ষে, চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরু প্রভৃতির নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসী আইনসভায় যোগ দিতে চাইলেন। কারণ হিসাবে তাঁরা দেখালেন "uniform and consistent obstruction," এই দলের নাম হোলো Pro-changers. Pro-changers বা পরিবর্তনপন্থীরা কংগ্রেসের মধ্যেই স্বরাজ্য দল গঠন করলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে স্বরাজ্যদলের কাছে কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোলো। সাময়িকভাবে গান্ধীজী রাজনীতির পুরোভাগ থেকে পশ্চাতে স'রে এলেন।

স্বরাজ্যপন্থীরাও আবার গণদেবতার নাম নিতে লাগলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করলেন, "শতকরা ৯৮ জনের স্বাধীনতা" চাই। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, জমিদারদের প্রতি যদি অবিচার হয়, তবে সে ন্যায়-বিচারের কোনো মূল্যই নেই—"...poor indeed will be the quality of that justice, if it involves any injustice to the landlord."

অবিরাম প্রতিরোধের উচ্চাদর্শ প্রচার ক'রে স্বরাজ্যদল জনসাধারণের ভোটের

জোরে আইনসভায় ঢুকে পড়লো। অবশ্য, আইনসভায় ঢুকেই তাদের কণ্ঠে বাজলো বেসুরো। দলের নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করলেন : "His party has come there to offer their co-operation." নরমপন্থী উদারনীতিকরা, যাঁরা সংগ্রামের সূচনায় কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও স্মিতহাস্যে কর প্রসারিত ক'রে এগিয়ে এলেন, জানালেন, তাঁদের সঙ্গে, স্বরাজ্যদলের সঙ্গে আর কোনো মতান্তর নেই। এইভাবে কংগ্রেসের এই অংশটিও সংগ্রামের প্রশস্ত রাজপথ ত্যাগ করলো।

ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন এইভাবে খণ্ডবিখণ্ড, দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, তখন বৃটিশ তার শোষণ ও শাসনের রজ্জুটিকে কঠিন হস্তে কসে ধরলো। এলো কারেন্সি বিল, যার ফলে টাকার দাম হোলো এক শিলিং ছ পেন্স। এলো ১৯২৭-এর নয়া স্টীল প্রটেক্শন বিল। সংগ্রামের অব্যবহিত পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি কৃপাকটাক্ষের যে ভান ক'রেছিল, তার ফলরূপে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত হ'য়েছিল স্টীল প্রটেকশন আইন। এই আইন অনুসারে ভারতীয় লৌহ-শিল্পকে বাইরের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা ক'রে গ'ড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছিল। এখন বৃটিশ-ইস্পাতকে সেই সংরক্ষণ থেকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা হোলো। বৃটিশের এই অকৃতজ্ঞতায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা হোলো ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝেছিল, ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই ছিন্নভিন্ন অবস্থাতেই তাকে হীনবল করা প্রয়োজন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ঘোষিত হোলো যে, ভারতের নয়া গঠনতন্ত্রের ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে আসছেন সাইমন কমিশন। ভারতীয় বুর্জোয়াদের অপমান এবার দুঃসহ হ'য়ে উঠলো, কারণ অকৃতজ্ঞ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই কমিশনে ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোনো প্রতিনিধিই গ্রহণ করলো না। সুতরাং, ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো, কাজেই আবার তারা একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জনগণের দোরে ধর্না দিলো।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে জনগণের মধ্যে অনেকখানি প্রকৃতিগত পরিবর্তন এসেছিল। দেশের কৃষাণ ও মজুররা নিজেদের নেতৃত্বে সংগ্রাম করার জন্যে হ'য়ে উঠছিল সংঘবদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদও সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল। সুতরাং আসন্ন শ্রমিক বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্যে তারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। তার প্রমাণ মিলেছিলো ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায়। ১৯২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস্ পার্টির কর্মতৎপরতার মধ্যে দেশের সংগ্রামী শক্তি আত্মপ্রকাশ করলো। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে দেশময়

গণ-বিক্ষোভ দেখা দিলো বিপুলায়তন শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে এই শ্রমিক শ্রেণীই সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালো। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদেরই হোলো জয়। সমাসন্ন গণবিপ্লবের এই উত্তপ্ত চেতনা তরুণ বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যেও সংক্রামিত হোলো। ইউরোপ থেকে সদ্য-প্রত্যাগত পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সোস্যালিস্ট হ'য়ে উঠলেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র বসু। তরুণ বুর্জোয়া নেতারা অকস্মাৎ কৃষাণ-শ্রমিকের আন্দোলনে মেতে উ'লেও তন্দ্রাত্যাগী ভারতীয় গণশক্তিকে শ্রমিক-বিপ্লবের পথ থেকে বুর্জোয়া-আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে আনার শক্তি তাঁদের মধ্যেই নিহিত আছে, তা প্রধান বুর্জোয়া নেতারাও অনুভব করলেন। এবং এই অনুভূতি ও দূরদৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো স্বয়ং গান্ধীজীর মধ্যে—যখন ১৯২৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন প্রত্যাখ্যান ক'রে সেখানে সাদরে স্থাপিত করলেন পণ্ডিত জহরলালকে, এবং ঘোষণা করলেন :

"He is modest and practical enough not to turn to extremes. In his hands the nation is perfectly secure." নেশন, অর্থাৎ ভারতীয় বুর্জোয়ারা।

এইভাবে জাগ্রত গণশক্তিকে বুর্জোয়া নেতারা যেমন একদিকে নিজেদের করায়ত্ত রেখে সংযত করতে চাইলেন, তেমনি অন্যপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক আন্দোলনকে পঙ্গু ও নেতৃত্বহীন ক'রে দেওয়ার জন্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্রমিক নেতাদেরও করলো গ্রেপ্তার।[১] (তরুণ বুর্জোয়া সোস্যালিস্টদের তারা অঙ্গস্পর্শ করলো না, কারণ, এঁরা যে গণ-শক্তির সেফ্‌টি ভাল্‌ভ মাত্র, তা ভারত সরকার ভালো ভাবেই বুঝতো।) মীরাটে ধৃত শ্রমিক নেতাদের বিনা বিচারে দীর্ঘ চার বৎসর কাল অবরুদ্ধ রাখা হোলো। এঁদের বিচারই ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলারূপে বিখ্যাত হয়েছে।

এই সময় নরমপন্থীদের পরিচালনায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টাও চালাতে লাগলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হোলো। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর সমগ্র অর্থনীতিক অবয়বে যে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, তার দোলা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যেমন ঘা দিয়েছিল, তেমনি ব্যস্ত ক'রেছিল ভারতীয় বুর্জোয়াদের। সুতরাং ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আবার একবার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। ভারতীয় গণশক্তি নেতৃত্বহীন অবস্থায় (শ্রমিক

১ ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে।

নেতারা তখন কারাগারে) তরুণ বুর্জোয়া সোস্থালিস্টদের পরিচালনায় আবার একবার বুর্জোয়া সংগ্রামের বোঝা বইতে এগিয়ে এলো। সুযোগ বুঝে কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। কংগ্রেসের দাবী-রূপে ঘোষিত হোলো পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষিত হোলো দেশের সবত্র। কিন্তু এই স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা কখনো ভারতীয় বুর্জোয়া নেতাদের ছিল না। তখনো গান্ধীজীকে সহযোগী সংস্কারপন্থী হিসাবেই আমরা দেখি।

দেশে গণশক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীকে আবার একবার সংগ্রামের ক্ষেত্রে ছুটে আসতে হোলো। দেশীয় বুর্জোয়া নেতারা স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, এবার ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে যে গণশক্তি প্রস্তুত হয়েছে, তা বিপুল আক্রোশে ফেটে পড়বে এবং সেই বিস্ফোরণে কেবল বৃটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না, ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজও সেই আলোড়নে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোণঠাসা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। সেজন্যে ভারতীয় বুর্জোয়া নেতাদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিতালি করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বকে এবার এমন পথে অগ্রসর হ'তে হোলো, যেখানে ভারতীয় গণশক্তি এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এই উভয় যুধ্যমান বাহিনীকেই শক্তিহীন ও সংযত করা সম্ভব হবে। এজন্যে বুর্জোয়া নেতারা আবার গণশক্তির প্রতি তাঁদের অবারিত বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন, যদিও আসলে তাঁদের প্রীতিটা রইলো বৃটিশ বুর্জোয়াদের প্রতিই উন্মুখ হ'য়ে। কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়াদের সেই উদ্‌গ্রীব উন্মুখ প্রীতির আগ্রহকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সহজে গ্রহণ করতে পারলো না। কারণ, সমগ্র পৃথিবীর পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিক অবয়বে তখন এমন একটা ভাঙন এসেছে, যাকে রোধ করার জন্যে সর্বত্র পুঁজিবাদ করেছে আপ্রাণ চেষ্টা। ইতালিতে মুসোলিনির হয়েছে জন্ম, জার্মানীতে হিটলার হয়েছেন গর্ভস্থ, জাপান সাম্রাজ্যবিস্তার ক'রে তার পুঁজিবাদকে জীইয়ে রাখার সঙ্কল্প করছে। বৃটেনের পুঁজিতান্ত্রিক তরীও তখন টলায়মান, তাই রক্ষণশীল দল সহজে আসন্ন গণ-বিপ্লবের ঘনঘোর দুর্যোগে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের হাল ছদ্মবেশী বুর্জোয়া নেতৃত্বের—শ্রমিক দলের—হাতেই ছেড়ে দিয়েছে এবং 'পরম সোস্থালিস্ট' শ্রমিক দলের নেতা ম্যাকডোনাল্ড সাহেব প্রধান মন্ত্রীর আসন থেকে ভারতবর্ষে শ্রমিক দলনের সুব্যবস্থা করছেন। ভারতীয় বুর্জোয়া

নেতৃত্বের এই দ্বিমুখী অভিযান বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে গান্ধীজীর কেবল কার্যকলাপেই নয়, লেখনী-মুখেও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি বড়লাটকে যে পত্র লেখেন, তাতে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান :

"The party of violence is gaining ground and making itself felt···"

"It is my purpose to set in motion that force (nonviolence) as well against the organised violence force of the British rule as the unorganised violence force of the growing party of violence."

ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাকে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই গ্রহণ করেছিল। কারণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিদেশী বুর্জোয়াদের প্রতি বৈরিতা যতোই প্রবল হোক না কেন, তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, গোত্র এবং রক্তের একটা নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। তারা একই বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আর গণশক্তি তাদের বিপরীত শক্তি, তাদের আসল শত্রুতা ওদের সঙ্গেই। তাই সাম্রাজ্যবাদের জলোচ্ছ্বাসের ভয়ে ভারতীয় বুর্জোয়ারা যখন গণ-অভ্যুত্থানের অত্যুচ্চ শিখরে এসে আশ্রয় নিলো, তখন তারা মোটেই নিশ্চিন্ত হোলো না। কারণ, প্রতি মুহূর্তে তারা অনুভব করছিল এই শিখরের অভ্যন্তরে বিপুল-বিস্তৃত সুদূর-শায়িত এক আগ্নেয়গিরির নিহিত স্পন্দন—যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আলোড়নে কেবল সমুদ্রই সুদূরে বিক্ষিপ্ত হবে না, এই আশ্রয়ী মানুষগুলোও হবে নিশ্চিহ্ন। তাই ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাময়িকভাবে গণ-অভ্যুত্থানের আগ্নেয়গিরির শিখরে এসে আশ্রয় নিলেও কেবলই তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো সেই শুভ মুহূর্তের, কখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমুদ্র শান্ত হবে, সদয় হবে, কখন আবার ওরা নির্ভয়ে তার চিরবাঞ্ছিত ক্রোড়ে ফিরে যেতে পাবে!

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা গান্ধীজী গোড়া থেকেই করতে লাগলেন। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন, তাঁর এগারো দফা শর্ত—যে শর্তগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের কথা কংগ্রেস মুখে বললেও বস্তুত সে-রকম কোনো সদিচ্ছা তাদের নেই। রজনী পাম দত্তের ভাষায়, এ ছিল কংগ্রেসের "A kind of conventional maximum at the opening of a traditional bazar haggling.···"

কিন্তু দেশের শ্রমিক ও কৃষাণ জনসাধারণ সত্য-সত্যই স্বাধীনতার জন্যে উন্মত্ত

হ'য়ে উঠেছিল, যদিও তারা ছিল নেতৃত্ববিহীন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতি সতর্কতার সঙ্গেই তার এই অকরুণ শত্রুদের মীরাট ষড়যন্ত্রের নামে বিনা বিচারে পূব থেকে আটক রেখেছিল। সুতরাং দেশের নবজাগ্রত শ্রমিক, কৃষাণ, মধ্যবিত্ত বিপ্লবী জনসাধারণ কংগ্রেসের অবিশ্বস্ত নেতৃত্বকেই গ্রহণ করলো। গান্ধীজী তাঁর আশ্রম-কুঞ্জ থেকে আবার সমর-প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন। দশ বৎসর পূর্বে যেমনটি ঘটেছিল আবার ঘটলো তেমনিটি—গান্ধীজী এবং তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের হাতেই যুদ্ধচালনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হোলো।

গণশক্তিতে বুর্জোয়াদের যে-ভয়, সেই ভয় গান্ধীজীর মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল, কেবল তা মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছিল ধর্ম এবং দার্শনিকতার নামে। গণ-শক্তির প্রতি এই ভীতির নাম হয়েছিল অহিংসা। অনধিক দশ বৎসর পূর্বে গান্ধীজী গণ-বিক্ষোভের পুঞ্জীভূত বাষ্পকে ধীরে ধীরে ক্ষয় ক'রে বিস্ফোরণ এড়াতে চেয়েছিলেন, এবারও করলেন ঠিক তাই। বারদোলির ঘটনার প্রকারান্তরে পুনরাবৃত্তি হোলো। আন্দোলনে দেশের জনসাধারণকে সহজে অংশ গ্রহণ করতে তিনি দিলেন না। তিনি লবণ আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে ডাণ্ডী অভিযান করলেন, সঙ্গে নিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শিষ্য। কেবল তাই নয়, দেশের গণ-বিক্ষোভকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করার উদ্দেশ্যে তাঁর এই 'অভিযান' তিন সপ্তাহ ধ'রে চললো। এই ভাবে আসন্ন বিপ্লবের প্রতীক্ষায় সমগ্র ভারত যখন উত্তেজনার আবেগে অধীর হ'য়ে উঠেছে, গান্ধীজী তখন তাঁর মুষ্টিমেয় শিষ্যসমভিব্যাহারে তাঁর 'ডাণ্ডীযাত্রা'র দার্শনিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। অবশেষে ৬ই এপ্রিল তারিখে লবণ আইন আরো সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হোলো। বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে গান্ধীজীকে বাধা দিলেন না। দশ বৎসর পূর্বে তাঁরা যেমনটি করেছিলেন, এবারও ঠিক তেমনি ভাবেই প্রথমে চরমপন্থী নেতাদের গ্রেফ্‌তার ক'রে নিলেন। এমন কি, স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই বামপন্থী জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে সরকার কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন। অথচ আইন অমান্যের জন্যে গান্ধীজীকে তাঁরা গ্রেফ্‌তার করলেন না, বরং ডাণ্ডী অভিযানকে সংবাদপত্রে ও সিনেমায় বিজ্ঞাপিত করার সম্পূর্ণ সুযোগ দিলেন। কেউ যদি মনে করেন, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের জন্যেই তাঁকে গ্রেফ্‌তার করতে সরকার ভয় করছিলেন, তবে ভুল করবেন। এখনো দেশের বিক্ষুব্ধ গণ-শক্তি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাকে সংযত নিয়ন্ত্রিত রাখার সামর্থ্য ছিল এই একটিমাত্র মানুষের, একথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভালো ক'রেই জানতো। আমরা পরে লক্ষ্য করবো, সরকার যখনই দেখেছে যে, দেশের বিক্ষুব্ধ গণশক্তি গান্ধীজীর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে,

তখনই বিনা দ্বিধায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এই মানুষটিকে তারা গ্রেফ্‌তার করেছে।

গান্ধীজী কেবল যে দার্শনিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাল হরণ করলেন তা নয়, তিনি সংগ্রামের জন্যে এমন একটি স্থচী গ্রহণ করলেন, যা বিপ্লবী জনসাধারণকে হতাশ করলো : লবণ আইন অমান্য করা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন করা, বিলাতী বস্ত্রের এবং বিলাতী মদের দোকানে পিকেটিং করা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, স্কুল-কলেজ ও আদালত বয়কট করা। কৃষাণ ও শ্রমিকদের তিনি এই আন্দোলন থেকে সতর্কতার সঙ্গে দূরে রাখতে চাইলেন। কিন্তু এই সংকীর্ণ সংগ্রাম-স্থচীর পথ বয়ে বিপ্লবের প্লাবন আসা, হোক তা যতোই অহিংস্রক, সম্ভব ছিল না। স্থতরাং দেশে অশান্ত উত্তেজনা ক্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগলো। শ্রমিকরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করলো, কৃষাণরা বহু স্থলে স্বতস্ফূর্তভাবে শুরু করলো রাজস্ব বন্ধ আন্দোলন, বাংলা দেশে ঘটলো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, সীমান্ত প্রদেশে জনসাধারণ কয়েক দিনের জন্যে পেশোয়ার শহর অধিকার ক'রে রইলো। ফলে, বৃটিশ সরকার স্পষ্টই বুঝলো, দেশের আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। স্থতরাং গান্ধীজীকে মুক্ত রাখার আর কোনো প্রয়োজন তাদের কাছে রইলো না। ৫ই মে তারিখে গান্ধীজী গ্রেফ্‌তার হলেন।

গান্ধীজীর গ্রেফ্‌তারের সংবাদ দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়লো। ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের তরঙ্গ উত্তাল হ'য়ে উঠলো সর্বত্র। বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর শহরের ১ লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ছিলেন কাপড়ের কলের শ্রমিক। তাঁরা তিন সপ্তাহ কালের জন্যে শোলাপুর সম্পূর্ণ অবরোধ ক'রে রাখলেন।

গভর্নমেণ্টের দমননীতিও চূড়ান্ত অবস্থায় এলো। অর্ডিন্যান্সের পর পাস হোলো অর্ডিন্যান্স, জারী হোলো সামরিক আইন, কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হোলো অবৈধ। দেশে গ্রেফ্‌তারের সংখ্যা ৯০ হাজারে গিয়ে পৌছলো। কিন্তু কারাগারেও তিল ধারণের ঠাঁই রইলো না, সাময়িকভাবে কাজ চালাবার জন্যে অনেকগুলি জেল তৈরী ক'রে নেওয়া হোলো, কিন্তু তাতেও স্থান সঙ্কুলান হয় না। সরকার এবার গ্রেফ্‌তারের চেয়ে দৈহিক নির্যাতনের উপরই বেশি জোর দিলো। চললো লাঠি, বেত, চাবুক, গুলী। হত ও আহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চললো। কিন্তু ভারতের বিপ্লবী শক্তি তাতেও বিন্দুমাত্র টললো না; তার অগ্রগতি অব্যাহত রইলো। এবং তা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ

করলো শ্রমিক-কেন্দ্র বোম্বাই-এ। এখানে পুলিশের হিংস্র তৎপরতাও যেমন ছিল, জনসাধারণের শক্তিও ছিল তেমনি দুর্বার। বোম্বাই-এর কয়েকটি রাস্তা জনসাধারণ বার বার কয়েক বার অধিকার ক'রে নিলো। কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণভাবে চ'লে যাবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ মানুষের তরঙ্গ ক্রমেই উত্তাল উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। কংগ্রেস পতাকার পাশে দেখা যেতে লাগলো, শ্রমিকদের বিপ্লবী রক্ত পতাকা। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের ভীতি-বিহ্বল আর্তনাদ ধ্বনিত হোলো। গণশক্তির এই অভ্যুত্থান বৃটিশ বুর্জোয়াদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদেরও আতঙ্কিত ক'রে তুললো। বৃটিশ এবং ভারতীয় বুর্জোয়ারা একযোগে মিল ওনার্স এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব কমার্সের মারফত ভারতকে অবিলম্বে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন-প্রদানের দাবী জানালো। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বৃটিশ বুর্জোয়াদের ঐকতানের প্রতিধ্বনি শীঘ্রই পাওয়া গেল রাজনীতিক মহলেও। ভারত সরকার গান্ধীজীর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলো। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আলাপ-আলোচনার জন্যে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন। নেতাদের সঙ্গে সন্ধির আলোচনায় এবং তাঁদের প্ররোচনায় গণ-বিক্ষোভ অনেকখানি প্রশমিত হোলো। তখনো ভারতীয় জনসাধারণ কংগ্রেসী নেতৃত্বের স্বরূপ বুঝতো না, তার ওপর তাদের ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস, অটল নির্ভর। ৪ঠা মার্চ তারিখে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হোলো। সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্থগিত রইলো।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলো। এমন কি, লবণ-আইনটি পর্যন্ত বাতিল হোলো না। অথচ কংগ্রেসকে তার আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হোলো। যে গোল-টেবিল বৈঠক কংগ্রেস একদা বর্জন করেছিলেন, এই চুক্তির ফলে তাতেই তাঁরা সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে ছুটলেন। এই চুক্তির ফলে ভারত বস্তুত স্বায়ত্ত-শাসনের বিন্দুমাত্র কিছুই পেলো না।

চুক্তির মধ্যে দুর্বলতা এবং পরাজয় যে ছিল, কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তাড়াহুড়া ক'রে করাচীতে কংগ্রেসের এক অধিবেশন হোলো, এই চুক্তিকে সর্বসম্মতির মধ্য দিয়ে শুদ্ধ গ্রহণীয় ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে। বুর্জোয়া নেতৃত্বের তরুণ চরমপন্থী অংশ থেকেও প্রতিবাদ আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং সে সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ক'রে তোলার জন্যেই কংগ্রেসে গান্ধী-

আরউইন চুক্তির সমর্থনে প্রস্তাব আনার ভার পড়লো স্বয়ং পণ্ডিত জহরলালের ওপর। দ্বিধাগ্রস্ত জহরলাল প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, যদিও বারে বারে তাঁর মনে হোলো,—"এই জন্যেই কি দেশের জনসাধারণ একবৎসর ধ'রে এমন বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো? এতো তেজদৃপ্ত কাজ আর কথার কি সমাপ্তি ঘটলো এর মধ্যে?" ভারতে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী ত্যাগ ক'রে যাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেছিলেন এবং সে জন্যে দেশে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রও মনে মনে এই চুক্তিকে স্বীকার করতে না পারলেও, ঐক্যের খাতিরে নাকি মেনে নিলেন। এইভাবে রজনী পাম দত্তের ভাষায়—"This collapse of left nationalism at the Karachi Congress underlined the strength of Gandhi's position."

কংগ্রেসের বাইরে কিন্তু শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ প্রচুর পরিমাণে দেখা গেলো। বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি এই চুক্তির সমালোচনা ক'রে বিরুদ্ধ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। গান্ধীজী যখন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্যে বিলাতে রওনা হলেন, তখন বোম্বাই-এ শ্রমিকরা এই যাত্রার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। দেশের শ্রমিক ও কিষাণদের বিপুল দেহের সঙ্গে কংগ্রেসের মস্তিষ্কের ব্যবধান ঘটলো। ছিন্নমস্তার বীভৎস রূপ ধারণ করলো কংগ্রেস। দেহ থেকে মস্তক কেবল ছিন্ন হোলো না, ছিন্ন মস্তক দেহের রক্ত পান করতে লাগলো।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বকে জনসাধারণের যে অংশ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যেও শীঘ্রই সংশয় ও হতাশা দেখা দিলো। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় সহযোগী বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তা হাস্যকর হ'য়ে দাঁড়ালো। গান্ধীজী বিলাতে গিয়ে তাঁর 'ধার্মিক' এবং আত্মিক বাণী দিয়ে এলেন বটে, কিন্তু বিনিময়ে বিলাত তাঁকে কিছুই দিলো না। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে রিক্ত হস্ত গান্ধীজী দেশে ফিরলেন। পথে ধ্বংসমান পুঁজিতন্ত্রের অন্যতম তন্ত্রধারক সিনিয়র মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হোলো।

তবু ভারতবাসীকে গান্ধীজী আশার বাণী শোনাতে লাগলেন!

কিন্তু তিনি যখন দেশের জনসাধারণকে স্থির রেখেছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন ভারতবর্ষে বিন্দুমাত্র স্থির ছিল না। তথাকথিত 'সন্ধির' নামে বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদ এই দীর্ঘ নয় মাস কাল ধ'রে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিল মাত্র। প্রস্তুতি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল. তাই ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই

আকস্মিকরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সংগ্রাম ঘোষণা করলো। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স হোলো জারী। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-সম্পর্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হোলো বেআইনী। দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের সংগঠক, প্রচারক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের করা হোলো গ্রেপ্তার। এমনি ভাবে অতর্কিত চকিতে দ্রুত আঘাত হেনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেদিন জয়ী হোলো। ১৯৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দের নির্যাতনের অপেক্ষা এবারে নির্যাতন কঠিনতর আকার ধারণ করলো। প্রথম চার মাসেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা হোলো আশী হাজার। মাত্র পনেরো মাস বাদে ১৯৩৩-এর মার্চে গ্রেপ্তারের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছলো এক লক্ষ বিশ হাজারে। দৈহিক অত্যাচারও চরমে এলো। চললো প্রহার, লাঠি-চার্জ, গুলী। গ্রামে গ্রামে হোলো পাইকারী জরিমানা। বহু অর্থ, ভূসম্পত্তি হোলো বাজেয়াপ্ত। সরকার ভেবেছিল, সংগঠনশক্তি এবং নিষ্করুণ নিপীড়ন দিয়ে তারা ভারতীয় সংগ্রামকে ছয়মাসের মধ্যেই পঙ্গু ও অসাড় ক'রে দেবে। কিন্তু এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হোলো, চললো দীর্ঘ উনত্রিশ মাস ধ'রে। নেতাহীন, সংগঠনহীন অবস্থায় আকস্মিকভাবে ভারতীয় জনসাধারণ আক্রান্ত হ'য়েছিল, এবং সেজন্যে দায়ী ছিলেন কংগ্রেসের আপোষকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাঁদের নির্লজ্জ সহযোগিতা। তবু ছত্রভঙ্গ, বিভ্রান্ত জনবাহিনী যে অসীম প্রতিরোধ শক্তি দেখালো, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তা অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। কিন্তু গণশক্তিতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের অবিরল ভীতি এই সংগ্রামকেও পদে পদে ব্যাহত করতে লাগলো। গান্ধী তথা কংগ্রেস হুকুমৎ কেবলই আদেশ দিতে লাগলেন যে, আন্দোলনের মধ্যে গোপনীয়তা যেন বিন্দুমাত্র না থাকে—অথচ বেআইনী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য আন্দোলন করাও ছিল এক প্রকার অসম্ভব। পাছে রাজস্ব বন্ধ হয়, সেদিক থেকেও তাঁরা বারে বারে জমিদারদের ভরসা এবং সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তাঁরা গণশক্তির এই তুমুল জাগরণের বন্যাস্রোতকে কেবলই অন্যপথে চালিত ক'রে দিতে চাইলেন। ১৯৩২-এর গ্রীষ্মকালেই গান্ধীজী জাতীয় সংগ্রামের সূচী ত্যাগ ক'রে অস্পৃশ্যতা বর্জনের দিকে মন দিলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী 'আমরণ' অনশন করলেন। এই অনশন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হোলো না, হোলো না স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশরূপে। গান্ধীজী অনশন করলেন 'তপশীলভুক্ত' হিন্দুদের পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে। এইভাবে দেশের জনসাধারণের লক্ষ্য বিভক্ত হোলো, সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে থেকে অন্তরিত হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের

বিশেষ একটা কাজের দিকে। হোলো পুণা চুক্তি। এই চুক্তির ফলে "তপশীলভুক্ত শ্রেণীর" জন্যে সংরক্ষিত আসন হোলো দ্বিগুণিত।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী নূতন ক'রে আবার অনশন করলেন। এখন তিনি আরো এক ধাপ নেমে এলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ কোনো কাজের বিরুদ্ধেও তিনি এখন লড়ছেন না, লড়:ছন দেশের গণশক্তির বিরুদ্ধে। দেশের গণশক্তিকে 'হিংসার' পথ থেকে—অর্থাৎ দেশীয় ও বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। সেদিন তাঁর অনশন হোলো যেন সেই সুদক্ষ সাপুড়ের বাঁশী—যে বাঁশীর সুরে জাগ্রত জন-ভুজঙ্গ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তার উদ্যত ফণা নত ক'রে তার ঝাঁপির বন্দীত্বে ফিরে যেতে পারে।

গান্ধীজীর এই কাজে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আনন্দের আর সীমা রইলো না। বিনা শর্তে গান্ধীজী মুক্তি পেলেন। গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট দেড় মাসের জন্যে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন —কারণ হিসাবে দেখানো হোলো, গান্ধীজীর অনশন কালে দেশের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকবে, তাই। গান্ধীজী এবার নিজেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অকৃত্রিম বন্ধু ব'লে প্রমাণিত ক'রে বড়লাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'লেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লক্ষ্য করছিল, ভারতীয় জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়েছে, কংগ্রেসী নেতাদের কার্যকলাপে তারা হয়েছে বিভ্রান্ত, সুতরাং সরকার এবার শেষ আঘাত হানতে চাইলো। গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাট সাধারণ সৌজন্যের খাতিরেও সাক্ষাৎ করলেন না। সাক্ষাতের শর্ত হ'লো কংগ্রেসকে আইন অমান্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হবে। সুতরাং সহযোগ-প্রত্যাশী কংগ্রেস অবিলম্বে ব্যাপক আইন-অমান্য প্রত্যাহার করলেন এবং প্রবর্তিত হোলো ব্যক্তিগত আইন অমান্যের রীতি। কেবল তাই নয়, শীঘ্রই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিলেন। এবার কয়েকদিন চললো ব্যক্তিগত আইন অমান্যের প্রহসন। সরকারের মধ্যে অনমনীয়তা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। আগস্ট মাসে গান্ধীজী পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন। কারাগারে গান্ধীজী এবার আবার রাজনীতি পরিত্যাগ ক'রে ধর্মানুশীলন করতে লাগলেন, এবং পরে হরিজনদের উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করলেন। এমনিভাবে ধীরে ধীরে নেতাহীন, সংগঠনহীন, ম্রিয়মাণ সংগ্রাম নিঃশেষের দিকে এগিয়ে চললো।

গান্ধীজী গণ-আন্দোলনের 'এপিটাফ্' লিখতে বসলেন। আন্দোলনের অসাফল্যের জন্যে তিনি জনসাধারণকেই দায়ী করলেন: "I feel that the masses have not yet received the messages of Satyagraha" etc.

১৯:৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে পাটনায় কংগ্রেসকমিটির অধিবেশনে বিনা শর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হোলো। স্থির হোলো, কংগ্রেস আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। কংগ্রেসের এই সহযোগিতার ইচ্ছায় গভর্নমেণ্ট খুশি হয়ে জুন মাসে কংগ্রেসকে বৈধ এবং জুলাই মাসেই কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়াকে বেআইনী ঘোষণা করলো।

এমনি ভাবে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হোলো, যে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এখনো ঘটেনি।

॥ চৌদ্দ ॥

কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন গণ-বিপ্লবকে এমনিভাবে বিধ্বস্ত ক'রে দিলো, তখন গণশক্তি তার নিজের নেতৃত্ব খুঁজতে লাগলো। এই নেতৃত্ব প্রধানত দেশের শ্রমিক সংঘবদ্ধতার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করলো। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ট্রেড,ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদের সংগ্রামে যে অংশ গ্রহণ করতো, তা ছিল নিতান্ত সংকীর্ণ। এর সদস্যসংখ্যা ছিল এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন। পৃথিবীব্যাপী পুঁজিতন্ত্রের যে সঙ্কট শুরু হ'য়েছিল এবং পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ শ্রমিকদের করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে যে অভাবনীয় আশা ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটেছিল, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ওপর তার তরঙ্গাঘাত ছিল অনিবার্য। পৃথিবীর গণজাগরণের অংশ হিসাবে ভারতীয় শ্রমিকরা ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দেই তাদের নবজাগ্রত রাজনীতিক চেতনার প্রথম পরিচয় দিয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন লোকমান্য তিলককে দীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো, তখন বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা স্বতপ্রবৃত্ত হ'য়ে ব্যাপক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং লেনিন সে'দিন ভারতীয় শ্রমিকদের এই রাজনীতিক চেতনাকে ভবিষ্যতের সংকেত হিসাবে করেছিলেন অভিনন্দিত।[১] ভারতীয় গণশক্তির এই রাজনীতিক জাগৃতি সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ সম্পূর্ণ সচেতন ছিল এবং এই গণশক্তিকে প্রতিরোধ প্রতারিত করার জন্যে তাদের একমাত্র ভরসা ছিল সহযোগী ভারতীয় বুর্জোয়ারা। তাই শ্রমিকরা যখনই বুর্জোয়া নেতৃত্ব ত্যাগ ক'রে নিজেদের নেতৃত্ব গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে, তখনই কঠোর হস্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাকে দমন করেছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাকে দমন করেছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে যে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট্ পাস করেছিল, তার ফলে শ্রমিকদের রাজনীতিক কার্যকলাপ হয়েছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতেও শ্রমিক সংঘবদ্ধতাকে চেপে রাখা সম্ভব হয় নি। সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ওপর ভিত্তি ক'রে শ্রমিক ও কৃষাণ সংগঠনগুলি দেশে ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। প্রথমে বাংলায় এবং পরে যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষক পার্টি উঠলো গ'ড়ে এবং ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে সেগুলি

১ "The Indian proletariat has already matured sufficiently to wage a class-conscious and Political mass struggle—and that being the case, Anglo-Russian methods in India are played out." Lenin in 1908.

সম্মিলিত হ'য়ে গঠিত হোলো নিখিল ভারত শ্রমিক-কৃষক পার্টি। এই নবজাগ্রত সংঘবদ্ধ গণশক্তিকে একদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দালাল হিসাবে বুর্জোয়া 'শ্রমিক নেতারা' যেমন বিভ্রান্ত ক'রে দিতে চাইলো, তেমনি বৃটিশ সরকারও চালালো তার দমন নীতি। ১৯২৯-এর মার্চমাসে ভারতবর্ষের সর্বত্র থেকে সংগ্রামশীল শ্রেষ্ঠ নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে শ্রমিক আন্দোলনের শিরশ্ছেদের চেষ্টা হোলো। ভারতীয় গণশক্তি যখন ১৯৩০-৩৪ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে বুর্জোয়া নেতৃত্বে বিভ্রান্ত, দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে তখন সুপরীক্ষিত শ্রমিক নেতাদের বিচারের নামে বিনা বিচারে কারাপ্রাকারের অন্তরালে আটকে রেখেছিল। সুদীর্ঘ চার বৎসর ব্যাপী এই বিচারের নামে অবিচারের নাম হয়েছিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। অন্যদিকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রমিক নেতারাও নীতির নামে শ্রমিক সংঘবদ্ধতাকে প্রচণ্ডরূপে আঘাত করলেন। ১৯২৯-এর শেষে নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন দক্ষিণপন্থী শ্রমিক নেতারা সংখ্যালঘু হ'য়ে পড়লেন, তখনই তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে বাইরে এলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অপর একটি শ্রমিক সংঘ গড়ে তুললেন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যেও আবার বুর্জোয়া বামপন্থী শ্রমিক নেতাদের কার্যকলাপ শ্রমিক আন্দোলনকে পদে পদে ব্যাহত করতে লাগলো। ফলে, কমিউনিস্টরা রেড্ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে বহু দল ও মতবিরোধ থাকায় তার শক্তির হ্রাস হোলো বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। প্রতি বৎসর ইউনিয়নের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বাড়লো। ১৯৩০-৩৪এর জাতীয় আন্দোলনের কালে শ্রমিকদের সংগ্রামশীলতা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কংগ্রেসের সহযোগী বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন গণ-আন্দোলনকে বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত ক'রে দিলো, তখন জাগ্রত উন্মুখ গণশক্তি তার নেতৃত্বের সন্ধান করতে লাগলো নিজেদের মধ্যে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা লক্ষ্য ক'রে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষিত করলো। ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিনান্সের বলে তারা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেফ্তার ও আটক রাখতে লাগলো। শ্রমিকরা এই সাম্রাজ্যবাদী আঘাতের জবাব দিল তাদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে মিলিত হোলো। পর বৎসর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ঐক্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে এলো এবং ১৯৩৮ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হোলো। ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনের বাইরে রইলো কেবলমাত্র আমেদাবাদের গান্ধীপন্থী টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন। কারণ, তারা নাকি শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করতো না।

কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ১৯৩৪-এ শ্রমিক শক্তির বিশ্বাস হারিয়েছিল।[১] সেই বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হলেন একদল বামপন্থী। কমিউনিস্ট পার্টির অবর্তমানে একদল তথাকথিত শ্রমিক নেতা ১৯৩৪ সালে গ'ড়ে তুললেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি। এই পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাব প্রচুর পরিমাণেই রইলো; কারণ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসেরও সদস্য হওয়া। কেবল তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যে একদল বামপন্থীও কৃষাণ ও শ্রমিকের নাম নিতে লাগলেন। ১৯৩৬-এর লখ্নৌ কংগ্রেস অধিবেশনে জহরলাল শ্রমিক ও কৃষাণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে সংঘগতভাবে অনুমোদন দানের প্রস্তাব এনেছিলেন, দক্ষিণপন্থী শাসিত কংগ্রেস কমিটি তা ৩৫-১৬ ভোটে বাতিল ক'রে দেন। কিন্তু দেশে শ্রমিক ও কিষাণ শক্তির জাগরণ এমন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল যে, দক্ষিণপন্থী নেতারাও নরম হ'তে বাধ্য হলেন। ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ১৩ দফা একটি কর্মসূচীও গৃহীত হোলো। এবং জনসাধারণকে কংগ্রেসের আওতায় আনার যথেষ্ট চেষ্টা চলতে লাগলো। এইভাবে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময়ে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে গিয়ে পৌঁছলো। আবার একবার ভারতের শ্রমিক ও কিষাণ জনসাধারণ বুর্জোয়া নেতৃত্বের মুখ চেয়ে রইলো।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণকে সাময়িকভাবে শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে নয়া গঠনতন্ত্রের প্রবর্তন করলো। দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরেই ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকাব দেওয়ার যে ভোয়া প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দিয়ে এসেছিল, তার সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যও এর পেছনে নিহিত ছিল। কিন্তু এই ধরনের কোনো গঠনতন্ত্রে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল না। ভারতবর্ষ চেয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি। তাই ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে ফৈজপুরে যে কংগ্রেস অধিবেশন হোলো, তাতে কংগ্রেস ঘোষণা করলো, "In the opinion of the Congress any co-operation with the constitution is a betrayal of India's struggle for freedom and the strengthening of the hold of British Imperialism and a further

১ ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকের কথা, লখ্নৌ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে জহরলাল নেহেরু বলেন: "We have largely lost touch with masses."

exploitation of the Indian masses who have already been reduced to direst poverty under the imperialist domination."

কিন্তু কংগ্রেস একথা বাক্যত ঘোষণা করলেও, এর মধ্যে তার যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মাত্র দুই বৎসর পূর্বে যে-ভাবে তারা বিনষ্ট ক'রেছিল, তাকে গোপন করার জন্যেই স্বাধীনতা প্রীতি ও জনগণের দরদকে তারা উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করছিল মাত্র। তাই এই কংগ্রেস-বিনিন্দিত নয়া গঠনতন্ত্র অনুসারে শাসনব্যবস্থায় কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে কিনা, এই প্রশ্ন যখন উঠলো, তখন কংগ্রেস office acceptance-কেই অধিক ভোটে গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ কাগজী প্রস্তাব পাস ক'রে নয়া গঠনতন্ত্রকে কংগ্রেস বাক্যত নিন্দা করলেও কার্যত তাকে, আংশিকভাবে হ'লেও,[১] মেনে নিলেন। অবশ্য ফৈজপুর কংগ্রেসে office-acceptance-এর প্রশ্ন যখন উঠলো, তখন অনেকে ওই প্রশ্নটাকে আপাতত কিছুদিন তুলতে লজ্জা পেলেন। কারণ, একই অধিবেশনে নয়া-গঠনতন্ত্রের নিন্দা, স্বাধীনতা-প্রীতি, জনগণের প্রতি দরদ ইত্যাদি কাগজে ঘোষণা ক'রে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় ক'রে গঠনতন্ত্রের খিড়কি পথে সরকারী গদীতে গিয়ে বসাটা নিতান্তই বেমানান লাগে। ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রমিক নেতা এস. এ. ডাংগে (মীরাট মামলার বন্দী এবং কমিউনিস্ট) এক প্রস্তাবে ভারতীয় গঠনতন্ত্ররচনাকারী পরিষদ লাভের উদ্দেশ্যে গণ-আন্দোলনের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করতে বললেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব ৮৩-৪৫ ভোটে বাতিল হ'য়ে যায়। শাসনকার্যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পূর্ণ বিরোধিতা ক'রে অপর একটি প্রস্তাবও আসে। সেটিও ৮৭-৪৮ ভোটে বাতিল হয়। এই ভাবে কংগ্রেস মুখে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের গঠনতন্ত্রের নিন্দা করলেও কার্যত তাকে গ্রহণ করলো এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, সংগ্রামের পথে নয়, সহযোগিতার পথেই অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়াতে কংগ্রেস নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। নির্বাচনী ইস্তাহারে তাঁদের স্বাধীনতা-প্রীতি এবং জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রইলো। কংগ্রেস ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা আইনসভায় প্রবেশ করছেন, নয়া গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে নয়, তার প্রতিশোধ

১ বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে নয়া গঠনতন্ত্রের দুইটি অংশ ছিল: একটি Federal বা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং অপরটি Provincial বা প্রাদেশিক। কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটিকে বাদ দিয়ে প্রাদেশিক অংশটিকে গ্রহণ করলো।

এবং উচ্ছেদ করতে—"not to co-operate in any way with the Act, but to combat it and seek to end it."[১]

সুতরাং এই উদ্দেশ্যগুলি সম্মুখে রেখেই কংগ্রেস সেদিন জনসাধারণের বিপুল ভোটে আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত হ'লেন। এখন কংগ্রেসের সম্মুখে এলো নূতন প্রশ্ন—আইনসভাগুলিতে উপস্থিত থেকে তাঁরা সরকারী শাসনকার্যের বাধা দিবেন, না নিজেরাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন। কংগ্রেসের সহযোগী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সহযোগের এমন সুযোগ সহজে ছাড়তে চাইলেন না। ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রিসভা গঠনের অর্থাৎ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তবে, শর্ত রইলো যে, গভর্নররা তাঁদের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। গান্ধীজী কংগ্রেসের বাইরে থাকলেও কংগ্রেসে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনিই কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরামর্শ দিলেন।[২] অবশ্য, কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, এবং অন্যান্য বামপন্থীরা কংগ্রেসের এইভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী-শাসিত কংগ্রেসে তাঁদের প্রতিবাদ ১৩৫-৭৮ ভোটে অগ্রাহ্য হ'য়ে গেলো।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কবতে আরো তিনমাস দেরী হোলো। কারণ, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেস চেয়েছিলেন, গভর্নররা যে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না তা বৃটিশ সরকার ঘোষণা করুক। কিন্তু সে-রকম কোনো ঘোষণা করার পূর্বেই ১লা এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষে নয়া গঠনতন্ত্রের উদ্বোধন হোলো। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ হরতালের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানালো। কংগ্রেসের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের আলাপ-আলোচনা অচল অবস্থায় এসেছিল, তাই আপাতত প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু দল নিয়েই গঠিত হোলো মন্ত্রিসভা। অবশেষে অচল অবস্থার অবসান হোলো। ২২শে জুন তারিখে বড়লাট এক ঘোষণায় কংগ্রেসকে অনেকখানি ভরসা দিলেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই

---

১ চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল যখন আইনসভায় প্রবেশ করেছিল, তখন প্রবেশের পূর্বে ঘোষণা করেছিল যে, সরকারী কার্যের প্রতিরোধের জন্যেই তাঁরা সেখানে যাচ্ছেন। কিন্তু আইনসভায় ঢুকেই তাঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছিলেন, আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। বর্তমানে কংগ্রেস আবার তারই পুনরাবৃত্তি করলেন।

২ গান্ধীজী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে একটি প্রবন্ধে মন্ত্রিত্বগ্রহণের স্বরূপ সম্পর্কে যদিও বলেন, "The Ministers are mere puppets so far as the real control is concerned. The collectors and Police may at a mere command from the Governors unseat the Ministers, arrest them and put them in a lock-up."

মাসে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হোলো। কিছুদিন বাদে হোলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। পরে আসাম এবং সিন্ধুতেও কংগ্রেস 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

প্রথমে কিছুদিন কংগ্রেস কিছু কিছু গণতান্ত্রিক কাজ করার পরে ক্রমেই তাঁরা তাদের মুখোস খুলতে লাগলেন এবং নির্লজ্জভাবে কৃষাণ, শ্রমিক ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করলেন। মাদ্রাজে সোশ্যালিস্ট নেতা গ্রেফ্‌তার হলেন, বিহারে জমিদারদের সঙ্গে কংগ্রেস হাত মেলালেন, বোম্বাই-এ পাস হোলো ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ডিস্‌পিউট বিল। এমনিভাবে কংগ্রেস ফৈজপুর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বা নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সকল আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাক্‌আড়ম্বর করেছিলেন, সে সবগুলিই তাঁরা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন। সহযোগী-বুর্জোয়া-শাসিত কংগ্রেস এইভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নামে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম ঘাঁটিতে পরিণত হোলেন—তাঁরা গণসংগ্রামের সকল প্রকার প্রকাশকে দমন করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই বৃদ্ধি পেলো। নির্বাচনের পূর্বে যে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছায়ামাত্র ছিল, তা ধীরে ধীরে দানবীয় আকার ধারণ করলো, যার ভয়াবহ রক্তাক্ত ফসল উঠলো ১৯৪৬-৪৭-এর ভারতবর্ষে। এই ক্রমবর্ধমান ভ্রান্ত সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করার জন্যে একমাত্র প্রয়োজন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হওয়ায় এবং গণাতঙ্ক তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তাঁরা সংগ্রামের পথে কোনোমতেই অগ্রসর হ'তে চাইলেন না। কংগ্রেসের সহযোগিতা সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিল। সুতরাং এই অনুকূল অবস্থায় তারা ভারতবর্ষে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত গঠনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটিরও প্রবর্তন করতে চাইলো। বস্তুত, ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক অংশের ক্ষতিপূরণ হিসাবেই ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত ক'রে স্থানীয় বুর্জোয়াদের হাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ক্ষমতাটুকু দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তন ক'রে তা ফিরিয়ে নিতে চাইলো বহুগুণে। কারণ, এই পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় সামন্ত রাজাদেরও প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকার ছিল। এবং সামন্ত রাজ্যগুলি ছিল বা আছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বন্দর। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দেই হরিপুরায় জাতীয় কংগ্রেস একবাক্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সরকারী চেষ্টার নিন্দা করলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামশীল বামপন্থীরা কিন্তু দক্ষিণপন্থী

নেতাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, সংগ্রামবিরোধী সহযোগী দক্ষিণপন্থী নেতারা যে-কোন মুহূর্তে যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে গ্রহণ ক'রে বসতে পারেন, এমন একটি ধারণা তাঁদের বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল। কেবল তাই নয়, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ তীব্র হ'য়ে উঠছিল, তারই দোলা এসে লেগেছিল কংগ্রেসের সংগ্রামশীল বামপন্থী অংশে। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে সহযোগী সংগ্রামবিমুখ দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামশীল সহযোগ-বিরোধী বামপন্থীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হ'য়ে উঠলো। সহযোগী দক্ষিণপন্থীদের পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী (যদিও নামে কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন) এবং সংগ্রামশীল বামপন্থীদের পুরোভাগে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের পেছনে ছিলেন সমস্ত বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা, সোশ্যালিস্টরা এবং কম্যুনিস্টরা। ১৯৩৯-এ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন দ্বন্দ্বরূপেই সংঘর্ষটি প্রকাশ পেলো। এ পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন বিনা দ্বন্দ্বে সর্বসম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হোতো, আগের বৎসরেও সুভাষচন্দ্র বিনা দ্বন্দ্বে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এবার সর্বপ্রথম নির্বাচন দ্বন্দ্ব ঘটলো। কংগ্রেস সভাপতিত্বের নির্বাচন দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্রের অবতীর্ণ হবার একমাত্র কারণ ছিল, কংগ্রেস কমিটিকে, বাস্তবিকপক্ষে যা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করে, বামপন্থীদের সংগ্রামশীল আয়ত্তে আনা। কারণ, কংগ্রেস গঠনতন্ত্র অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হন, ভোটে নির্বাচিত হন না। বামপন্থীদের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে দক্ষিণপন্থীদের কোনো সংশয় ছিল না। সুতরাং তাঁরা সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে একজন গান্ধীপন্থী প্রতিনিধিকে খাড়া করলেন। কিন্তু নির্বাচন দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্র ১৫৭৫-১৩৭৬ ভোটে হ'লেন জয়ী। সমস্ত সংগ্রামী ভারতবর্ষ সেদিন আনন্দ উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে উঠলো। সুভাষচন্দ্রের এই জয় সেদিন আসন্ন সংগ্রামের সংকেত করলো। তাই সহযোগী দক্ষিণপন্থীদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, সুভাষচন্দ্রের জয় তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়। "It is plain to me that the delegates do not approve of the principle and policy for which I stand."

গান্ধীজী স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন, কংগ্রেস এবার সহযোগিতা এবং অহিংসার পথ ছেড়ে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হচ্চে, তাঁর অহিংসার বাণী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে। গান্ধীজী তৎকালীন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করলেন, এমন কি তিনি গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের কংগ্রেস ত্যাগ করতেও পরামর্শ দিলেন।

"Those,···who feel uncomfortable in being in the Congress may come out."

কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের এই সংঘর্ষে গান্ধীজীকে যে-দুর্নাম-কলঙ্ক সইতে হোলো, এমনটি এর পূর্বে আর কখনো হয় নি, কারণ, ভারতীয় রাজনীতিতে সংগ্রামশীলদের সঙ্গে অসংগ্রামী সহযোগিদের মতদ্বৈধ ইতিপূর্বে এমন তীব্র প্রচণ্ড আকার কখনো ধারণ করে নি, সমগ্র গান্ধীবাদ যেন কয়েক দিনের মধ্যেই উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে দেখা দিলো।

কিন্তু দক্ষিণপন্থী সহযোগী গান্ধীবাদীরা সহজে আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। পনেরো জন সদস্য নিয়ে গঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে দক্ষিণপন্থী বারো জন সদস্য পদত্যাগ করলেন। জহরলাল নেহরুও করলেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হ'য়ে উঠলেও বাইরেকার গঠনতান্ত্রিক অবয়বটা কিন্তু ছিল অক্ষুণ্ণ। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ত্রিপুরীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হোলো। এই অধিবেশনে দক্ষিণ-পন্থীরা তাঁদের শেষ তাসটি তুরুপ করলেন। তাঁরা খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে চাইলেন গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে। কে জাতির অবিসংবাদী নেতা, এই প্রশ্ন নিয়ে একটি প্রস্তাব উঠলো। গান্ধীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের মতো এসে দাঁড়ালো সংগ্রামী বামপন্থীদের সম্মুখে। বামপন্থীরাও অনেকে সসম্ভ্রমে মাথা নত করলেন। যেন মনে হোলো, রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী কোনো যাদুকরের অপূর্ব সংগীতে মুগ্ধ হ'য়ে ক্ষণেকের জন্যে অস্ত্রচালনা বন্ধ করলো, এবং সেই সুযোগে জয়ী হ'য়ে গেলো শত্রুরা। দক্ষিণপন্থীদের এই জয় ভারতীয় রাজনীতিকে আবার তার পূর্ব পথে পরিচালিত করলো। স্থির হোলো, গান্ধীজীর বিনা অনুমোদনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কোনো সদস্য নেওয়া চলবে না। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র যে কারণে কংগ্রেস সভাপতির আসন অধিকার করতে চেয়েছিলেন, দক্ষিণপন্থীরা গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে থেকে তাকে বানচাল ক'রে দিলো। ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র সভাপতিত্বের পদ ত্যাগ করলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। আবার ভারতীয় কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের কবলে গেলো। দক্ষিণপন্থীরা কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হোলেন না। কংগ্রেসকে দক্ষিণপন্থীদের একছত্র ঘাঁটিতে পরিণত করতে চাইলেন। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দানের অধিকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হোলো। কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের কোনোরূপ সংগ্রামে অংশ গ্রহণও হোলো নিষিদ্ধ—অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষাণ

আন্দোলনগুলিতে তাঁদের অংশ গ্রহণের উপায় রইলো না। সুভাষচন্দ্র এই বামপন্থী-বিরোধী কংগ্রেসী প্রস্তাবের প্রতিবাদে 'Left Consolidation Committee' গঠন করলেন। ৯ই জুলাই তারিখে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হোলো। ফলে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে বিচ্যুত হ'লেন। তাঁকে তিন বৎসরের জন্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত কোনো পদে নিযুক্ত হবার অযোগ্য ব'লে ঘোষণা করা হোলো।

এমনি ভাবে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সেদিন দেশের সংগ্রামী জনসাধারণকে দমন ক'রে যে বিক্ষোভের বাষ্প রুদ্ধ করেছিল, তার একটি প্রধান অংশ নিষ্কৃতি পেলো কংগ্রেস-বিরোধী মুসলিম লীগের মধ্য দিয়ে—মুসলমান জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী শক্তি ভ্রান্ত পথে চালিত হ'য়ে বিস্ফুরিত হোলো সঙ্কীর্ণ বর্বর সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে। এই সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত করতে গিয়ে গান্ধীজীকে পরবর্তীকালে প্রাণ দিতে হ'য়েছিল, তাই আমাদের মনে রাখা উচিত, গান্ধীজীর সংগ্রামের বিরোধিতাই সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাষ্পকে একদা সযত্নে রুদ্ধ ক'রেছিল। সংগ্রামের প্রশস্ত পথে গণ-বিক্ষোভের বাষ্পকে সেদিন পরিচালিত করলে, কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, গান্ধীজীর জীবনের ইতিহাসও অন্যরকম হোতো, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ভারতবর্ষের যখন এমনি অবস্থা, তখন এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। চিরদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং মধ্য প্রাচ্যে তার আধিপত্য এবং প্রভাবের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার ক'রে এসেছে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের সময় বৃটেন ভারতে যে নীতির অনুসরণ করেছিল, এবারেও সে তাই করতে চাইলো। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় জনসাধারণের কোনো মতামত না নিয়েই বড়লাট ভারতবর্ষকে যুদ্ধমান দেশ ব'লে ঘোষণা করলেন। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে মাত্র এগারো মিনিটে পাস করা হোলো ভারত শাসন সংশোধন আইন। এই আইনের বলে বড়লাট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক গঠনতন্ত্রেও হস্তক্ষেপের অধিকার পেলেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে পাস হোলো ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অর্ডিন্যান্স। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এলো চূড়ান্ত অধিকার। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সকল প্রস্তুতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হোলো ব'লে ঘোষণা করলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের শাসনভার নির্লজ্জভাবে একটিমাত্র ব্যক্তির হস্তে নিয়োজিত হোলো, গঠনতন্ত্রের কোনো ছদ্মবেশও আর রইলো না। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা এই যুদ্ধে বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা করতে পারেন না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হোলো ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে সাম্রাজ্যবাদকে সুদৃঢ় ও সংঘবদ্ধ করা। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ সরকারকে গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই যুদ্ধের লক্ষ্য কি, তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে অনুরোধ করলেন। "Do they include the elimination of imperialism and the treatment of India as a free nation···?"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই সোজা প্রশ্নের যে বাঁকা জবাব বৃটিশ সরকার দিলো, তা বস্তুত ছিল, 'না'। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিলো। অবশ্য, এই সংঘর্ষের মূল নিহিত ছিল আরো গভীরে, জনসাধারণের মধ্যে, যারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। ২রা অক্টোবর তারিখে বোম্বাই-এর নব্বই হাজার শ্রমিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে একদিনের জন্যে সাংকেতিক ধর্মঘট পালন করলো। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে সকল সহযোগিতা ত্যাগ করার জন্যে চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে লাগলো। ১৯৩৯-এর অক্টোবর মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি করলো পদত্যাগ।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে ইউরোপে নাৎসীরা যখন প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে, ফ্রান্সের পতন ঘটেছে এবং যুদ্ধের সংকট-মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে, তখন কংগ্রেস স্বত-প্রণোদিত হ'য়ে সহযোগিতার জন্যে আবার অগ্রসর হয়েছেন। ইউরোপে ফাশিজ্‌মের অভ্যুত্থান এবং তার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কংগ্রেসের এক অংশ সচেতন ছিল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ফৈজপুর অধিবেশনে কংগ্রেস স্পেনে ফ্রাংকোর অধীনে ফাশিবাদের অভ্যুত্থান এবং জার্মান-ইতালীর ফাশিস্টদের নৃশংস তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা করেন। নিরপেক্ষতার নামে এই বর্বর অভিযানকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যেও ইংল্যাণ্ডকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, "Fascist aggression has increased, the Fascist powers forming alliances and grouping themselves together for war with the intention of demanding Europe and the world and crushing political and social freedom." ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দেও হরিপুরা কংগ্রেস বৃটিশের বিপজ্জনক নিরপেক্ষতার তীব্র নিন্দা করেন। মিউনিকে অনুসৃত বৃটিশ নীতিকে তিরস্কৃত করা হয়: "The Congress records its entire disapproval of the British foreign policy culminating in the Munich Pact, the Anglo-Italian agreement

and the recognition of Rebel Spain." অর্থাৎ ফাশীবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করার বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ফাশীদের বিরুদ্ধে তার প্রবল বিরোধিতা জানিয়ে এসেছে। যুদ্ধ যখন ঘোষিত হোলো, তখন ফাশীবাদ-বিরোধিতার জন্যে ভারতবর্ষ বৃটেনকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল; অবশ্য বৃটেনের ক্রীতদাসরূপে নয়, বন্ধুরূপে। কিন্তু বৃটেন ভারতবর্ষকে চাবুকের জোরে ব্যবহার করতে চাইলো। বৃটেনের ফাশীবিরোধের রূপ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদিতা, তা যখন অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠলো, তখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করা ভারতবর্ষের অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠলো। অবশ্য, ঐ সময়ও গান্ধীজী যে বৃটিশ-প্রীতি দেখান, তা বুয়ার যুদ্ধ, জুলু যুদ্ধ, বা গত মহাযুদ্ধের সময়কার মনোভাবের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অন্যতরো নয়। বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া 'গণতন্ত্র' ছিল তাঁর কাছে আদর্শ-বস্তু, সেই আদর্শে অহিংসার পথে ভারতবর্ষ গিয়ে উপনীত হবে, এই ছিল তাঁর সর্বাঙ্গীণ সঙ্কল্প। তাই ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখেও গান্ধীজী বলেন, বৃটেন 'ন্যাযের' জন্যে যুদ্ধ করছে, ভারতবর্ষের কর্তব্য তাকে বিনা শর্তে সকল সাহায্য দেওয়া। ৯ই সেপ্টেম্বর হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন: "I am not, therefore, just now thinking of India's deliverance. It will come, but what will be its worth if England and France fall." তাই ফাশিজ্‌ম্‌ যখন ইউরোপকে প্রচণ্ড বিক্রমে মথিত ক'রে ফেললো, তখন ভারতবর্ষ আবার সহযোগিতার জন্যে অগ্রসর হোলো। শর্তরূপে দাবী করলো, কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং এই সরকার কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত সদস্যদের কাছেই দায়ী থাকবে। কংগ্রেস এই দাবীর ভিত্তি হিসাবে পুণায় ১৯৪০-এর জুলাই মাসে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা-বিষয়ে গান্ধীজীর অহিংসার নীতিকে বিপুল ভোটাধিক্যে বর্জন করলো। গান্ধীজীর নিজেরও এই নীতির বিরোধিতা করার কোনো কারণ ছিল, মনে হয় না। বৃটেনকে রক্ষা করার যখনই প্রয়োজন হয়েছে, কি বুয়ার যুদ্ধে, কি জুলু বিদ্রোহে, কি গত মহাযুদ্ধে, প্রতিবারেই তিনি অহিংসার নীতিকে হেলায় ত্যাগ করেছেন। তবে হিংসার নীতিকে কংগ্রেস যখন স্বীকার ক'রে নিলো, তখন গান্ধীজী তার মধ্যে আতঙ্কের একটি কারণও লক্ষ্য না ক'রে পারলেন না। এবার যখন ভারতবর্ষ বিদ্রোহ করবে, তখন তাকে অহিংসার দার্শনিকতা দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়তো সম্ভব হবে না। দুই বৎসর বাদে আগস্ট বিদ্রোহের সময় তার প্রচুর প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের এই শর্তে বৃটিশ সরকার রাজী হোলো না। কারণ দেখালো,

কংগ্রেস আজ একাই আর ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিনিধিত্ব করে না, দেশে অন্যান্য প্রভাবশালী দলও আছে, যথা, মুসলিম লীগ, দেশীয় রাজন্যবর্গ, ইত্যাদি।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের গণ-বিক্ষোভকে সহজ সরল পথে পরিচালিত না ক'রে কেবলই তার সম্মুখ-গতি রুদ্ধ করার ফলে তা বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের রাজপথে না গিয়ে বৃটিশের সহযোগী সাম্প্রদায়িকতার অলিগলিতে প্রবেশ করেছিল। এ সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে তারা যে ভেদ ও শাসনের নীতি অনুসরণ করেছিল, সেই পুরাতন সুপরীক্ষিত নীতিকেই আবার এখন আশ্রয় করতে চাইলো। মিঃ এম. এ. জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণী বৃটিশ সরকারের পসাদপ্রার্থী হ'য়ে উঠলো, এবং বৃটিশ সরকারও সুবিধামত মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ ও প্রচার করতে লাগলো এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মিলন মীমাংসা যাতে সম্ভবপর না হয়, পরিপূর্ণরূপে তার চেষ্টা করলো। অপরিতৃপ্ত গণবিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম বুর্জোয়ারা ধীরে ধীরে মুসলমান জনসাধারণকে এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-বুর্জোয়া শিবিরে টেনে এনেছিল। তার পরিণত প্রকাশ মিললো ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে—মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে। মিঃ জিন্না তাঁর বাক্‌শক্তির চরম প্রয়োগ করলেন, মুসলমান জনসাধারণের ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাধীনতাস্পৃহা, কিছুই বাদ গেলো না। "We stand unequivocally for the freedom of India. But···" এই 'কিন্তুটিই' মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির মূল কথা। কিন্তু—হিন্দু শোষক ও মুসলমান শোষিতদের মধ্যে রয়েছে বৃটিশ শাসনের রক্ষাকবচ। সুতরাং, মুসলমানদের যেমন স্বাধীনতা চাই, তেমনি চাই স্বতন্ত্র সত্তা—পাকিস্তান। ঐ সময়ে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর চেষ্টাও যে চলে নি, এমন নয়। কিন্তু বৃটিশের উৎসাহে মুসলিম লীগের অনমনীয় ভাব সমস্ত মৈত্রী-মীমাংসার চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিলো। গান্ধীজী নিজেও হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহু চেষ্টাই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর গণ-আন্দোলনের বিরোধিতা দেশে যে বিভ্রান্ত বিকৃত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাতে তাঁর সমস্ত চেষ্টার তরণী একদা দিশাহারা কূলহারা হ'য়ে ভেসে গেলো।

এদিকে বৃটিশ সরকারের এই অসভ্য একগুঁয়েমি, নির্লজ্জতা ভারতীয় জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল। ইচ্ছা করলে ভারতীয় নেতারা দেশব্যাপী আক্রোশকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু গণ-শক্তির প্রতি তাঁদের

আতঙ্ক ছিল অপরাজেয়, সমস্ত ক্ষতিই তার বিনিময়ে ছিল অকিঞ্চিৎকর। অথচ দেশব্যাপী অসন্তোষের তরঙ্গকে বিপুল গর্জনে এগিয়ে আসতেও গান্ধীজী প্রত্যক্ষ করলেন। তাই তিনি গণ-শক্তির আসন্ন প্রচণ্ডতাকে প্রশমিত করার জন্যে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন তাঁর সত্যাগ্রহের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌—শুরু করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হোলো, এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলে ভারতের দাবী ঘোষিত হবে, অথচ বৃটিশ সরকারকে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিব্রত করা হবে না। ১৯৪০-৪১-এর আবহাওয়ায় গান্ধীজী পরিচালিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ মনে হয়। এই সাঙ্কেতিক সত্যাগ্রহ স্বাধীনতার দাবীতেও হোলো না, হোলো কিনা কেবলমাত্র বাক্য-স্বাধীনতার দাবীতে! সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বা ফলাফল যাই হোক, তার পশ্চাতে যে দেশব্যাপী অসন্তোষ জাগ্রত ছিল, সে বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতসরকারের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুতরাং দেশে গ্রেফ্‌তার ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো। কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রেফ্‌তারের সংখ্যা বিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছলো। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার বহু সদস্য এবং প্রাক্তন মন্ত্রীও ছিলেন।

কিন্তু ১৯৪১-এর শেষার্ধে যুদ্ধের চেহারাটা অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। জার্মানির সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ, বৃটিশ-সোভিয়েট চুক্তি, সুদূর প্রাচ্যে জাপানী অভিযান এবং বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে স্বাধীনতারক্ষাপ্রয়াসী চীন এবং সোভিয়েটের মিলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন রাতারাতি বিশ্বযুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলে দিলো। যুদ্ধের এই আকস্মিক প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভারতীয় নেতারাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেন: "The progressive forces of the world are now aligned with the group represented by Russia, Britain, America and China."

কিন্তু ভারতবর্ষের এই প্রগতিশীল মনোভাবকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা উপেক্ষার সঙ্গে এড়িয়ে গেলো। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চার্চিল আটলাণ্টিক সনদের প্রয়োগ-গণ্ডী থেকে ভারতবর্ষকে বাইরেই রাখেন।[১] যাই হোক, ভারতীয় নেতাদের ফাশিবিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উন্মুখতা দেখে গভর্নমেণ্ট ডিসেম্বর মাসে

১ প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট আটলাণ্টিক সনদের প্রয়োগ-গণ্ডীকে কিন্তু পরে পৃথিবীব্যাপী করেন। ১৯৪২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ঘোষণা করেন: "The Atlantic Charter applies not only to the parts of the world that border the Atlantic, but to the whole world."

বন্দী কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দেন। ঐ মাসের শেষাশেষি বারদৌলিতে একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস এক্সিস শক্তিকে সশস্ত্র প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করেন। ফলে, সাময়িকভাবে গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যদিও এই অবসর গ্রহণ ছিল তাঁর নেপথ্যে অপসরণ মাত্র, প্রয়োজন বোধে তিনি আবার যে-কোনো মুহূর্তে অবতীর্ণ হবেন।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হোলো। জাপানীরা প্লাবনের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলো। আতঙ্কগ্রস্ত বৃটিশ সরকার ১০ই মার্চ তারিখে ভারতবর্ষের জন্যে ঘোষণা করলো ক্রিপ্‌স্ মিশন। ক্রিপ্‌স্ মিশনও হোলো বিফল; গান্ধীজী ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা ভারতীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই প্রস্তাবকে তিনি বলেছিলেন, "a post-dated cheque."

ক্রিপ্‌স্ মিশনের ভোঁয়া প্রস্তাব কেবল যে সংগ্রামশীল, আধা-সংগ্রামশীল জাতীয় নেতাদের কাছে অসমর্থন পেলো তাই নয়, নরমপন্থী মডারেটরাও পর্যন্ত একবাক্যে তার নিন্দা করলেন। কিন্তু ঝুনো রক্ষণশীল-পরিচালিত বৃটিশ সরকার তাদের অনমনীয়ভাবে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য দেখালো না। ফলে, দেশে যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা গেলো, কংগ্রেস তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হোলো, যদিও এখনো কংগ্রেস সোজাসুজি সংগ্রামের পথে অগ্রসর হ'তে চাইলেন না। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস যখন হিংসাত্মক প্রতিরোধকে নীতি হিসাবে গ্রহণ ক'রেছিলেন, গান্ধীজী তখন কিছুদিনের জন্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এবার পুনর্বায় তিনি কংগ্রেসের বল্গা-রজ্জু স্বহস্তে নিয়ে সারথির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য এই অবতরণের শর্ত ছিল অহিংসা। গান্ধীজী তাঁর কর্মসূচীকে মূলত চার ভাগে ভাগ করলেন: এক, জাপানকে অহিংস উপায়ে বাধা দান; দুই, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা; তিন, ফাশিবাদীবিরোধী মিত্র-পক্ষের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল মনোভাব; চার, নেহরু-আজাদ-প্রমুখ ফাশিবিরোধী কংগ্রেসী নেতারা যে সশস্ত্র প্রতিরোধের—গেরিলাবাহিনী গঠন, 'পোড়া মাটির' নীতি অনুসরণ ইত্যাদির—প্রচার করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সকল প্রকার সংঘর্ষ এড়ানো। কংগ্রেস গান্ধীজীর অহিংস পথকে পূর্বের মতো বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে না পারলেও বুর্জোয়াদের এই সংকট-মুহূর্তে তাঁর নেতৃত্ব ছিল একান্ত প্রয়োজন। তাই ফাশি-বিরোধী নেহরু এবং আজাদ প্রভৃতির সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ আলোচনার ফলে ফাশিবিরোধিতা এবং অহিংসা, এই উভয় নীতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হোলো। এবং এই চেষ্টা এমন স্বতবিরুদ্ধ ছিল যে, শীঘ্রই দেখা গেল গান্ধীজীর

অহিংসার পথে ফাশিবিরোধী নেহরু-আজাদ প্রমুখ নেতারাও এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন, যার অর্থ হোলো নিষ্ক্রিয়তা—না, কেবল নিষ্ক্রিয়তা নয়, পরোক্ষে ফাশিবাদের সমর্থন। কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করতে চাইলেন, তা লক্ষ্য ক'রে ফাশিবাদীদের ওষ্ঠাধর প্রফুল্ল হাস্যে আকর্ণ-বিস্তৃত হোলো। যে ফাশিবাদীরা আফ্রিকায়, ইউরোপে, এশিয়ায় স্বাধীন দেশগুলির উপর বর্বর অভিযান চালিয়ে করতলগত করেছে, তারাই ভারতবর্ষে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসাহে, আনন্দে অধীর আগ্রহে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো! ফাশিবিরোধী এই উৎকট আনন্দ দেখে ফাশিবিরোধী কংগ্রেসী নেতাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা তা হলেন না—যদিও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এ বিষয়ে ভারতীয় ফাশি-বিরোধীদের সতর্ক করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। তাই ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তাঁরা তার বিরোধিতা করেন। অবশ্য, একথাও স্মরণীয়, গান্ধীজী এই অসহযোগ শুরু করতে চেয়েছিলেন, তা নয়। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নেহরু, আজাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে দেশে যে-ফাশিবিরোধিতা প্রবল হ'য়ে উঠছে, তা যে-কোনো মুহূর্তে সশস্ত্র ফাশি-বিরোধিতায় পরিণত হ'তে পারে। এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে ছিল গান্ধীজীর আতঙ্ক, এবং তিনি শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া রাজনীতিক হিসাবে বুঝতেন, এই সশস্ত্র ফাশিবিরোধী অভ্যুত্থানের অর্থ কী। এর অর্থ ছিল অতি সুস্পষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে গণবিপ্লব। বাইরের ফাশিস্টদের উচ্ছেদের পরমুহূর্তে দেশীয় ফাশিস্টদের উৎখাত—যা ইউরোপের যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বালগেরিয়া প্রভৃতি দেশে ঘটেছে এবং এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েটনাম, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশগুলিতে আজ ঘটছে। গান্ধীজী বুর্জোয়া নেতা হিসাবে সেদিন যে দূরদৃষ্টি দেখিয়েছিলেন, তা তথাকথিত সোশ্যালিস্ট ও বহু মার্কসিস্টরাও লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু গান্ধীজী বুর্জোয়া নেতা হিসাবেই ঘটনাস্রোতের এই পরিণতিকে আতঙ্কের চোখে দেখেছিলেন, তাই তিনি অহিংস অসহযোগের পথেই ফাশিবিরোধিতাকে সেদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। অন্যপক্ষে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল ইতিহাসের সেই প্রচণ্ড পরিণতি, সশস্ত্র ফাশিবিরোধিতার পথেই দেশীয় ফাশিস্টদের উচ্ছেদ। তাই এই ফাশিবিরোধী যুদ্ধকে তারা নাম দিয়েছিল জন-যুদ্ধ। এবং এই কারণেই সেদিন গান্ধীজী-পরিচালিত বুর্জোয়া কংগ্রেসের সঙ্গে গণ-আন্দোলনের নেতা হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির ঘটেছিল চূড়ান্ত সংঘর্ষ। গান্ধীজী সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত দিতে যে চান নি,

কেবল সশস্ত্র ফাশিবিরোধিতার পথ থেকে ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর ১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে বড়লাটের কাছে লিখিত পত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় :

"The Government of India should have waited at least till the time that I inaugurated mass action. I publicly stated that I fully contemplated sending you a letter before taking any concrete action"

কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেজন্যে অপেক্ষা করে নি। (করলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিতো।) ১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস তাঁদের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব পাস করলেন। কিন্তু কেবল প্রস্তাবই পাস করেছিলেন, আশু সংগ্রাম সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। তাই ৯ই আগস্ট ভোরে যখন কংগ্রেসী নেতারা গ্রেফ্তার হলেন, তখন নেতৃত্বহীন ও কর্মসূচীহীন অবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণ প্রতীক্ষা করছিল। গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতাদের গ্রেফ্তারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখা গেলো। এই বিক্ষোভের ফলে গান্ধীজির অহিংসা নীতি যেমন অক্ষুণ্ণ রইলো না, তেমনি ব্যাহত হোলো নেহরু, আজাদ প্রভৃতির ফাশিবিরোধিতা। তবে একটা দিক থেকে অবশ্য এই উভয় দলই উপকৃত হলেন : ভারতীয় জনসাধারণের অসন্তোষ অনেকখানি প্রশমিত হোলো, এবং সশস্ত্র ফাশিবিরোধের পথে দেশে সশস্ত্র গণ-বিপ্লব সহজে সম্ভব হোলো না।

নেতৃত্বহীন আগস্ট আন্দোলনকে বৃটিশ সরকার কঠিন হস্তে দমন করলেন। মিঃ চার্চিল পার্লামেন্টে পরে বড়াই ক'রে বলেছিলেন, এই আন্দোলনটাকে খুব সহজেই দমন করা গেছে—"with remarkable ease." আগস্ট আন্দোলনের পরাজয় ছিল অনিবার্য। কারণ, এর ভিত ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ—কয়েক দশক পূর্বে যে এনার্কিস্ট-টেররিস্ট আন্দোলনগুলি হয়েছিল, এ ছিল সেগুলিরই বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র।

গ্রেফ্তার ক'রে গান্ধীজীকে আগা খাঁ প্রাসাদে রাখা হয় এবং অন্যান্য নেতাদের রাখা হয় আমেদাবাদ ফোর্টে। ১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধীজী অসুস্থ হওয়ায় মুক্তি লাভ করেন। গান্ধীজী কারাগারের বাইরে এসেই ঘোষণা করেন যে, ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্টের প্রস্তাবের আইন অমান্য আন্দোলনের অংশটি আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেছে, কারণ, ১৯৪৪ সাল আর ১৯৪২ সাল এক নয়।

কিন্তু অবস্থা তখনো অচল হয়ে রইলো। আগস্ট প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার

না করা পর্যন্ত ভারত সরকার কোনো আলাপ-আলোচনার সুযোগ দিলো না। কিন্তু উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার বা পরিবর্তিত করবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন। কিন্তু অচল অবস্থার সমাধান হোলো না। বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার নামে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম বুর্জোয়া পরিচালিত মুসলিম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদলোভী হয়ে সেগুলিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্মুখে তুলে ধরেছিল। কংগ্রেসের বিভ্রান্তিকর বক্র নীতির ফলে বিক্ষুব্ধ মুসলমান জনসাধারণও ক্রমেই অধিক সংখ্যায় মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছিল এবং ইসলামের নামে দাবী করছিল পাকিস্তান। তাই গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্য দূর করবার চেষ্টায় ভুলাভাই দেশাই মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারি লীডার লিয়াকৎ আলি খানের সঙ্গে আপোস-নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আলাপ করেন। অবশেষে একটা আপোস-নিষ্পত্তির পরিকল্পনাও হয়: অস্থায়িভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হবে, তাতে সদস্যসংখ্যা শতকরা কংগ্রেসের চল্লিশ, মুসলিম লীগের চল্লিশ এবং অন্যান্য দলের বিশ থাকবে। এই প্রস্তাব বৃটিশ সরকারের কাছে উত্থাপিত করবার জন্যে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড ওয়াভেল লণ্ডনে গেলেন। কিন্তু বৃটিশ কূটনীতিকরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান এতো সহজে হ'তে দিতে চাইলেন না। তাঁরা যে নূতন ফরমুলা দিলেন, তাতে কংগ্রেসের স্থানে বর্ণ হিন্দু শতকরা চল্লিশ, মুসলিম লীগের স্থানে মুসলমান শতকরা চল্লিশ, এই ব্যবস্থা রইলো। কিন্তু বর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে স্বীকার করা কংগ্রেসের পক্ষে ছিল অসম্ভব। মুসলমান বা অন্য জাতির প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকারও তাঁদের সম্পূর্ণ ছিল। তাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনো সমাধানই হোলো না। এইভাবে ওয়াভেল প্রস্তাব সিমলার পাহাড়ে ঠেকে বানচাল হয়ে গেলো।

কিন্তু শীঘ্রই পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবয়বটা প্রচুর রূপে বদলে গেলো। যুদ্ধে ফাশিস্টদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগৎময় পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল শিথিল ও দুর্বল। কেবল যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশৃঙ্খল থেকে জার্মান, ইতালি এবং জাপান বিদায় নিয়েছিল তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডও হীনবল ও ধ্বংসপ্রায় হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে গণ-জাগৃতি ঘটেছিল, তাতেও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ আরো কাহিল হয়ে পড়লো। ভারতবর্ষের জনসাধারণও অহিংসাপন্থী গান্ধীজী এবং

গান্ধীবাদীদের শত প্রতিবাদ সত্বেও মাথা তুলে দাঁড়ালো, চাইলো অচিরে ভারতের স্বাধীনতা। কলিকাতায় একযোগে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের আন্দোলন এবং বোম্বাই-এ হিন্দুমুসলমান নৌ-সৈন্যদের একযোগে ধর্মঘট ও বিদ্রোহ আসন্ন ভবিষ্যতের সূচনা করলো—যে ভবিষ্যতে ভারতের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ আপনার শক্তিতে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবে। কিন্তু গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতারা দেশকে সেপথে অগ্রসর হ'তে দিলেন না। কারণ, ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে সে-পথ ছিল যেমন পিচ্ছিল, তেমনি ভয়ানক। সুতরাং তাঁরা মন্ত্রিত্বের মসনদে ব'সে গঠনতান্ত্রিকতার পথেই অগ্রসর হ'তে চাইলেন। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মিলিত অভিযান প্রত্যক্ষ ক'রে গান্ধীজি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ১৯৪৬-এর হরিজন পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করলেন, জনতার এই 'হিংসাত্মক' কাযের পরিণতি দেখতে তিনি বেঁচে থাকতে চান না। তার চেয়ে তিনি বরং অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মরবেন। "I would not want to live upto 125 to witness that consummation. I would rather perish in the flames" কে জানতো যে, গান্ধীজি সেদিন একটি মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ-বাণী মাত্র করেছিলেন। গান্ধীজিও নিজে জানতেন না যে, তাঁকে হয় একদিকে ভারতের বিপ্লবী জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করবার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে, নয় একদা বরণ করতে হ'বে ঘৃণ্য আততায়ীর হস্তে কঠিন মৃত্যুকে।

ভারতের জনশক্তির এই জাগরণ সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত ছিল। যুদ্ধের পরে পৃথিবীর সর্বত্র গণশক্তি এমন প্রবল এবং সাম্রাজ্যবাদ এমন দুর্বল হয়ে পড়ছিল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে দমননীতির পথে আর অগ্রসর হতে চাইলো না। তারা বুর্জোয়াদের সাহায্যেই ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যকে বজায় রাখতে ইচ্ছা করলো। সুতরাং ভারতবর্ষে এলো কেবিনেট মিশন।

১৯৪৬-এর গোড়ার দিকে যে নির্বাচন হোলো, তাতে দেখা গেলো, মুসলিম লীগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগ সর্বশুদ্ধ ৫০৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৭টি দখল করেছে। অথচ ১৯৩৭ সালে তারা মাত্র পেয়েছিল ১০৮টি। সুতরাং মুসলিম লীগকে কেন্দ্র ক'রে বৃটিশ কূটনীতি এবার নিঃসংকোচে ঘূর্ণিত হ'তে লাগলো। এবং বৃটিশের উশকানি সহযোগে ভারতের একছত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবিটা ক্রমেই উগ্র হ'তে উগ্রতর হয়ে উঠলো।

১৬ই মে তারিখে বড়লাটের সঙ্গে একযোগে বৃটিশ কেবিনেট মিশন তাঁদের

প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। এই প্রস্তাবে পাকিস্তানকে বস্তুত স্বীকার ক'রে না নিলেও কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত এবং মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্ন ভারতের সমস্যাকে কূটনীতির পথে আরো জটিলতর ক'রে তোলা হোলো। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যদি একযোগে ঘোষণা করতেন যে, আগে ভারতের স্বাধীনতা চাই, তারপর খণ্ডিত বা অখণ্ডিত ভারতের প্রশ্ন উঠবে, তবে বৃটিশ কেবিনেটের কূটনীতিকরা ভারতীয় সমস্যাকে এমন জটিল ক'রে তুলতে কখনো সমর্থ হতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি না ক'রে কেবলই পৃথকভাবে কেবিনেট মিশনকে তোষণ করতে লাগলেন। ফলে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে রুক্ষতর ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জগতের কাছে আর একবার জাহির করলো।

১৬ই মে তারিখে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব ঘোষণার পর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সংঘর্ষ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। অবশেষে তা চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ'লো যখন আগস্ট মাসে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে শুরু করলো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা বেধে গেলো। একমাত্র কলিকাতাতেই বহু সহস্র লোক নিহত হোলো। সমস্ত বুর্জোয়া রাজনীতি যে এক অক্ষম দেউলিয়া অবস্থায় এসে পৌছেছে, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হোলো না। বৎসরের পর বৎসর ধ'রে যে গণ-বিক্ষোভকে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া নেতৃত্ব দমন ক'রে এসেছিল, আজ অকস্মাৎ তা বীভৎস রূপে ফেটে পড়লো। বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে ছুটে আসতে হোলো গান্ধীজীকে, অহিংসার নামে, সত্যের নামে, সহনের নামে। যে দেশব্যাপী বিপ্লবী শক্তিকে তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে ঠেকিয়ে রেখে এসেছিলেন, আজ তা ভারতের সর্বত্র কুৎসিত গলিত ব্যাধির মতো আত্মপ্রকাশ করলো সাম্প্রদায়িকতায়।

গান্ধীজী অধীর হয়ে উঠলেন, ব্যাধিগ্রস্ত জাতির আর্তনাদ তাঁর কর্ণে ধ্বনিত হোলো। তিনি ছুটে চললেন—নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে, কেবল ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে নয়, শ্রেষ্ঠ শুশ্রূষাকারী রূপেও। গান্ধীজীর জীবন-নাট্যের এই শেষ দৃশ্য, যেমন অপরূপ, তেমনি করুণ।

॥ পনেরো ॥

হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে গণ-বিপ্লবের পথে পরিচালিত না ক'রে বারে বারে তাকে প্রতিহত প্রতিরুদ্ধ করায় তার এই বিকট বীভৎস বিস্ফোরণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। ১৯২৬ সালে এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যা বলেছিলেন, তাই বৃহত্তর ক্ষেত্রে আজ বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল মাত্র। "It is possible that this bottling up of a great movement contributed to a tragic development in the country. The drift to sporadic and futile violence in the political struggle was stopped, but the suppressed violence had to find a way out, and in the following years this perhaps aggravated the communal trouble." (Autobiography, জহরলাল নেহরু)

অকস্মাৎ সেদিন ভারতবর্ষে যে প্রচণ্ড হিংসার বর্বর বিস্ফোরণ ঘটলো, তার তুলনা আধুনিক ইতিহাসে মেলে না। ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে শান্ত করবার জন্যে যাঁরা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে অহিংসামূলক ব'লে প্রচার করেছিলেন, ১৯৪৬-৪৭-এর ভারতবর্ষের নগ্ন রূপ দেখে তাঁদের লজ্জিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অহিংসার বাণী কেবল ভারতের একচেটে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুরূপ অবস্থায় তা প্রচারিত হয়েছে,* আবার ভিন্নতর পরিপার্শ্বে সে-দেশের লোকেরা তাকে প্রয়োজন অনুসারে করেছে উপেক্ষা। মানুষ কালের ক্রীড়নক, পরিপার্শ্বের পুতুল মাত্র। তাই বুদ্ধ, মহাবীর ও চৈতন্যের নামে ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে শান্ত করা গেলো না, তা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে দেশময় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতায় ফেটে পড়লো। বুদ্ধ, মহাবীর ও চৈতন্যের নাম নিয়ে গান্ধীজি বিপ্লবের প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন সত্য, কিন্তু জনসাধারণের অতৃপ্ত সংগ্রামী স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করতে পারলেন না,—তা আত্মঘাতী দেশব্যাপী নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও ব্যভিচারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো। সুতরাং ভারতের এই গ্লানিময় সাম্প্রদায়িকতার মূল সন্ধান করলে দেখা যাবে, এর জন্যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল দেশের সংগ্রামবিরোধী বুর্জোয়া নেতৃত্ব, এবং সেই নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে দায়ী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। নিতান্ত

* যেমন সোভিয়েত রাশিয়া। টলস্টয়ের সংগে গান্ধীজীর কথা ভাবুন।

বিপরীতার্থক বাক্যের মতো শোনালেও, একথা একান্ত সত্য যে, এই দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্যে মূলত দায়ী ছিল গান্ধীজীর অহিংসাই।

গান্ধীজি নোয়াখালি ও বিহারে শান্তি শফর শেষ ক'রে দিল্লীতে ফিরে এলেন। দেশের সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু কমলো না, তা কেবলই বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সমাজ-জীবনকে ছেয়ে ফেলতে চাইলো। সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ তো দূরের কথা, কংগ্রেসের বৃহত্তর অংশও এই সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য পথে নেমে এলো। কিন্তু ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব আজ যে অমানুষিক হিংসার পথে অগ্রসর হচ্ছে, অহিংসার প্রচারক হিসাবে গান্ধীজির সে-পথে অগ্রসর হওয়া বিন্দুমাত্র সম্ভব ছিল না। তাই গান্ধীজি হিংসার কুটিল স্রোতাবর্তের সম্মুখে মাথা তুলে দাড়ালেন। তাঁর যে বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে একদা তিনি বারে বারে ভারতের বিপ্লবী শক্তির প্রতিরোধ করেছিলেন, আজ সেই ব্যক্তিত্ব নিয়েই তিনি দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। গান্ধীজির এই সুদৃঢ় মনোভাব সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের অনেকের পছন্দ হোলো না। বৃটিশ সরকার আবার ভারতের পরিত্রাতা হিসাবে অবতীর্ণ হলেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধকরূপে স্থির হোলো ভারতের ব্যবচ্ছেদ। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত-বিভাগ সম্পন্ন হোলো। কিন্তু তাতেও সাম্প্রদায়িকতার সমাধান হোলো না। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিলো। কেবল তাই নয়, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দুই দল বিভক্ত ভারতের দুই খণ্ডে দুইটি শত্রু শিবির গ'ড়ে তুলতে লাগলো। গান্ধীজি লক্ষ্য করলেন, ভারতে গৃহযুদ্ধ আসন্ন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের কাছে গান্ধীজির এই প্রচেষ্টা মনঃপূত হোলো না। গান্ধীজির উপর আক্রমণ আসতে লাগলো। গান্ধীজির জীবনে আক্রমণ এসেছে বহু বার, এবং প্রতি বারই সরকারী ব্যবস্থা তাঁর জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু গান্ধীবাদী কংগ্রেসী সরকার এবার গান্ধীজির জীবন রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করলো না। গান্ধীজির প্রার্থনা-সভায় ফাটলো বোমা। আততায়ীকে গান্ধীজী তাঁর দর্শন অনুসারে মার্জনা করলেন। কিন্তু ভারত সরকারও অকস্মাৎ দার্শনিক হয়ে উঠলো। শ্রমিক তাড়নায় যারা বন্দুক চালাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তারা সাম্প্রদায়িকদের বেলায় পরম অহিংসাবাদী হয়ে উঠলো। এইভাবে অহিংসার ভারতীয় ট্র্যাজেডি তার পরম মুহূর্তে এসে পৌছলো—যাকে নাট্যশাস্ত্রে বলে নেমেসিস্।

১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারী। ভারতের আকাশে পুরাতন সূর্য নিতান্ত একঘেয়ে পুরাতন প্রথায় উঠেছে। তখন কে জানতো যে, এই সূর্যাস্ত ভারতেব হৃৎপিণ্ডের রক্তে লাল হয়ে যাবে, সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার সমস্ত জাতিব বুকে কালো বন্যার মতো নেমে আসবে। গান্ধীজি নিয়মিতভাবে তাঁব বৈকালিক প্রার্থনা-সভাব জন্যে প্রস্তুত হলেন। আকাশের সূর্য পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে নেমে এলো। প্রায় আড়াই হাজার বছব আগে আথেন্সেব সান্ধ্য আকাশে একদা এমনিভাবে সূর্য নেমেছিল, দুহাজার বছর আগে জুডিয়ার আকাশও হয়েছিল এমনি লাল।

নিতান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে এক মহা নাটকের পরিণতি ঘটলো, আততায়ীব কয়েকটা মাত্র বুলেটে! অহিংসার শক্তি, আত্মার আড়ম্বর, কিছুই হিংসাব হাত থেকে গান্ধীজির দেহকে রক্ষা কবতে পাবল না। গান্ধীজিব মৃত্যু ঘটলো সাধাবণ মানুষ যেমন ভাবে মরে, ঠিক তেমনি ভাবে। নাটকের যবনিকা নামলো মঞ্চ নিষ্প্রদীপ হয়ে গেলো।

নাথুবাম গোডসের গুলিতে মৃত্যু হ'লো গান্ধীজির। সেই সঙ্গে পৃথিবীব একমাত্র গান্ধীবাদীরও। ভাবতের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে —গান্ধীবাদে আদর্শ বলে যা গৃহীত হয়েছিল, আজ তা, ভালোর জন্যেই হ'ক মন্দের জন্যেই হ'ক, সম্পূর্ণরূপে পবিত্যক্ত হয়েছে। গান্ধীবাদের এই অপমৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ গান্ধীবাদ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রতিষ্ঠিত ছিল ব্যক্তিব ওপর। সেই ব্যক্তির মৃত্যুব সঙ্গেই প্রকৃত গান্ধীবাদেরও মৃত্যু ঘটেছে। তাই তার প্রেত আজ দেশের আকাশে-বাতাসে অশুভ অপচ্ছায়াব মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ তার অতি প্রিয়জনের প্রেতকেও ভয় করে। গান্ধীবাদেব প্রেতকেও তাই আজ মানুষের এতো ভয়। গান্ধীবাদ ও গান্ধীবাদেব প্রেত এক নয়।

সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট

এই লেখকের আরও কয়েকটি সুপরিচিত গ্রন্থ ঃ

শেক্‌স্‌পীয়র

বার্নার্ড শ

আবুল কালাম আজাদ

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

আধুনিকী